আন্তর্জাতিকভাবে চাঞ্চল্যকর বেস্টসেলিং বই
এক
অর্থনৈতিক ঘাতকের
স্বীকারোক্তি
যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে সমগ্র বিশ্বকে নিজের সাম্রাজ্যে
পরিণত করেছে তার ভয়ঙ্কর কাহিনী
মূল ঃ জন পার্কিন্স
অনুবাদ ঃ দেবাশিস চক্রবর্তী

এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি

মূল ঃ জন পার্কিন্স
অনুবাদ ঃ দেবাশিস চক্রবর্তী
সম্পাদনা ঃ দাউদ হোসেন

এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি

অনুবাদ ঃ দেবাশিস চক্রবর্তী
সম্পাদনা ঃ দাউদ হোসেন

প্রকাশক
সংঘ প্রকাশন
কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
বেজমেন্ট রুম # ৫৭-৫৮
২৫৩-২৫৪ ডঃ কুদরত-ই-খোদা সড়ক (কাঁটাবন), ঢাকা-১২০৫
ফোনঃ ০১৯১৬ ০৩৬০২৫, ০১৬৮৫ ৮৪০৭১২
ই-মেইলঃ songhaprokashan@yahoo.com

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর, ২০০৯ খ্রীস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রীঃ
তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রীঃ

কম্পোজ ও ফর্মা সেটিং
অমি প্রিন্টার্স, আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা।

মুদ্রক
কালার ওয়েব, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ
শোভন ঃ টাকা ৪০০.০০
সুলভ ঃ টাকা ৩০০.০০

EK ORTHONOITIK GHATOKER SHIKAROKTI
First Bangla Translation of John Perkins' Confessions of An Economic Hitman
by Debashis Chakrabarty

Publisher
Songha Prokashan
Concord Emporium Shopping Complex
Basement Room # 57-58
253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road (Kantabon), Dhaka-1205
E-mail: songhaprokashan@yahoo.com

First Editon: October, 2009
Second Edition: September, 2013
Third Edition: January, 2018
Price
Hardcover : Tk. 400.00 US$ 25.00
Paperback: Tk. 300.00 US$ 20.00

ISBN : 978-984-8836-03-3

সূচীপত্র

বিষয়ের নাম *পৃষ্ঠা*

তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯৭৫-১৯৮১

চতুর্থ পর্ব ঃ ১৯৮১-বর্তমান

অনুবাদকের কথা

সংঘ প্রকাশনের কর্ণধার জনাব দাউদ হোসেনের সাথে আমার পরিচয় সাপ্তাহিক রোববারে। শুরু থেকেই দাউদ ভাইয়ের সূক্ষ্ম মননশীলতা ও সুরসিক ব্যবহার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। বয়সের ব্যবধান বজায় রেখেও আমরা একে অপরের সাথে আন্তরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। তার অনুরোধে মাসিক আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বুলেটিনে অনেকগুলি লেখাও লিখেছিলাম। এরপর দীর্ঘদিন দাউদ ভাইয়ের সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ করেই এ বছরের মাঝামাঝি তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। আমার উপরে জন পার্কিন্সের লেখা *'কনফেশন অব অ্যান ইকোনমিক হিট ম্যান'* তথা *'এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি'* বইটিকে অনুবাদের দায়িত্ব দিলেন। আমার ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনে এতো নির্মম সত্যভাষী বই আমার হাতে আর কখনো পড়েনি। এ জন্য দাউদ ভাইয়ের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব। সে সাথে সংঘ প্রকাশনের কর্মীরা অবশ্যই আমার ধন্যবাদ পাবেন। বিশেষ করে যারা অসম্ভব রকম কষ্ট করে আমার দুর্বোধ্য হাতের লেখাকে কম্পোজ করেছেন সেই সুলতান ও রেজাউলকে শত কোটি ধন্যবাদ জানাই।

জন পার্কিন্স যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের নিউ কাউন্টির এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। পারিবারিক রক্ষণশীলতা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত মানসিক ক্ষোভ তার জীবনে কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার, সংবাদপত্রে চাকরী নেওয়া, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে ভর্তি হওয়া, এনএসএতে সাক্ষাৎকার দেওয়া, পীস কোরের চাকরী নিয়ে ইকুয়েডরে যাওয়া ও মেইনে যোগদান করার মতো ঘটনাগুলোকে একের পর এক ঘটিয়েছে। মেইনের চাকুরীই তাকে কর্পোরেটোক্রেসির অন্দরমহলে নিয়ে গেছে। কর্পোরেটোক্রেসির তিনটি উপাদান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। মার্কিন সরকারগুলোর গঠনের দিকে তাকালেই এই তিন মহলের মধ্যেকার সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি চোখে পড়ে।

খুব সম্ভবত স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বসাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। শুরুতে এই পরিকল্পনা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা বাকি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অলীক উন্নয়নের বেলোয়ারী টোপে আটকে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো থেকে বিপুল অংকের ঋণ নিতে বাধ্য করা হতো। এরপর এই অর্থ বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হতো ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলোর ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়নের লক্ষ্যে। এভাবেই দেশগুলো চিরদিনের জন্য ঋণের কারাগারে আবদ্ধ হতো। সে সাথে এসব দেশ কর্পোরেটোক্রেসিকে সুলভে শ্রম ও সম্পদ সরবরাহ করতে বাধ্য হতো। ধনী অথচ অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে কর্পোরেটোক্রেসি ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছিল। এসব দেশ গোটা বিশ্বে নিজেদের সম্পদ ও পণ্য রফতানি করে যে অর্থ উপার্জন করত তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণপত্রগুলোকে ক্রয় করতে

বাধ্য হয়েছিল। এরপর এসব ঋণপত্রের লভ্যাংশ দিয়ে এসব দেশের ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়ন করা হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী সমৃদ্ধ সহ বিশ্বের বহু ধনী দেশকে এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। কোন কোন ধনী দেশ এই ফাঁদে পা না দেওয়ায় কঠিন শাস্তি পেয়েছে। এসব দেশের মধ্যে ইরাকের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ধনী দেশ দীর্ঘদিন কর্পোরেটোক্রেসির কথা মতো চলে হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে। ফলে এসব দেশকে আন্তর্জাতিক ভাবে একঘরে করে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইরান হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেশ।

যে সব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ কর্পোরেটোক্রেসির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন তাদের পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছে। গুপ্তহত্যা, প্রহসনের নির্বাচন, ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। এরপর তাদের স্থানে পুতুলদের বসিয়ে কর্পোরেটোক্রেসি নিজ লক্ষ্যকে হাসিল করেছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র 'স্থায়ী মিত্র বা শত্রু নেই, আছে শুধু 'চিরস্থায়ী স্বার্থ' এই নীতিকে প্রয়োগ করেছে। আর এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান সরকারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম।

মেইনে জন পার্কিন্সের মূল দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এ পর্বেই ঋণ গ্রহণকারী বা উন্নতিকামী দেশগুলোর সামনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অলীক সুখ স্বপ্নের জালকে বোনা হতো। এ জন্য তিনি বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন, বহু সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্থাটির অংশীদারে পরিণত হয়েছিলেন। মেইনের চাকরী ছাড়ার পর তিনি প্রাক্তন সহকর্মীদের সহায়তায় আইপিএস নামের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সাথে কয়েকটি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থায় বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের দায়িত্বও পেয়েছিলেন। এরই পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে বেশ কটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে গড়েও তুলেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আইপিএসকে বিক্রি করলেন, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করাও ছেড়ে দিলেন। এখন তিনি ব্যস্ত লেখালেখি, বক্তৃতা দেওয়া ও ড্রিম চেঞ্জকে পরিচালনার কাজ নিয়ে। ড্রিম চেঞ্জের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বের বহু স্থানে প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থাগুলো গড়ে উঠেছে। বোধহয় এটিও কর্পোরেটোক্রেসির একটি অংশ।

আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলে বাস করছি। এখনো প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে আন্তর্জাতিক মহলগুলোর কাছে হাত পাততে হয়। অনেক পূর্বশর্ত পূরণের পর যেটুকু সহযোগিতা পাওয়া যায় তা অনেক শর্তের শেকলে বাঁধা থাকে। এসব শর্তের বেশির ভাগই আমাদের পূরণ করতে হয় সস্তা শ্রম দিয়ে। এ এমন এক অন্ধচক্র যা থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।
আর এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র নিয়তি।

দেবাশিস চক্রবর্তী
ঢাকা, ২০০৯ খ্রীস্টাব্দ।

লেখকের ভূমিকা

"অর্থনৈতিক ঘাতকেরা মোটা অংকের বেতনপ্রাপ্ত পেশাদার। এদের কাজ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ধাপ্পা দিয়ে লক্ষ কোটি ডলার চুরি করা। এরা বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্যদানকারী সংস্থার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে পৌছে দেয়। এভাবেই সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিয়ন্ত্রণকারী গুটি কয়েক পরিবার প্রতিনিয়ত লাভবান হয়। এ কাজে অর্থনৈতিক ঘাতকদের মূল অস্ত্র হচ্ছে ভুল তথ্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, পাতানো নির্বাচন, ঘুষ, চাপ প্রয়োগ, যৌনতা ও হত্যা। তাদের কর্মকাণ্ড সাম্রাজ্যের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। তবে বিশ্বায়নের এ যুগে এসব কর্মকাণ্ড নতুন ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

আমার তো এসব কথা জানা উচিত। কেননা, "আমি ছিলাম একজন অর্থনৈতিক ঘাতক।"

১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে "এক অর্থনৈতিক ঘাতকের বিবেক" নামের একটি বইয়ের ভূমিকা লেখার সময় আমি উপরের কথা কটি লিখেছিলাম। বইটি দুই দেশের প্রেসিডেন্টকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। দু'জনেই ছিলেন আমার গ্রাহক। দু'জনকেই আমি শ্রদ্ধা করতাম। দু'জনকেই আমি মহানুভব ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতাম। এরা দু'জন হচ্ছেন ইকুয়েডরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হাইমে রোলদো ও পানামার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজো। দু'জনেরই মৃত্যু ঘটেছে ভয়াবহভাবে আকাশ থেকে মাটিতে বিমান পতনের কারণে। কিন্তু এসব পতন নিছক বিমান দুর্ঘটনা ছিল না। বরঞ্চ এগুলো ছিল রাজনৈতিক হত্যা। তারা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারী, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক জোটের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। তাই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন অর্থনৈতিক ঘাতকরা রোলদো ও ওমর তোরিজোদের বশ করতে ব্যর্থ হয় তখন সিআইএ'র দ্বিতীয় ঘাতক দলের কাজ শুরু হয়। এই দ্বিতীয় ঘাতক দলের নাম হচ্ছে শৃগাল।

চাপের কারণে আমি বইটি তখন লিখতে পারিনি। পরবর্তী ২০ বছরে আমি ৪ বার বইটি লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। প্রতিবারেই আমাকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এসব ঘটনা হচ্ছে পানামায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান, প্রথম ইরাক যুদ্ধ, সোমালিয়া ও ওসামা বিন লাদেনের উত্থান। কিন্তু প্রতিবারেই ঘুষ ও ভীতি আমাকে শুরুতেই থামিয়ে দিয়েছে।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনী সংস্থার প্রেসিডেন্ট আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। তখন বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল "এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি"। এই প্রকাশনী সংস্থাটির মালিক হচ্ছে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। পাণ্ডুলিপি পড়ার পর প্রকাশনী সংস্থার প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন, "এমন একটি আকর্ষণীয় ঘটনা অবশ্যই পাঠকদের জানানো উচিত।" তারপর তিনি দুঃখের হাসি

হাসলেন, সখেদে মাথা নাড়লেন, উনি আমাকে জানালেন যে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধারদের সম্ভাব্য আপত্তির কারণে তিনি বইটি ছাপতে পারবেন না। এরপর তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন বইটিকে উপন্যাসের আঙ্গিকে লিখতে। "আমরা আপনাকে জন লি কেরি বা গ্রাহাম গ্রীনের মত বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পাইয়ে দেব।"

কিন্তু আমার বই তো কোন কল্পকাহিনী নয়। বরঞ্চ তা হচ্ছে আমার জীবনের প্রকৃত ঘটনা। পরিশেষে একজন দুঃসাহসী প্রকাশক, যার প্রকাশনী সংস্থাটির সাথে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই, তিনি আমাকে নিজ কাহিনী বলতে সাহায্য করলেন।

এই কাহিনী আমাকে বলতে হবেই। আমরা এক ভয়াবহ সঙ্কট ও অভূতপূর্ব সুযোগের যুগে বাস করছি। এই বিশেষ অর্থনৈতিক ঘাতকের কাহিনী হচ্ছে এমন একটি বিবরণ যা বয়ান করবে যে, কিভাবে আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছি এবং কেন আমরা দুর্বলতম সব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। এই কাহিনীটি বলতেই হবে। কেননা, আমরা অতীতের ভুলগুলোর স্বরূপ বুঝতে পারলেই ভবিষ্যতের সুযোগগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারব। ২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর পরই ঘটেছে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ। সন্ত্রাসী হামলায় ২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সেই সাথে ক্ষুধা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কারণে মৃত্যু ঘটেছে ২৩ হাজার ব্যক্তির। প্রতিদিন জীবন রক্ষাকারী খাদ্যের অভাবে ২৪ হাজার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এই কাহিনী বলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এহেন পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার মত ক্ষমতা, অর্থ ও দক্ষতা একটি দেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই দেশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এই দেশের অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে আমি কাজ করেছি। আর এই দেশটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

কী কারণে আমি সকল ভীতি ও ঘুষকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হলাম?

সংক্ষিপ্ত জবাবটি হচ্ছে এই যে, আমার একমাত্র সন্তান জেমিমা পড়াশুনা শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেছে। যখন আমি তাকে বইটি প্রকাশের ইচ্ছা জানালাম ও নিজ ভীতির কথা বললাম, তখন সে বলল, "বাবা, মোটেও ভয় পেয়ো না। যদি ওরা তোমার ক্ষতি করে, তবে আমি তোমার কাজ শেষ করব। একদিন আমি তোমাকে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দেব তাদের জন্যই কাজটি করতে হবে।" এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কারণ।

বৃহত্তম কারণ হচ্ছে, যে দেশে আমি জন্মেছি ও বড় হয়েছি, যে দেশের প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শকে আমি আজন্ম ভালবেসেছি, যে দেশের মূলমন্ত্র "জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণ"-এর প্রতি আমি এখনও একনিষ্ঠ, যে দেশ ২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পথে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে, তার এই পরিণতি আমাকে এই কাহিনী বলতে বাধ্য করেছে। মূলত অর্থনৈতিক ঘাতকের কর্মকাণ্ডই যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছে। বৃহত্তম কারণের এটি হচ্ছে কঙ্কাল। এর রক্ত-মাংস যোগ করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

এই কাহিনী সম্পুর্ণভাবে প্রকৃত ঘটনা। আমি এর প্রতিফলনের চাক্ষুষ সাক্ষী। এর প্রতিটি দৃশ্য, ব্যক্তি, সংলাপ ও অনুভূতি যেভাবে আমি বলেছি, ঠিক সেভাবেই আমার জীবনে ঘটেছিল। এটি আমার ব্যক্তিগত কাহিনী। অথচ এসব ঘটনা ঘটেছিল বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে। এসব ঘটনা আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে গড়ে তুলেছে, অনাগত ভবিষ্যতের পটভূমিকাকে নির্মাণ করেছে। আমি প্রতিটি ঘটনা, ব্যক্তি ও সংলাপকে প্রকৃতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। যখনই আমি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করেছি বা অন্যদের সাথে আলোচনার কথা বিবৃত করেছি, তখন বেশ কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেছি। এগুলো হচ্ছে প্রকাশিত দলিলপত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহ, একান্ত গোপনীয় নোট, নিজের ও অন্যদের স্মৃতিচারণ, আগের ৫টি পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন লেখকের প্রকাশিত বই এবং সম্প্রতি ডিক্লাসিফায়েড হওয়া সরকারী দলিলপত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির সাথে একাধিক আলোচনার সংলাপগুলোকে আমি একই সাথে গেঁথেছি। এতে করে এক নজরে গোটা আলোচনাকে দেখা সম্ভব হবে।

আমার প্রকাশক প্রশ্ন করেছিলেন যে, সত্যি সত্যি কি আমরা নিজেদের অর্থনৈতিক ঘাতক নামে ডাকতাম। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে, আমরা নিজেদের এ নামেই ডাকতাম। তবে ব্যাপারটি সহজ করার জন্য নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের যেদিন আমার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল সেদিন আমার প্রশিক্ষক ক্লাউন বলেছিল, "আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে একজন অর্থনৈতিক ঘাতকে পরিণত করা। তোমার কাজ সম্পর্কে কাউকে কোন কথা বলা চলবে না। এমনকি তোমার স্ত্রী যেন ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারে কিছু টের না পায়।" তারপরই সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল, "একবার এ জগতে প্রবেশ করতে পারলে আর বের হওয়ার কোন পথ খোলা থাকে না।" এরপর সে কখনই পুরো নামটি ব্যবহার করত না। শুধু ইএইচএম নামেই ডাকতো।

যে জগতে আমি প্রবেশ করেছিলাম সে জগতে কিভাবে একজনকে প্রভাবিত করা হয় ক্লাউনের ভূমিকা হচ্ছে তারই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। রূপসী ও বুদ্ধিমতী হওয়ার কারণে ক্লাউন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারত। সে আমার দুর্বলতাগুলোকে ঠিকভাবে চিহ্নিত করে এগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছিল। তার দায়িত্ব সে সঠিকভাবে পালন করেছিল। এ থেকেই এই পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণকারীদের বুদ্ধিমত্তার সূক্ষ্মতা পরিমাপ করা সম্ভব।

আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় ক্লাউন কোন রাখঢাক করে কথা বলে নি। সে সুস্পষ্টভাবে বলেছিল, "তোমার কাজ হবে বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার নেটওয়ার্কের সদস্যে পরিণত হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগানো। এসব নেতা এমনভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়বেন, যা তাদের আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করবে। তখন আমরা আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করতে পারব। বিনিময়ে তারা শিল্প স্থাপন, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও বিমানবন্দর তৈরি করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুসংহত করতে

পারবেন। এসব ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কারণে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনস্ট্রাকশন কোম্পানীগুলো বিপুল বিত্ত অর্জন করতে পারবে।"

এই নেটওয়ার্কের অপ্রতিহত গতির ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিশ্বখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধারগণ এশিয়ার কারখানাগুলোতে অমানবিক পরিবেশে কাজ করার জন্য নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের ভাড়া করেন। জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলো অরণ্যে ও নদীতে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থগুলোকে উদগীরণ করে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে মানুষ, গাছ ও পশুপাখিকে হত্যা করছে, ধ্বংস করছে একের পর এক প্রাচীন সভ্যতাকে। ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আফ্রিকার লাখ লাখ এইচআইভি আক্রান্ত বাসিন্দাকে প্রাণ রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ করছে না। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের ১ কোটি ২০ লাখ পরিবার প্রতি বেলার খাবার ক্রয় করতে সক্ষম নয়। জ্বালানী শিল্পখাতে ঘটেছে এনরনের পতন। হিসাব রক্ষণ খাতে ঘটেছে এন্ডারসেনের বিলুপ্তি। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর ধনাঢ্যতম ২০% এর সাথে দরিদ্রতম ২০% এর আয়ের অনুপাত ছিলো ৩ঃ১। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দে এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ঃ১-এ"। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে নিজ দখল বজায় রাখার জন্য ৮ হাজার ৭ শত কোটি ডলার ব্যয় করছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এর অর্ধেক অর্থে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সুপেয় পানি, খাদ্য, পয়ঃনিস্কাশন ও শিক্ষা সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

তারপরও আমরা ভাবি যে, কেন সন্ত্রাসীরা আমাদের আক্রমণ করছে?

কেউ কেউ আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোকে সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের ফসল বলে মনে করছেন। ব্যাপারটি এতটা সহজ নয়। ষড়যন্ত্রকারী সংঘের সদস্যদের অনায়াসেই আটক করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিটি ষড়যন্ত্রের চেয়েও শতগুণে বেশী বিপজ্জনক নিয়ামক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একে গুটি কয়েক ব্যক্তি পরিচালনা করছে না। বরঞ্চ এটি এমন একটি ধারণা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যা এক শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে। এই ধারণা মোতাবেক প্রতিটি অর্থনৈতিক উন্নয়নই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। উন্নয়নের গতি যত বৃদ্ধি পায় ততই এর প্রভাব ব্যাপকতর হয়। এই ধারণার একটি স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সুবাদে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বেগবান হচ্ছে সে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করতে হবে। আর যারা এই কর্মকাণ্ডের বাইরে অবস্থান করছে তারা অবশ্যই শোষণের শিকারে পরিণত হবে।

এই ধারণাটি অবশ্যই ক্রটিপূর্ণ। বেশির ভাগ দেশেই জনসংখ্যার ক্ষুদ্রতম অংশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করে। অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশটির দুর্দশা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। যে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড একটি দেশের উন্নয়নকে পরিচালনা করে সে সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রকগণ বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেন। এটি আমাদের বহু সমস্যার উৎসে পরিণত হয়েছে। যখন ব্যক্তিগত লোভকে পুরস্কৃত করা হয় তখন লোভ সমষ্টিগত দুর্নীতির জন্ম দেয়। যখন আমরা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের

অপচয়কারীকে পুরস্কৃত করি, যখন আমরা নিয়ন্ত্রণহীন জীবনযাপনকারীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করি, যখন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সেবায় নিযুক্ত করি, তখনই আমরা সমস্যাকে ডেকে আনি। আর এসব সমস্যা থেকে উদ্ভব ঘটে জাতীয় বিপর্যয়ের।

বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও সরকার, সম্মিলিতভাবে যা কর্পোরেটোক্রেসি নামে পরিচিত, তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তি ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করে এই ত্রুটিপূর্ণ ধারণা ও এর অনুসিদ্ধান্তকে অনুসরণ করতে। এই সম্মিলিত শক্তি আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে উপনীত করেছে যেখানে আমাদের বৈশ্বিক সংস্কৃতি এক সর্বভুক দানবে পরিণত হয়েছে। এর প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান জ্বালানী যা সর্বক্ষণ যোগান দিতে হয়। একদিন হয়তো বা এটি গোটা বিশ্বকেই গিলে খাবে। এরপর আর কিছু না পেয়ে নিজেকে খেতে শুরু করবে।

কর্পোরেটোক্রেসি কোন ষড়যন্ত্র নয়। তবে এর সদস্যগণ কতকগুলো অলিখিত মূল্যবোধ ও লক্ষ্যকে অনুসরণ করেন। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্রমাগত ভাবে একে সংরক্ষণ, বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা। যারা এর ধারক ও বাহক, তাদের সমৃদ্ধি ও বিলাসবহুল জীবন, বিশাল প্রাসাদ, প্রমোদতরী, ব্যক্তিগত বিমান আমাদের অনুপ্রাণিত করে বিলাস উপভোগের পথে পা বাড়াতে। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের নাগরিক দায়িত্ব হচ্ছে বিলাস দ্রব্য ক্রয় করা। প্রতিক্ষণেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণের কাজে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বলা হয় যে, এতে আমাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। এই প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, আমার মত লোকদের অবিশ্বাস্য রকমের মোটা অংকের বেতন দেওয়া হয়। আমরা যখন ব্যর্থ হই তখন আরো ভয়াবহ ভয়াবহ ঘাতক শৃগালদের কাজে লাগানো হয়। যখন শৃগালরাও হার মানে তখন সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়।

এই বইটি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি, যে ছিল হাতে গোনা কয়েকজন অর্থনৈতিক ঘাকদের অন্যতম। বর্তমানে অর্থনৈতিক ঘাতকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের পদগুলোর নাম অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর। তারা কাজ করেন মনসান্তো, জেনারেল ইলেকট্রিক, নাইকে, জেনারেল মোটর্স, ওয়ালমার্টসহ তাবৎ বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। প্রকৃত অর্থে, "এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি" সকল যুগের সকল অর্থনৈতিক ঘাতকেরই কাহিনী।

এটা আপনাদেরও কাহিনী। যে বিশ্বে আমরা বাস করি এটা সেই বিশ্বের কাহিনী। এটা মানব ইতিহাসের প্রথম প্রকৃত বিশ্ব সাম্রাজ্যের কাহিনী। ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী, যদি আমরা এই কাহিনীকে সংশোধন করতে না পারি, তবে এর পরিণতি হবে মর্মান্তিক। এ পর্যন্ত কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয়নি। প্রতিটি সাম্রাজ্যেরই পতন ঘটেছে ভয়াবহ ভাবে। বিস্তৃতির পর্যায়ে প্রতিটি সাম্রাজ্যই প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছে। এরপর নিজেদের পতন ঘটিয়েছে। অন্যদের শোষণ করে কোন দেশ বা রাষ্ট্রীয় জোট নিজ

ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে পারেনি।

আমরা যাতে এই কাহিনীকে সংশোধন করার কাজে অনুপ্রাণিত হই সেজন্য এই বইটি লেখা হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, যখন আমাদের সিংহভাগ কিভাবে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিগুলো আমাদেরকে শোষণের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে শুষে নিচ্ছে ও আমাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করছে তা বুঝতে শিখবে তখন অবশ্যই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। আমরা নিশ্চয়ই এমন বিশ্বে বাস করতে চাইব না, যেখানে গুটিকয়েক ব্যক্তি ঐশ্বর্যের সাগরে সাঁতার কাটবে, আর বাকিরা তলিয়ে যাবে দারিদ্র্যে, পরিবেশ দূষণ ও সন্ত্রাসের পঙ্কে। বরঞ্চ আমরা এমন এক বিশ্ব গড়ে তুলব যেখানে সকলেই গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

সমস্যাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে সমাধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। অপরাধকে স্বীকার করা হচ্ছে সংশোধনের মূল চাবিকাঠি। তাহলে এই বইটি হোক আমাদের পুনরুদ্ধারের সূচনা। ভারসাম্যপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাজ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন আমরা সব সময়ই দেখি তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এই বইটি হোক প্রধানতম অনুপ্রেরণা।

বহু ব্যক্তি, যাদের সাথে আমি কাজ করেছি, তাদের কথা বলা হয়েছে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে, তাদেরকে ছাড়া এই বইটি লেখা সম্ভব হতো না। আমি সকল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার জন্য কৃতজ্ঞ।

যারা আমাকে এই বই লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন—স্টেফান রেখশাফেন, বিল ও সিন টুইস্ট, অ্যান কেম্প, আর্ট রফে, ড্রিম চেঞ্জ ওয়ার্কশপগুলোর সহ-সমন্বয়কারী ইভ ব্রুস, লিন রবার্টস হেরিক ও মেরি টেন্ডল, দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ আমার জীবন সঙ্গিনী উইনিফ্রেড এবং আমাদের মেয়ে জেসিকাসহ সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক ব্যাংক ও বহু দেশের রাজনীতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মাইকেল বেন লি, সাব্রিনা বোলোগনি, হুয়ান গ্যাব্রিয়েল ক্যারাস্কো, জেমি গ্র্যান্ট ও পল শ। অনেকেই তাদের নাম গোপন রেখেছেন বোধগম্য কারণে। তারপরেও আমি তাদের প্রতি এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বই লেখা শেষ হওয়ার পর বেরেট কোহলার প্রকাশনী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা স্টিফেন পিয়েরসান্তি এটিকে প্রকাশের দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার দক্ষ সম্পাদনা বইটিকে উপস্থাপন করেছে এক আকর্ষণীয় আঙ্গিকে। এই সুযোগে আমি তাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রিচার্ড পার্লকে, যিনি স্টিভেনের সাথে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সম্পাদনার দায়িত্ব যাদের উপরে অর্পিত হয়েছিল সেই নোভা ব্রাউন, র‍্যান্ডি ফিয়াট, অ্যালেন জোন্স, ক্রিস লী, জেনিফার লিম, লরি পেলোশুভ ও জেনি উইলিয়ামসকে আমি

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডেভিড কোর্টেন পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এর ক্রটিগুলোকে নিরসন করেছেন সুদক্ষভাবে। আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এজেন্ট পল ফেডোরকো, ডিজাইনার ভ্যালেরি ক্রুস্টার ও ভাষাবিদ টড মানজাকেও।

বইটিকে নিখুঁত ভাবে মুদ্রণের দায়িত্ব যাদের উপরে অর্পিত হয়েছিল সেই কেন লুপফ, রিক উইলসন, মারিয়া জেসাস আগুইলো, প্যাট অ্যান্ডারসন, মারিনা কুক, মাইকেল ক্রলি, রবিন ডোনোভান, ক্রিস্টেন ফ্রাঞ্জ, টিফানি লী, ক্যাথেরিন সেংগ্রোন ও ডায়ান প্ল্যাটনারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বেরেট কোহলারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জীবন শিব সুব্রামানিয়ানের প্রতি।

যে সব ব্যক্তি মেইনে আমার সহকর্মী ছিলেন, যারা অজান্তেই একজন অর্থনৈতিক ঘাতককে বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছেন, তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে যারা আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, আমার সাথে বিশ্বের বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন, আমার সাথে বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে অভিবাদন করছি। প্রকাশনী সংস্থা ইনার ট্র্যাডিশন্স ইন্টারন্যাশনালের মালিক এহুদ স্পার্লি ও তার কর্মচারীগণ আমার আগের বইগুলো ছেপে আমাকে লেখক পরিচিতি পাইয়ে দিয়েছেন। তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বহু অখ্যাত-অজ্ঞাত ব্যক্তি আমাকে অরণ্যে, মরুভূমিতে, দুর্গম পর্বতমালায় সঙ্গ, আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছেন। তাদের স্বাভাবিক জীবন ও সুস্থ চিন্তা আমাকে বহুবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি তাদের প্রতি নিজ হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জন পার্কিন্স

আগস্ট, ২০০৪

প্রারম্ভ

ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো আন্দিজ পর্বতমালায় ৯ হাজার ফুট উচ্চতায় এক আগ্নেয় উপত্যকায় অবস্থিত। আমেরিকায় কলম্বাস এসে পৌঁছার দীর্ঘদিন আগে প্রতিষ্ঠিত এই নগরের বাসিন্দাগণ চারপাশের পর্বতশৃঙ্গগুলোতে বরফ দেখতে অভ্যস্ত। অথচ এই শহরটি মূল বিষুবরেখার মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ইকুয়েডরের আমাজন অরণ্যাঞ্চলে অবস্থিত শেল শহরটি একটি সীমান্ত শহর ও সামরিক ঘাঁটি। শহরটি আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠান দেশের দ্বারা নির্মিত। কুইটো থেকে প্রায় ৮ হাজার ফুট নিচুতে শেল শহরটি অবস্থিত। এই প্রাণচঞ্চল শহরটির অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে সৈনিক, জ্বালানী কর্মী এবং শুয়ার ও কিশওয়া গোত্র দু'টির সদস্যগণ। শেল শহরে শুয়ার ও কিশওয়া গোষ্ঠী দুটির লোকজন শ্রমিক ও বেশ্যা রূপেই পরিচিত।

এই অঞ্চলের এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে হলে এক বিপদসঙ্কুল ও শ্বাসরুদ্ধকর পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় চারটি ঋতুরই দেখা মেলে।

আমি এই পার্বত্য সড়ক দিয়ে বহুবার ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কখনই এর নিসর্গ বৈচিত্র্য আমাকে ক্লান্ত করে নি। সুউচ্চ পর্বত, সৃজনশীল জলপ্রপাত ও রঙ্গীন বৃক্ষশ্রেণী সড়কটির পশ্চিম দিক জুড়ে বিস্তৃত। সড়কটির পূর্ব দিক প্রায় সোজা নেমে গেছে এক পাহাড়ি অধিত্যকায়। এই অধিত্যকা দিয়ে কোতোপাক্তি পর্বতশৃঙ্গ থেকে সর্পিল প্রবাহে নেমে আসা পাস্তাজা নদী ছুটেছে তিন হাজার মাইল দূরের আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে। ইনকা সভ্যতার স্বর্ণ যুগে পাস্তাজা নদী দেবীর মর্যাদা পেত।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দে আমি একটি সুবারু আউটব্যাক গাড়িতে চড়ে শেলের উদ্দেশ্যে কুইটো ত্যগ করলাম। এই ভ্রমণটির উপলক্ষ ছিল এমন একটি কাজ সম্পন্ন করা, যা এর আগে আমাকে করতে হয়নি। আমি যে যুদ্ধের সূচনা করেছিলাম সেটার নিষ্পত্তি করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। যে দেশে এই যুদ্ধ চলছিল, সেই দেশের বাইরে এই যুদ্ধ ছিল অপরিচিত। অথচ এই যুদ্ধটি হচ্ছে আমাদের মত অর্থনৈতিক ঘাতকদের কর্মকাণ্ডের ফসল। আমি গিয়েছিলাম শুয়ার, কিশওয়া, আশুয়ার, জাপারো ও শিইয়ার গোত্রগুলোর সাথে আলোচনা করতে। এসব গোত্র ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের জমি, আবাসভূমি ও পরিবার ধ্বংস করা থেকে আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিহত করতে চাইছিল। এ জন্য তারা মৃত্যুকেও পরোয়া করছিল না। এসব গোত্রের জন্য এই যুদ্ধ ছিল তাদের সংস্কৃতি ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতকে সংরক্ষণ করার লড়াই। অন্যদিকে জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এই যুদ্ধ ছিল সমতা, অর্থ ও সম্পদ অর্জনের হাতিয়ার। এই যুদ্ধ ছিল কতিপয় লোভী ব্যক্তির বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের অন্যতম চাবিকাঠি।

আমরা অর্থনৈতিক ঘাতকেরা যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলা। আমরা হচ্ছি এমন একটি বিশেষ শ্রেণী যা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাকী বিশ্বকে আমাদের কর্পোরেটক্রেসির গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। এই কর্পোরেটক্রেসিই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে নিরঙ্কুশ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মাফিয়ার সদস্যদের মতই অর্থনৈতিক ঘাতকেরা সুযোগ-সুবিধা বিলায়। এগুলো মূলত ভৌত অবকাঠামো, যেমন বিদ্যুৎকেন্দ্র, হাইওয়ে, সমুদ্রবন্দর, সেতু, রেললাইন, বিমানবন্দর ও শিল্প স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এসব ঋণের মূল শর্ত হচ্ছে এই যে, এসব ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ যে কোন আমেরিকান কোম্পানীকে অবশ্যই দিতে হবে। তাই প্রকৃত অর্থে ঋণের অর্থ কখনই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যায় না। বরঞ্চ এটি ওয়াশিংটনের ব্যাংকিং হাউজ থেকে নিউইয়র্ক, হাউস্টন বা সানফ্রান্সিসকোর ইঞ্জিনিয়ারিং হাউজে স্থানান্তরিত হয় মাত্র।

ঋণের অর্থ হাতে না পেলেও ঋণগ্রহীতা দেশকে এই ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ করতে হয়। যখন একজন অর্থনৈতিক ঘাতক পুরোপুরিভাবে সফল হন তখন ঋণের অংক বিশালাকার ধারণ করে। তখন কয়েক বছরের মধ্যেই ঋণগ্রহীতা দেশটি ঋণখেলাপীতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। যখনই এই ঘটনা ঘটে তখনই আমরা মাফিয়ার মত ঋণখেলাপী দেশটির টুঁটি চেপে ধরে আমাদের স্বার্থ হাসিল করি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘে আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান, ঋণখেলাপী দেশে আমাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, আমাদের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর হাতে ঋণখেলাপী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে তুলে দেওয়া অথবা ঋণখেলাপী দেশের উপর দিয়ে অবাধে আমাদের যাতায়াতের অধিকার অর্জন করা। তারপরেও ঋণখেলাপী দেশটি আমাদের কাছে ঋণীই থাকে। সেই সাথে আমাদের বিশ্ব সাম্রাজ্যে আরেকটি দেশ সংযুক্ত হয়।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কুইটো থেকে শেলে যাওয়ার সময় আমার মনে ৩৫ বছর আগেকার স্মৃতিগুলো ভিড় জমাচ্ছিল। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আমি প্রথমবারের মত বিশ্বের এই অঞ্চলে পৌঁছেছিলাম। তার আগে আমি ইকুয়েডর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আহরণ করেছিলাম। আয়তনের দিক থেকে ইকুয়েডর যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের সমান। তারপরেও ইকুয়েডরে রয়েছে ৩০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, বিশ্বের পাখি সম্পদের ১৫% ও হাজার হাজার অজানা উদ্ভিজ্জ প্রজাতি। ছোট্ট এই দেশটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিপুল। দেশটির স্প্যানিশ ভাষী জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রাচীন ভাষাগুলোতে কথা বলা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশী। প্রথম দর্শনে আমার মনে হয়েছিল যে, এই দেশটি বুনো ও আকর্ষণীয়। মনে হয়েছিল যে, গোটা দেশটিই সরল, নির্মল ও নিষ্কলুষ।

পরবর্তী ৩৫ বছরে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন প্রথমবারের মত ইকুয়েডর ভ্রমণ করি তখন সবেমাত্র টেক্সাকো দেশটির আমাজান অরণ্যাঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের খোঁজ পেয়েছে। আজ

ইকুয়েডরের রপ্তানী আয়ের অর্ধাংশ আসে জ্বালানী খাত থেকে। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে আন্দিজ পর্বতমালায় প্রথম জ্বালানী সরবরাহের পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছি। পরবর্তী ৩৩ বছরে এই পাইপ লাইন থেকে কয়েক লক্ষ ব্যারেল জ্বালানী তেল চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের অরণ্যাঞ্চলে। এই অপচয়ের পরিমাণ ভালদেজ অঞ্চলে এক্সনের অপচয়েরও দ্বিগুণ। বর্তমানে একটি আমেরিকান জ্বালানী কনসোর্টিয়াম ১৩০ কোটি ডলার ব্যয়ে ইকুয়েডরে নতুন পাইপ লাইন স্থাপন করছে। এটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ইকুয়েডর যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানী রপ্তানীকারী শীর্ষতম ১০টি দেশের অন্যতমে পরিণত হবে। কিন্তু এরই মধ্যে দেশটির অরণ্যাঞ্চল ক্রমান্বয়েহ্রাস পাচ্ছে। পশু-পাখির প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে। বহু প্রাচীন জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এককালের স্বচ্ছ সলিল নদীগুলো রূপান্তরিত হয়েছে জ্বলন্ত দূষিত তেল প্রবাহে।

একই সময় প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলো পাল্টা লড়াই শুরু করে দিয়েছে। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে ৭ই মে ইকুয়েডরের ৩০ হাজার আদিবাসীর পক্ষে একদল আমেরিকান আইনজীবী শেভ্রন টেক্সকো কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এখনো চলছে। মামলার আর্জিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১-১৯৯২ সময়ের প্রতিদিনে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি উম্মুক্ত গর্তে ও নদীতে ৪০ লাখ গ্যালন বিষাক্ত বর্জ্য পানি নিস্কাশন করেছে। এই পানিতে ছিল জ্বালানী তেল, ভারী ধাতু ও কার্সিনোজেন। সে সাথে প্রতিষ্ঠানটি ৩৫০টি উম্মুক্ত বর্জ্য সঞ্চয়াগার ফেলে রেখেছে। এগুলোর বিষক্রিয়া মানুষ ও পশু-পাখির মৃত্যুর কারণে পরিণত হয়েছে।

আমার গাড়ির জানালার বাইরে বন ও নদী থেকে উঠে আসা কুয়াশাগুলো জমাট বাঁধছিল। ঘামে আমার শার্ট ভিজে গিয়েছিল। আমি পেটে চাপা ব্যথা অনুভব করছিলাম। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার তীব্র দাবদাহ ও পার্বত্য সড়কের সর্পিলতা আমার অস্বস্তির কারণে পরিণত হয়নি। ইকুয়েডরের এহেন পরিণতির জন্য যে আমিও দায়ী এই অপরাধবোধ ছিল আমার অস্বস্তির প্রধানতম কারণ। আমিও আমার মত অর্থনৈতিক ঘাতকদের কর্মকাণ্ডের কারণে এককালের স্বর্গপুরী আজ জীবন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও প্রযুক্তি ইকুয়েডরকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে জ্বালানী তেলের ব্যবসায় বিস্ফোরণ ঘটার পর ইকুয়েডরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০% থেকে ৭০%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকারের সংখ্যা ১৫% থেকে বেড়ে ৭০%-এ দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটি ডলার থেকে উন্নীত হয়েছে ১ হাজার ৬শ কোটি ডলারে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মালিকানার পরিমাণ ২০% থেকে নেমেছে ৬%-এ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক্ষেত্রে ইকুয়েডর একক কোন উদাহরণ নয়। আমরা, অর্থনৈতিক ঘাতকেরা যে ক'টি দেশকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছি সে ক'টি দেশই এহেন দুর্দশার শিকার হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের মোট ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার। এর বার্ষিক সুদের পরিমাণ হচ্ছে ৩০ হাজার ৫শ কোটি ডলার। তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশ সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে প্রতি বছর যে অর্থ ব্যয় করে তার চেয়ে এই অংক অনেক বেশী।

এমনকি প্রতি বছর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো মোট যে পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক সাহায্য রূপে পেয়ে থাকে তার চেয়ে এই অংক ২০ গুণ বেশী। বিশ্বের অর্ধেক লোক প্রতিদিন মাথাপিছু ২ ডলারের চেয়ে কম অর্থ আয় করত। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকেও এই জনগোষ্ঠীর আয় একই রকম ছিল। অন্যদিকে তৃতীয় ধনাঢ্যতম ১% ব্যক্তিবর্গ অর্থ ও জমির ৭০%-৯০% এর মালিকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য একেক দেশে এই পরিসংখ্যান একেক রকম।

সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র বানোতে প্রবেশ করার পর গাড়ির গতি কমে গেল। শহরটি উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি চুর্ফুরাহগোয়া থেকে ভূগর্ভস্থ দিয়ে বয়ে আসা ছোট ছোট নদীগুলোর উষ্ণ পানি প্রবাহ হঠাৎ করেই শহরের বিভিন্ন স্থানের ভূস্তর ভেদ করে উপরে উঠে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চুইংগাম ও কুকি হাতে করে আমাদের গাড়ির দু'পাশে কতক্ষণ দৌড়াল এগুলোকে বিক্রি করার আশায়। এরপর গাড়ি বেরিয়ে এলো বানো শহর থেকে। গাড়ির গতি বেড়ে গেল। আচমকাই শেষ হয়ে গেল সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। হঠাৎ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো দান্তের ইনফার্নোর আধুনিকতম সংস্করণ।

নদীর বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অতিকায় দানবীয় ধূসর দেয়াল। এর কংক্রিট গঠন চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনায় একেবারেই বেমানান, বিসদৃশ ও বিশ্রী। তবে এটাকে দেখে আমি অবাক হয়নি। আমি জানতাম যে, এটি ঠিক এ স্থানেই ওৎ পেতে রয়েছে। আমি এর আগে এটাকে বহুবার দেখেছি। আগে আমি এটাকে উন্নয়নের ফসল বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন এটাকে দেখলে আমার দেহ মন ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই কংক্রিটের দেয়ালটি একটি বাঁধ। এই বাঁধটি পাস্তাজা নদীর স্রোতগুলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে পর্বত খুঁড়ে তৈরি করা বিশাল সব সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। আর এ থেকে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। বাঁধটির আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে ১৫৬ মেগাওয়াট আগোয়ান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এর তৈরি বিদ্যুতে যে সব শিল্প পরিচালিত হয় সেসব শিল্পের মালিক পরিবারগুলো প্রতিনিয়তই ধনী হচ্ছে। কিন্তু পাস্তাজা নদীর দু'তীরে বসবাসকারী গোত্রগুলোর জন্য বাঁধটি অভিশাপে পরিণত হয়েছে। ইকুয়েডরে আমি ও আমার সতীর্থ অর্থনৈতিক ঘাতকদের কর্মকাণ্ডের সুবাদে এ ধরনের বহু প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পের কারণেই দেশটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের সদস্যে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে দেশটির আদিবাসী গোত্রগুলো আমাদের জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এসব প্রকল্পের কারণেই ইকুয়েডর পুরোপুরিভাবে ডুবে গেছে বৈদেশিক ঋণে। দেশটির বার্ষিক বাজেটের সিংহভাগ এখন ব্যয় হয় ঋণ পরিশোধ খাতে। অথচ এই অর্থ দিয়ে দেশটি দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী নিজ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারত। বৈদেশিক ঋণভার কমানোর লক্ষ্যে ইকুয়েডর নিজ বনাঞ্চল আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিক্রি করছে। দেশটির আমাজান অঞ্চলের

পেট্রোলিয়াম সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম সম্পদের সাথে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই দীর্ঘদিন আগেই অর্থনৈতিক ঘাতকগণ ইকুয়েডরের উপরে তাদের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ঋণভারে জর্জরিত ইকুয়েডর এখন বাধ্য হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে একের পর এক তেলক্ষেত্র ইজারা দিতে।

২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর ইকুয়েডরের উপর বিশ্ব সাম্রাজ্যের চাপ শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, তখন ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্য থেকে পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানী সরবরাহকারী দেশ ভেনিজুয়েলা নিজ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করল জনপ্রিয় নেতা হুগো শাভেজকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন জ্বালানী বিক্রি বন্ধ করার হুমকি দিয়ে। অর্থনৈতিক ঘাতকেরা ইরাকে ও ভেনেজুয়েলায় ব্যর্থ হলেও ইকুয়েডরে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন চলছে ইকুয়েডরকে নিঃশেষে দোহন করার পালা।

অর্থনৈতিক ঘাতকগণ যে সব দেশকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছে সেগুলোর সাধারণ প্রতিচ্ছবি হচ্ছে ইকুয়েডর। দেশটির অরণ্যাঞ্চল থেকে উত্তোলিত জ্বালানী সম্পদ বিক্রি করে প্রতিবছর যে অর্থ আয় হয় তার ৭৫% যায় আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলে। বাকি ২৫%-এর মধ্যে ১৮.৭৫% ব্যয় হয় বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ খাতে। ৩.৭৫% ব্যয় হয় সরকারের বিভিন্ন খরচ মেটাতে। এর বৃহদাংশ যায় সামরিক ব্যয় খাতে। শেষ ২.৫% ব্যয় হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতগুলোতে। অথচ ইকুয়েডরের অরণ্যাঞ্চলের বাসিন্দা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর বাসস্থান, আবাদী জমি, পশুচারণ ভূমি ও সুপেয় পানির উৎস ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে বাঁধ, জ্বালানী উত্তোলন ও পাইপ লাইনের কারণে। এই অবস্থা বজায় থাকলে এসব আদিবাসী গোষ্ঠীর নিদর্শন ইকুয়েডরের যাদুঘরগুলোতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইকুয়েডরের কয়েক লাখ আদিবাসী, বিশ্বের কয়েক কোটি বাসিন্দা রূপান্তরিত হতে পারে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীতে। এরা কমিউনিজমের অনুসারী নয়, নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী নয়, জন্মগতভাবে অনিষ্টকরও নয়। এরা দীর্ঘদিন যাবৎ নৈরাশ্যে জর্জরিত হওয়ার কারণে এখন বেপরোয়া। বাঁধটির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম যে, কখন এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী পাল্টা পদক্ষেপ নেবে? অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীগণ ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন আমেরিকা স্পেনের কুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এরকম কোন ঘটনা কি ঘটবে ইকুয়েডরে?

বর্তমান বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের কৌশলের সূক্ষ্মতা রোমান সাম্রাজ্যের সেঞ্চুরিয়ান, স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের কনকুইস্তাদার এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকেও লজ্জা দেবে। অর্থনৈতিক ঘাতকেরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম রকমের সুকৌশলী। আমরা ইতিহাস থেকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। বর্তমানে আমরা যুদ্ধ সাজে

সজ্জিত হই না। আমরা অস্ত্রও বহন করি না। সাধারণ মানুষ থেকে আমাদের আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। ইকুয়েডর, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মত দেশগুলোতে আমরা স্কুল শিক্ষক ও দোকানদার। ওয়াশিংটনে ও প্যারিসে আমরা আমলা ও ব্যাংকার। আমরা ভদ্র ও স্বাভাবিক। আমরা গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করি। দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াই। আমরা পরের উপকার করার ইচ্ছাকে প্রচার করি। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আমাদের মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কথা বলি। বিভিন্ন দেশের সরকারী কমিটিগুলোতে নানারকম তথ্য ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করি। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামষ্টিক অর্থনীতির জয়গান গাই।

আমরা সব সময়ই প্রকাশ্যে কাজ করি, সরাসরি ভাবে নিজেদের প্রচার চালাই। এভাবেই আমরা নিজেদের জনসম্মুখে উপস্থাপন করি, বিশ্বও আমাদের এভাবেই গ্রহণ করে। এভাবেই বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। আমরা সহজে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করি না। কেননা, গোটা পদ্ধতিই ছলচাতুরীর উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে এতকিছুর পরেও কাগজে-কলমে পদ্ধতিটি বৈধ ভাবে পরিচালিত।

একটা বিষয় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে মনে রাখা উচিত। যখন অর্থনৈতিক ঘাতকেরা ব্যর্থ হয় তখন শৃগালেরা এগিয়ে আসে। শৃগালদের উৎপত্তি প্রাচীনতর সভ্যতাগুলোর যুগে। বস্তুতপক্ষে আমাদের ছায়াতলেই শৃগালেরা সবার অলক্ষ্যে ঘোরাফেরা করে। যখন শৃগালেরা সফল হয় তখন রাষ্ট্রনায়কগণ হয় ক্ষমতাচ্যুত হন, না হয় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। কখন কখনও শৃগালেরাও ব্যর্থ হয়। যেমন ইরাকে ও আফগানিস্তানে প্রথমে অর্থনৈতিক ঘাতকেরা ও পরে শৃগালেরা ব্যর্থ হয়েছিল। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাচীনতম পদ্ধতি অর্থাৎ সামরিক অভিযানকে কাজে লাগানো হয়। এসব অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের যুব শক্তি প্রতিপক্ষকে হত্যা করে ও নিজেরা মৃত্যুবরণ করে।

যখন আমার গাড়ি আগোয়ান বাঁধের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তখন আমি আমার শারীরিক অস্বস্তিগুলোকে তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। আমার শার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল। পেটে তীব্র চাপ অনুভব করছিলাম। আমার গাড়ি তখন পাহাড়ি পথ বেয়ে ছুটে যাচ্ছিল নিচের জঙ্গলের দিকে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একদল বিক্ষুব্ধ আদিবাসী। আমার কর্মকাণ্ডের সুবাদে গড়ে উঠা বিশ্ব সাম্রাজ্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে আমৃত্যু লড়াই করার জন্য তারা তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক অপরাধবোধ আমার সর্বসত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে তখন।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক অজপাড়াগার একটা শান্তশিষ্ট ছেলে কিভাবে এই নোংরা জগতে প্রবেশ করলো?

প্রথম পর্ব

১৯৬৩-১৯৭১

অধ্যায়-১
এক অর্থনৈতিক ঘাতকের জন্ম

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল একেবারে নির্দোষভাবে।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে একটি আমেরিকান মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান রূপে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মা ও বাবা দু'জনেই ছিলেন তিন শতাব্দী যাবৎ নিউ ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী আমেরিকান পরিবারের সন্তান। অতি গোঁড়া পূর্বসূরীদের মতই আমার মা-বাবা ছিলেন কঠোর, নীতিপরায়ণ ও রিপাবলিকান পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। তাদের পরিবারের মধ্যে তারাই প্রথম কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, তাও আবার বৃত্তি পেয়ে। আমার মা হাই স্কুলে ল্যাটিন ভাষার শিক্ষিকা হয়েছিলেন। আমার বাবা নৌ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট রূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরে নিয়মিতভাবে যাতায়াতকারী একটি জ্বালানী বহনকারী বাণিজ্যিক জাহাজের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন তিনি। নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের হ্যানোভার শহরে যখন আমার জন্ম হয়েছিল তখন আমার বাবা টেক্সাসের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ভাঙ্গা নিতম্ব মেরামত করার জন্য। আমার বয়স যখন এক বছর তখন প্রথমবারের মত বাবা আমাকে দেখেছিলেন।

ফিরে আসার পর বাবা টিস্টন স্কুলে ভাষা শিক্ষকের চাকরি নিলেন। স্কুলটি নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি গ্রামে অবস্থিত। গোটা ক্যাম্পাসটি পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, স্কুলটি টিস্টন শহরের উপরে উদ্ধত ভঙ্গিতে রাজত্ব করছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলটির প্রতিটি ক্লাসে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হতো। এই বিশেষ স্কুলের ছাত্রদের সিংহভাগই ছিল বুয়েন্স আয়ার্স, কারাকাস, বোস্টন ও নিউ ইয়র্কের বিত্তবান সম্প্রদায়ের সন্তানেরা।

আমার পরিবার উচ্চবিত্ত ছিল না। তবে কখনই আমরা নিজেদেরকে দরিদ্র ভাবতাম না। স্কুল শিক্ষক হিসেবে আমার মা-বাবা খুব ভালো বেতন পেতেন না, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাড়ি, খাবার, বিদ্যুৎ, পানি ও বাড়ি দেখাশুনা করার জন্য কয়েকজন কর্মচারী বিনামূল্যে দিতো। আমার বয়স যখন চার বছর তখন আমি প্রাথমিক স্কুলের ডাইনিং রুমে বিনা পয়সায় খাবার খেতাম। আমার বাবা যে রাগবি দলের কোচ ছিলেন সেই দলের বল বহন

করতাম। লকার রুমে খেলোয়াড়দের তোয়ালে সরবরাহ করতাম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, টিস্টন স্কুলের শিক্ষকগণ ও তাদের স্ত্রীরা টিস্টন শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে নিজেদেরকে অনেক বেশী মর্যাদাশীল মনে করতেন। আমার বাবা ঠাট্টা করে বলতেন যে, তারা নাকি কতকগুলো গেঁয়ো চাষাভুষাকে শাসন করছেন। তার কথার সুর থেকেই বোঝা যেত যে, এটা মোটেও ঠাট্টার ছলে বলা হয়নি।

প্রাথমিক নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে যারা আমার বন্ধু ছিল তারা সবাই ছিল গরীব পরিবারের সন্তান। তাদের মা-বাবারা ছিল কৃষি খামারের শ্রমিক, প্রান্তিক পেশাগুলোতে নিয়োজিত ব্যক্তি, কল-কারখানার শ্রমিক। তারা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাসকারী শিক্ষকদের চরমভাবে ঘৃণা করত। অন্যদিকে আমার মা-বাবা আমাকে কখনই শহরের মেয়েদের সাথে মিশতে দিতেন না। তাদের মতে, ওরা ছিল নোংরা মেয়ে ও বেশ্যা! অথচ আমি শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই এসব মেয়ের সাথে স্বাচ্ছন্দে মেলামেশা করেছি। এমনকি তাদের সাথে বই ও রং পেন্সিল নিয়ে বদলাবদলি খেলেছি। বড় হয়ে একবারে টিস্টন শহরের তিন মেয়ে অ্যান, প্রিমিলা ও জুডির প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি। আমি আমার মা-বাবার চিন্তাধারাকে ঠিক মত বুঝতে হিমসিম খেয়েছি। তারপরেও কখনই তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করি নি।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমার দাদা নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি নির্জন হ্রদের তীরে একটি পল্লীভবন তৈরি করেছিলেন। প্রতি বছর আমরা সেখানে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতাম। বাড়িটির তিন পাশে অরণ্য ও এক পাশে ছিল হ্রদ। রাতের বেলায় পেঁচার ডাক ও পাহাড়ি সিংহের গর্জন শোনা যেত। সেখানে আমাদের কোন প্রতিবেশী ছিল না। কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র কিশোর। সে সময় আমি গাছগুলোকে বানাতাম ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন যুগের যোদ্ধা। আর আমি হতাম রাজা আর্থার। আমাদের কাজ ছিল বিপদগ্রস্ত অ্যান, প্রিসিলা বা জুডিকে উদ্ধার করা। তবে প্রতি বছরই আমার নায়িকা পাল্টে যেত। কিন্তু আমার আবেগ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তা আমার মনের ভেতরেই চাপা থাকত।

১৪ বছর বয়সে আমি টিস্টন স্কুলের বিনা বেতনের ছাত্রদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হলাম। মা-বাবার চাপের মুখে শহরের সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করলাম। সে সাথে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে আমার সম্পর্কের ইতি ঘটলো। যখন আমার নতুন সহ শিক্ষার্থীরা ছুটি কাটাতে তাদের প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতে ফিরে যেত তখন আমি টিস্টন পাহাড়ে একা একা সময় কাটাতাম। আমার নতুন বন্ধুরা সদ্য ভর্তি হওয়া মেয়েদের সাথে চুটিয়ে প্রেম করত। অথচ আমার কোন বান্ধবী ছিল না। যে ক'টি মেয়েকে আমি চিনতাম তারা ছিল বেশ্যা! তাদেরকে আমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, তারাও আমাকে ভুলে গিয়েছিল। আমি ছিলাম একা, নিজ হতাশার কারাগারে বন্দী।

আমার মা-বাবা অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তারা আমাকে এই কথা বলে আশ্বস্ত করতেন যে, এ রকম একটা সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ জন্য আমার আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। একদিন আমি আমার পরিবারের

নৈতিক মানদণ্ড অনুয়ায়ী আদর্শ স্ত্রী পাব। এসব কথা শুনে আমি নীরব ক্রোধে ফুঁসতাম। আমি মেয়েদের সঙ্গ পেতে চাইতাম। সদ্য জেগে উঠা যৌন ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে চাইতাম। বেশ্যা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রলোভনীয় বস্তু।

তারপরেও আমি বিদ্রোহ করি নি। বরঞ্চ ক্রোধকে রূপান্তরিত করেছি চমৎকার ফলাফলে। পরীক্ষায় আমি সব সময়েই গোল্ডেন-এ গ্রেড পেয়েছি। স্কুলের রাগবি ও বাস্কেটবল দল দু'টোর অধিনায়ক হয়েছি। স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। আমি আমার ধনী ক্লাসমেটদের উপর সব সময়েই টেক্কা মেরে যেতাম। আর মনে মনে গোপন ইচ্ছা পোষণ করতাম চিরদিনের জন্য টিস্টন ছেড়ে যাওয়ার। এ লেভেল পাস করার পর আমি ব্রাউন কলেজে ক্রীড়াবৃত্তি ও মিডলবারি কলেজে ছাত্রবৃত্তির প্রস্তাব পেলাম। আমি ব্রাউনকে বেছে নিলাম তিনটি কারণে। এক. এটি আইভি লীগের সদস্য। দুই. এটি একটি আধুনিক শহরে অবস্থিত। তিন. আমি একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আমার মা-বাবা বললেন মিডলবারিকে। মা মিডলবারি থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী পাশ করেছেন। আর বাবা সেখান থেকে মাস্টার্স পাশ করেছেন।

বাবা শুধোলেন, "যদি তোর পা ভাঙে বাবা? এরচে' ছাত্রবৃত্তি অনেক ভালো।" আমি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

মিডলবারি কলেজ ভারমন্টের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। আর এটি টিস্টল স্কুলের বৃহত্তর প্রতিচ্ছবি। এখানে সহশিক্ষা প্রচলিত। অথচ টানা চার বছর আমি মেয়েদের সাথে একই ক্লাসে পড়াশুনা করি নি। এছাড়াও, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। অথচ আমি ছিলাম গরীব। পরিবেশ দেখে আমার আত্মবিশ্বাস উঠে গেল। হীণ্ন্যতায় আক্রান্ত হলাম, মানসিকভাবে নিঃস্ব বোধ করলাম। আমি বাবার কাছে অনুমতি চাইলাম একেবারে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে বা এক বছর পরে পড়াশুনা শুরু করতে। আমি মনে মনে চাইছিলাম বোস্টনে এক বছর থেকে নগর জীবন ও নারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। কিন্তু বাবা মোটেও রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি অন্যের ছেলে-মেয়েদের তৈরি করছি উচ্চশিক্ষার জন্য। অথচ আমার ছেলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়?"

আমি এখন বুঝি যে, মানুষের জীবন অসংখ্য সমানুপাতিক ঘটনার সমাহার। কিভাবে এসব ঘটনার প্রতি আমরা সাড়া দিই, কিভাবে আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগাই—সেটাই হচ্ছে আসল কথা। ভাগ্যচক্রের চৌহদ্দির মধ্যে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সেগুলোই আমাদের প্রকৃত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। মিডলবারিতে পড়ার সময় দুটো বড় সমানুপাতিক ঘটনা ঘটলো যা আমার জীবনকে পাল্টে দিন। আমি একই সময় দু'জন ব্যক্তির সাথে পরিচিত হলাম। একজন হলো এক ইরানী ছাত্র, যার বাবা ইরানী সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল ও ইরানের শাহের একজন ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। আরেকজন হলো এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী, যার নাম অ্যান। একে দেখে আমার কিশোর বেলার বান্ধবী অ্যানের কথা মনে পড়লো।

ইরানী ছাত্রটির নাম ধরা যাক ফারহাদ। সে রোমে কিছুদিন পেশাদারী ফুটবল লীগে খেলেছিল। তার শরীরের গঠন ছিল এক আদর্শ ক্রীড়াবিদের মতো। কালো কোঁকড়ানো চুল, শান্ত বাদামী চোখ, পারিবারিক আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত আকর্ষণ মেয়ে মহলে তার অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে ছিল আমার বিপরীত। আমি বহু পরিশ্রম করে তার সাথে বন্ধুত্ব গড়েছিলাম। ফারহাদ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল - যা পরবর্তী সময় আমার অনেক কাজে লেগেছে।

একই সময় আমি অ্যানের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। সে সময় সে আরেকটি কলেজের ছাত্রের সাথে আন্তরিকভাবে প্রেম করছিল। তারপরও আমি তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলাম। এই বন্ধুত্বে জৈবিক আসক্তির কোন স্পর্শ ছিল না। বন্ধুত্ব ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রকৃত ভালবাসা।

ফারহাদ আমাকে অ্যালকোহল পান করতে শেখাল, নৈশকালীন উদ্দাম পার্টিগুলোতে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাল, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করল। আমি ইচ্ছা করেই মন দিয়ে পড়াশুনা করা বন্ধ করে দিলাম। আমি আমার বাবার উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পড়াশুনার ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার গ্রেড অ্যাভারেজ নিচে নেমে গেল, আমার ছাত্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বর্ষের মাঝখানে আমি পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করার হুমকি দিলেন। ফারহাদ আমাকে উৎসাহিত করল বাবার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে। আমি ঝড়ের গতিতে ডিনের অফিসে ঢুকে কলেজ ত্যাগ করার নোটিশ দিলাম। এই এক ঘটনায় আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

মিডলবারি শহরে আমার জীবনের শেষ সন্ধ্যাকে উদযাপন করার জন্য আমি ও ফারহাদ গেলাম একটি স্থানীয় বারে। এক দশাসই আকারের মাতাল কৃষক তার স্ত্রীর সাথে ফস্টিনস্টি করার অভিযোগ তুলল আমার বিরুদ্ধে। তারপর সে আমার শার্টের কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর আমাকে ছুঁড়ে মারল দেওয়ালের উপরে। বিদ্যুৎগতিতে রুখে দাঁড়াল ফারহাদ। ছুরি বার করে সে কৃষকের চিবুক ফেঁড়ে ফেলল। তারপর আমাকে টেনে হিঁচড়ে জানালার কাছে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারল। এরপর নিজে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। আমরা অটার ক্রীক নদীর উঁচু পাড়ের উপরে আছড়ে পড়লাম। কোন রকমে ফিরে এলাম নিজেদের ছাত্রাবাসে।

পরদিন ক্যাম্পাসে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে আমাকে জেরা করল। আমি পুরো ঘটনা বেমালুম অস্বীকার করলাম। তারপরেও ফারহাদকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হলো। আমরা দু'জনেই বোস্টনে গিয়ে এক সাথে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করলাম। আমি হার্স্টের রেকর্ড আমেরিকান/সানডে অ্যাডভার্টাইজার সংবাদ সংস্থায় চাকরি নিলাম সানডে অ্যাডভার্টাইজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের ব্যক্তিগত সহকারী রূপে। এ ঘটনা ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে।

ওই বছরের শেষদিকে আমার কয়েকজন সহকর্মীকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য

বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখাতে হলো। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে আমি ঝটপট বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে ভর্তি হলাম। ততদিনে অ্যান পুরোনো প্রেমের পাট চুকিয়ে দিয়ে আমার সাথে জোরসে প্রেম চালাতে শুরু করেছে। প্রায় সে মিডলবারি থেকে বোস্টনে চলে আসতো আমার সাথে সময় কাটাতে। আমি তো তখন মনের আনন্দে স্রেফ উড়ে বেড়াচ্ছি।

অ্যান গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি পেল ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে। তখনও আমার গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি পেতে আরও এক বছর বাকি। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অ্যান আমার সাথে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে কিছুতেই রাজি হলো না। আমি ঠাট্টা করে বললাম যে, আমাকে তো ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। মনে মনে কিছুটা বিতৃষ্ণ হলাম আমার মা-বাবার মত সেকেলে ও গোঁড়া মতাদর্শকে মানার কারণে। তারপরেও আমি এই জীবনকে পুরোপুরি ভাবে উপভোগ করতে চাইছিলাম। অবশেষে আমাদের বিয়ে হলো।

অ্যানের বাবা ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী প্রকৌশলী। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেমের তৈরির কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করেছিলেন। এর সুবাদে তাকে নৌবাহিনী বিভাগের একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তার সেরা বন্ধু ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর এক অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা। অ্যান তাকে আঙ্কল ফ্রাঙ্ক বলে ডাকত। তবে এটি তার আসল নাম ছিল না। এনএসএ আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থা হলেও এটি তারচেয়েও কম পরিচিত।

আমাদের বিয়ে হওয়ার ক'দিন পরেই সামরিক বাহিনী আমাকে ডাকল শারীরিক পরীক্ষার জন্য। আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। সে সাথে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়ার আশঙ্কা আমাকে চেপে ধরল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লড়াই করার সম্ভাবনা আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করল। অথচ সব সময়ই যুদ্ধ আমাকে আকর্ষণ করেছে। আমি ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার মুখের উপনিবেশ স্থাপনকারী বীরদের গল্প শুনেছি। এদের মধ্যে টমাস পেইন ও ইথান অ্যাসেন ছিলেন আমার পূর্ব পুরুষ। আমি নিউ ইংল্যাণ্ড, নিউইয়র্কের সব ক'টি যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেছি। এসব স্থানে ইংরেজদের সাথে রেড ইন্ডিয়ান, ইংরেজদের সাথে ফরাসী, আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ইংলিশ বাহিনীর ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বহু লড়াই ঘটেছে। আমি সব ক'টি ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ে শেষ করেছি। যখন মার্কিন সেনাবাহিনীর কমান্ডের ইউনিটগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম বারের মত প্রবেশ করল তখনই আমি যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর ধ্বংসলীলার বিবরণ যত বেশী করে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে লাগল, তত দ্রুত আমার মত পাল্টাতে থাকল। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, পেইন ও অ্যাসন কোন পক্ষে যোগ দিতেন? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম যে, তারা নিঃসন্দেহে ভিয়েতকংদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন।

এমন সময় আঙ্কল ফ্র্যাঙ্ক আমাকে উদ্ধার করলেন। তিনি জানালেন যে, এনএসএ'র চাকরি নিলে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আমি রাজি হওয়ায় তিনি তার সংস্থায় একগাদা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন। এর মধ্যে পুরো একদিন

কেটে গেল চরমভাবে কষ্টদায়ক পলিগ্রাফ পরীক্ষায়। আমাকে জানানো হলো যে, আমি এনএসএ'র জন্য উপযুক্ত কিনা তা এসব পরীক্ষা থেকে বোঝা যাবে। এ ছাড়াও, এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে আমার সরলতা ও দুর্বলতাগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যাবে। সেই সাথে আমার সম্ভাব্য ক্যারিয়ারকেও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এসব পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হলে এনএসএ আমাকে প্রশিক্ষণ দেবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মনোভাব দেখে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে আমি এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না।

এক পরীক্ষার সময় আমি স্বীকার করলাম যে, দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করছি। তখন পরীক্ষকগণ বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না দেখে আমি রীতিমত অবাকই হলাম। বরঞ্চ তারা গুরুত্ব আরোপ করলেন আমার বেড়ে উঠা, মা-বাবার প্রতি আমার মনোভাব, ধনী ও বিশ্বাসী ছাত্রদের মাঝে দরিদ্র ও গোঁড়া ছাত্র রূপে অবস্থান করার কারণে সৃষ্ট আবেগ ও ভোগসুখবাদের প্রতি আমার অনুভূতির উপর। তারা আমার জীবনে নারী, যৌনতা ও অর্থের অভাবের কারণে সৃষ্ট নিরাশা সম্পর্কে খোলামেলা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা এই নিরাশা থেকে উদ্ভূত আজগুবী স্বপ্নগুলোকে নিয়েও আলোচনা করলেন। তারা ফারহাদের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বিশেষ করে তাকে রক্ষা করার জন্য ক্যাম্পাস পুলিশের কাছে আমার মিথ্যা ভাষণ পরীক্ষকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে, এসব নেতিবাচক ঘটনার কারণে এনএসএ আমাকে প্রত্যাখান করবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সংস্থাটির পরীক্ষা চললো। কয়েক বছর পর আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ সব নেতিবাচক ঘটনাকে এনএসএ ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যরূপে ধরে নিয়েছিল। সংস্থাটি আমার দেশপ্রেম নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায়নি। বরঞ্চ তারা আমার প্রথম যৌবনের হতাশাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। মা-বাবার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, নারীদের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ও আমার অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এনএসএকে সুযোগ দিয়েছিল আমাকে প্রলুব্ধ করতে। পড়াশুনায় ও খেলাধুলায় সেরা ফলাফল অর্জনের জন্য আমার তীব্র আগ্রহ, মা-বাবার বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ, বিদেশীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতা, পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলার সক্ষমতা—সব মিলিয়ে আমি এনএসএ'র কাছে এক সম্ভাবনাময় এজেন্ট রূপে বিবেচিত হয়েছিলাম। আরও পরে আমি আবিস্কার করেছিলাম যে, ফারহাদের বাবা ইরানে আমেরিকার একজন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট রূপে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। তাই ফারহাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব এনএসএ'র কাছে ছিল একটি ইতিবাচক ঘটনা।

এনএসএ'র পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর আমাকে গোয়েন্দাগিরি শেখার আমন্ত্রণ জানানো হলো। ততদিনে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেছি। সেই সাথে ক্ষণিকের আবেগের বশবর্তী হয়ে আমেরিকান পীস কোরের একটি সেমিনারে যোগ দিয়েছি। এনএসএ'র চাকরির মতই পীস কোরের চাকরিও আমাকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে।

প্রথমে এই সিদ্ধান্তটি ছিল তাৎক্ষণিক, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন। তবে পরবর্তীকালে এর গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সেমিনারের শেষ পর্বে কোরের রিক্রুটিং অফিসার বিশ্বের কয়েকটি স্থানের নাম বললেন যেখানে কোরের নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা হবে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আমাজনের বৃষ্টিজঅরণ্য যেখানে এখনো প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো বাস করতো। এসব আদিবাসী গোষ্ঠীর বহু শাখা-প্রশাখা-উপশাখা ইউরোপীয়দের আগমনের বহু শতাব্দী আগে উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল।

এ রকমই একটি আদিবাসী গোষ্ঠী ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রথম বাসিন্দা। গোষ্ঠীটির নাম ছিল অ্যাবনাকি। আমি জানি যে, আমার মা ও বাবার বংশে অ্যাবনাকি রক্ত রয়েছে। তাই অ্যাবনাকি গোষ্ঠী যে অরণ্য-গাঁথাকে মরমে মরমে বুঝত, তা বোঝার জন্য আমার আগ্রহ ছিল একেবারে কিশোর বেলা থেকেই। সেমিনার শেষে আমি পীস কোরের রিক্রুটিং অফিসারের সাথে দেখা করে আমাকে আমাজনের বৃষ্টিজ-অরণ্যাঞ্চলে নিয়োগের অনুরোধ করলাম। তিনি এ বিষয়ে আমাকে পুরো নিশ্চয়তা দিলেন। তখন আমি আঙ্কল ফ্র্যাঙ্কের সাথে দেখা করে সব কথা জানালাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরিভাবে উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন যে, হ্যানয়ের পতনের পর আমাজন হবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রথমে তার মুখে হ্যানয়ের পতনের কথা শুনে রীতিমত হতবাক হলাম। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম যে, একমাত্র তার মতো ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের পক্ষেই এহেন সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করা সম্ভব।

তিনি বললেন, "আমাজন তো পেট্রোলিয়ামের মহাসাগরের উপরে ভাসছে। ওই অঞ্চলে আমাদের এমন সব এজেন্ট প্রয়োজন যারা স্থানীয় আদিবাসীদের হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে। পীস কোরের চাকরী হবে ভবিষ্যতের এজেন্টদের জন্য একটি চমৎকার প্রশিক্ষণ। তবে সেজন্য তোমাকে খুব ভালোভাবে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা শিখতে হবে। আর এখানে কাজ শুরু করার সাথে সাথে স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষাগুলোতে কথা বলাও শিখে নিও। এমনও তো হতে পারে যে, তোমার ভাগে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকরী লেখা রয়েছে।" শেষ কথাটি বলার সময়ে তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল।

আমি তখন তার কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছিলাম যে, কর্মজীবন শুরু করার আগেই একজন সাধারণ এজেন্ট থেকে আমার পদোন্নতি ঘটেছে একজন অর্থনৈতিক ঘাতকে। তখনও আমি এহেন পদের নাম শুনি নি। আর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছি এই পদটির প্রকৃত গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে। তখনও আমি জানতাম না যে, যুক্তরাষ্ট্রের বহু কনসালটিং ফার্ম ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোতে এ ধরনের বহু ব্যক্তি কাজ করছে। এরা সরকার থেকে একটি পয়সা বেতন না নিয়েও গোটা বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষা করছে। চলমান শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই যে এসব ব্যক্তি সুশ্রাব্য নামওয়ালা পদবীগুলোর অধিকারী হবে, তা

আমার চিন্তার বাইরেই ছিল। আর আমি যে এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবো তাতো আমার উদ্ভটতম কল্পনারও সাধ্যের অতীত ছিল তখন।

আমি ও অ্যান পীস কোরের চাকরির জন্য আবেদন করলাম। আমরা আমাজানের বৃষ্টিজ-অরণ্য এলাকাকে আমাদের আবেদনপত্রে এক নম্বর স্থান দিলাম। যখন পীস কোর থেকে আমাদের নিয়োগপত্র এলো তখন আমরা রীতিমত হতাশ হলাম। কেননা, আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে ইকুয়েডরে।

আমি সখেদে ভাবলাম, "চাইলাম আমাজান। পেলাম আফ্রিকা। এ কোন ধরনের অবিচার!!"

মনের দুঃখে গোটা পৃথিবীর একটি মানচিত্র কিনে ইকুয়েডরকে খুঁজতে বসলাম। আফ্রিকা মহাদেশের পৃষ্ঠায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইকুয়েডরের নাম দেখতে পেলাম না। তখন দেশের সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় ইকুয়েডরকে খুঁজে পেলাম দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে। মহাদেশটির উত্তর-পশ্চিমাংশে ইকুয়েডর অবস্থিত। উত্তরে কলম্বিয়া এবং পূর্বে ও দক্ষিণে পেরু হচ্ছে ইকুয়েডরের প্রতিবেশী দুটো দেশ। ইকুয়েডরের পুরো পশ্চিম জুড়ে রয়েছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর। আন্দিজ পর্বতমালার ঢাল বেয়ে ইকুয়েডর নেমে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। আন্দিজের হিমবাহগুলো থেকে অজস্র ক্ষুদে পাহাড়ি নদী বেরিয়ে এসে নিচে নেমে গিয়ে মিশেছে বিশাল আমাজন নদীতে। তখন শুরু করলাম ইকুয়েডরের উপরে লেখা বইগুলো পড়া। জানতে পারলাম যে, দেশটিতে পুরো বছর জুড়েই প্রচুর বৃষ্টি ঘটে। আবহাওয়া সব সময়ই নাতিশীতোষ্ণ। দেশটির পার্বত্য বনাঞ্চলে বাস করে অসংখ্য প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী। এসব গোষ্ঠী ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবিকার দিক থেকে একে অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা মহাখুশি হয়ে চাকরীটি নিলাম।

অ্যান ও আমি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পীস কোরের প্রশিক্ষণ শেষ করলাম। এরপর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইকুয়েডরে পৌছলাম। আমাদের চাকরির স্থান ছিল ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলে। এই বিশাল অরণ্যের যে অংশে আমরা থাকতাম ও কাজ করতাম, সেই অংশে বাস করে গুয়ার আদিবাসী গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর পুরো জীবনযাত্রা নিউ হ্যাম্পশায়ারে আদিমতম বাসিন্দা অ্যাবনাকি আদিবাসী গোষ্ঠীর মতই। আমাদের কর্মক্ষেত্রের পাশের অংশেই বাস করতো ইনকা গোষ্ঠীর উত্তরসূরী জাপারো আদিবাসী গোষ্ঠী। জাপারো গোষ্ঠীর এলাকাটিও আমাদের কর্মাঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। গোষ্ঠী দু'টির সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রথম দর্শনে আমাদের রীতিমত হতবাক করেছে। আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি যে, পৃথিবীতে এখনও এরকম এলাকা টিকে রয়েছে। এর আগ পর্যন্ত আমরা যেসব ল্যাটিন আমেরিকানদের দেখেছি তারা হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ, ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী পরিবারগুলোর সন্তান। এই প্রথমবারের মতো এমন সব ল্যাটিন আমেরিকানদের দেখলাম যারা অশ্বেতাঙ্গ, আদিম ও দরিদ্র। এদের একমাত্র জীবিকা হচ্ছে কৃষি ও শিকার। আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার একটি সূক্ষ্ম বন্ধনকে অনুভব করলাম। তারা যেন ছিল টিস্টন ও মিডলবারি শহর দু'টির দরিদ্রতম অংশেরই প্রতিচ্ছবি।

একদিন স্থানীয় বিমানবন্দরে বিমান থেকে অবতরণ করলেন এক কমপ্লিট স্যুট পরিহিত ব্যক্তি। তার নাম এইনার গ্রিভ। তিনি শাস টি মেইন ইনকর্পোরেটেডের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় অখ্যাত একটি আন্তর্জাতিক কনসালটিং ফার্ম। সেই সময় বিশ্বব্যাংক ইকুয়েডর ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোকে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প খাতগুলোতে ঋণ প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল মেইনকে। সেই সাথে এইনার মার্কিন সেনাবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্সের একজন কর্নেলও ছিলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর এবার মেইনের মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবিধাগুলো আমাকে বোঝালেন। তখন আমি বললাম যে, পীস কোরে যোগ দেওয়ার আগে আমি এনএসও'র প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়েছিলাম। আর পীস কোরের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমি এনএসএ'র চাকরীতে যোগদান করতে আগ্রহী। একথা শুনে তিনি হেসে জানালেন যে, কখনও কখনও তাকেও এনএসএ'র পক্ষে কাজ করতে হয়। তার চাহনী দেখে ও কথা শুনে আমার মনে হলো যে, তিনি আমাকে যাচাই করছেন। আমি এখন বিশ্বাস করি যে, সেদিন একজন আমেরিকানের জন্য বিরূপ পরিবেশে আমি কিভাবে টিকে রয়েছি তা এইনার নিজ চোখে দেখে গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন আমরা এক সাথেই ছিলাম। এরপর আমাদের যোগাযোগ বজায় ছিল চিঠিপত্রের মাধ্যমে। ইকুয়েডর থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি দেশটির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছিলেন। আমার একটি ছোট্ট হাল্কা টাইপরাইটার ছিল। আমি লিখতে ভালোও বাসতাম। তাই এইনারের অনুরোধ আমি খুশি মনেই রক্ষা করেছি। এক বছরের মধ্যে আমি কমপক্ষে ১৫টি বিশাল চিঠি পাঠিয়েছি। এসব চিঠিতে আমি ইকুয়েডরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ছবি এঁকেছি। সেই সাথে আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশটির আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর ক্ষোভের বর্ণনাও করেছি।

পীস কোরে আমাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এইনার আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন মেইনের চাকরির ইন্টারভিউতে অংশ নিতে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বোস্টন শহরে মেইনের সদর দপ্তরে। এর আগে তার সাথে আমার একটি একান্ত আলোচনা ঘটেছিলো। এ সময় তিনি জানালেন যে, মেইনের মূল ব্যবসা হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ বিশ্বব্যাংক মেইনের উপরে চাপ দিচ্ছে অর্থনীতিবিদদের নিয়োগ করার জন্য। এরা বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক পূর্বাভাস প্রদান করবেন। মেইন কিছুদিন আগে এই কাজ করার জন্য তিনজন অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করেছিল। এদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। আর একজন ছিলেন পিএইচডি ডিগ্রীধারী। তারপরেও এরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

এইনার জানালেন, "যেখানে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই সেখানে কিভাবে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদান করতে হয় তা তাদের মাথাতেই ঢোকে নি। এছাড়াও ইরান, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া ও মিশরের মতো দেশগুলো ভ্রমণ করে এসব দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে

আলোচনা করে এসব দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামত প্রদান করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একজন তো পানামার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে দু'দিন থেকেই প্রায় পাগল হয়ে পড়লেন। শেষে পানামার পুলিশ তাকে বিমান বন্দরে নিয়ে এসে একটি মার্কিন বিমানে তুলে দিলো।"

তিনি আরও বললেন, "যে চিঠিগুলো আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেগুলো আপনার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে। কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ব্যবহার না করেও আপনি একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করতে পেরেছেন। ইকুয়েডরে যে পরিবেশে আপনাকে থাকতে ও কাজ করতে দেখেছি তাতে আপনি যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবেন তা বুঝতে পেরেছি। ওই তিন বিশেষজ্ঞের মধ্যে একজনকে এরই মধ্যে ছাঁটাই করা হয়েছে। আপনি যদি আমাদের সাথে কাজ করতে রাজি হন তবে বাকি দু'জনকেও বরখাস্ত করা হবে।"

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে মেইন আমাকে একজন অর্থনীতিবিদের চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। সে সময় আমার বয়স ২৬ বছর। এই বয়সে মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক কোর আমাকে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে পারবে না। আমি অ্যানের মা-বাবার সাথে কথা বললাম। তারা আমাকে এই চাকরিতে যোগ দিতে বললেন। খুব সম্ভবত এতে আঙ্কল ফ্র্যাঙ্কেরও সায় ছিল। কেননা, ৩ বছর আগে তিনি এ ধরনের সম্ভাবনারই আভাস দিয়েছিলেন। যদিও কোন কথাই খোলাখুলি ভাবে বলা হয়নি, তারপরও আমি ধরে নিলাম যে মেইনের চাকরিটি ওই আভাসেরও ফসল। এছাড়াও ইকুয়েডরে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা ও দেশটির আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার অভিমত এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কয়েকদিন আমি যেন পাখা মেলে হাওয়ায় উড়ে বেড়ালাম। আমার পা দুটো যেন মাটিকে ছুঁতেই চায় না। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্রেফ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী ছাত্র, তাও আবার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার মত বিষয়ে, সে কিনা মেইনের মত প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদের পদে চাকর পেল! আমার বহু ক্লাসমেটকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক কোর প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা অনেকেই এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেছে। এমনকি কেউ কেউ পিএইচডি ডিগ্রী পাওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করতে পেরেছে। তারা আমার মত অগা মার্কা ছাত্রের এহেন সৌভাগ্যের কথা শুনলে হিংসায় স্রেফ হার্ট ফেইল করবে।

আমি তখন মনে মনে নিজেকে একজন দুর্ধর্ষ সিক্রেট এজেন্ট রূপে কল্পনা করছি। রক্ত হিম করা মিশনে ছুটে যাচ্ছি অজানা সব দেশে। মিশন শেষে বিশ্রাম নিচ্ছি পাঁচ তারা হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে। চারপাশে ভিড় জমিয়েছে টুপিস বিকিনি পরিহিতা পরমা সুন্দরী যুবতীরা। আমার হাতের ডাবল ভদকা মার্টিনির গ্লাসে তখন বুদবুদ গজাচ্ছে।

বাস্তব কিন্তু কল্পনার সাথে মেশেনি। তারপরেও বাস্তব কল্পনাকে হার মানিয়েছে। এইনার আমাকে একজন অর্থনীতিবিদের চাকরি দিলেন। কিন্তু আমাকে একজন অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন করতে হলো। আর সেই দায়িত্বের প্রকৃতি জেমস বন্ডের মিশনকেও হার মানিয়েছে।

অধ্যায়-২
সারাজীবনের জন্য

আইনগত দিক থেকে মেইনকে একটি সুসংহত কর্পোরেশন বলা চলে। এর ২ হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র ১০০ জন ছিলেন এর মালিক। এদেরকে বলা হতো বাণিজ্যিক অংশীদার। প্রতিষ্ঠানে এদের অবস্থান ছিল ঈর্ষণীয়। তারা যে বাকি ১ হাজার ৯০০ কর্মীর মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাতেন তা শুধু নয়, বার্ষিক আয়ের সিংহভাগই এদের পকেটে যেতো। গোপনীয়তা ছিল তাদের কাজের মূল বৈশিষ্ট্য। তারা বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও বিবিধ আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারদের সাথে মতামত বিনিময় করতেন। এসব ক্ষেত্রে মেইনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও আইনজীবির মতই কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলা ছিল পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। কেউ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেইনে টিকতে পারতেন না। তাই প্রতিষ্ঠানটির কথা সাধারণ মানুষ জানতই না। যদিও মেইনের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান আর্সার ডি লিটল, স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার, ব্রাউন অ্যান্ড রুট, হ্যাসিবার্টন ও বেখটেলের পরিচিতি ছিল বিশ্বজোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সামগ্রিকভাবে। আসলে নিজ ক্ষেত্রে মেইন ছিল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিষ্ঠানটির সিংহভাগ কর্মীই ছিলেন প্রকৌশলী। অথচ তারপরেও মেইনে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো না। এমনকি প্রতিষ্ঠানটি একটি ছোট ঘরও কোন দিন তৈরি করে নি। প্রকৌশলীদের পরে মেইনের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মী বাহিনী ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যগণ। তারপরেও সংস্থাটির সাথে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও সামরিক বাহিনীর কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। মেইনের কর্মকাণ্ড এতটাই পৃথক ছিল যে, প্রথম কয়েক মাস আমি এ সম্পর্কে কোন ধারণাই গড়ে তুলতে পারি নি। আমি শুধু জানতাম যে, আমার প্রথম কর্মক্ষেত্র হবে ইন্দোনেশিয়া। আমি হবো ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ দলের সবচেয়ে কম বয়সী সদস্য। আমাদের কাজ হবে জাভা দ্বীপে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আর্থ-বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

আমি আরও বুঝেছিলাম যে, এইনার ও অন্যান্যরা এই প্রকল্প সম্পর্কে চরমভাবে আশাবাদী ছিলাম। তারা মনে করতেন যে, এতে জাভা দ্বীপের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটবে। তারা এই আশাবাদ আমার মাঝেও জাগিয়ে তুলতে

চেয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, একজন ভালো অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদানকারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমার প্রতিবেদনে এই আশাবাদের প্রতিচ্ছবি থাকতেই হবে। তাহলেই আমার ভাগ্যে আকাঙ্খিত পদোন্নতিগুলো জুটবে।

এইনার সুযোগ পেলেই জাভা প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন। নিজ মাথার উপরে হাত ভাসিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন, "এই অর্থনীতি চার্টে আটকে থাকবে না। এক স্বাধীন পাখির মত উড়ে বেড়াবে আকাশে।"

এইনার প্রায়শই পেশাগত ভ্রমণে এদিকে ওদিকে চলে যেতেন। তবে তা দু-তিন দিনের বেশী স্থায়ী হতো না। মেইনের অন্য কর্মীদের এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে কোনদিনও শুনিনি। হয়তবা তারা কিছু জানতেনও না। অফিসে থাকলে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আমরা অ্যান, আমাদের নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ও ইকুয়েডর থেকে আনা বিড়াল নিয়েই বেশীর ভাগ সময় আড্ডা মারতাম। কাজের কথা খুব কমই হতো। দিন যতো গড়াল, আমি তাকে যতো ভালভাবে বুঝতে শিখলাম, ততো আমার সাহস বাড়ল। ততোই আমি আমার কাজের ধরন সম্পর্কে খোলামেলাভাবে জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনদিনও আমি এ সম্পর্কে তার কাছ থেকে সন্তোষজনক কোন জবাব পাইনি। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি সাংঘাতিক ঝানু ছিলেন। একবার তো তিনি আমাকে এক বিদঘুটে চাহনীতে বিদ্ধ করলেন। আর বললেন, "ঘাবড়াবেন না। আপনার প্রতি আমাদের প্রত্যাশা বিপুল। ক'দিন আগে আমি ওয়াশিংটনে গিয়েছিলাম।" এরপর একটু থেমে বিচিত্র হাসি হেসে বললেন, "আপনি তো জানেন যে, কুয়েতে আমাদের বড় একটি প্রকল্পের কাজ চলছে। ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারটি তো এখনও বেশ দূরে। তো এই অবসর সময়ে কুয়েত নিয়ে পড়াশুনা করুন। বোস্টনের পাবলিক লাইব্রেরীতে সব বিষয়ের উপরেই অনেক ভালো বইপত্র রয়েছে। এছাড়াও, আমরা আপনার জন্য এমআইটি ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীগুলোর পাশ যোগাড় করতে পারবো।"

এ ঘটনার পর আমি এই তিনটি পাঠাগারে বহু সময় ব্যয় করলাম। সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয় করলাম বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে। এই পাঠাগারটি ছিল আমার অফিস ও অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তাই দুদিক থেকেই আমি হেঁটে বিপিএলে যাতায়াত করতে পারতাম। কুয়েত সম্পর্কে আমি খুব ভালভাবে ওয়াকিবহাল হলাম। তবে আমার পড়াশুনা শুধুমাত্র কুয়েতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি বহু বিষয়ে বহু বই পড়েছি। তবে সবচেয়ে বেশী পড়াশুনা করেছি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে। বিশেষ করে এ বিষয়ে জাতিসংঘ, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টগুলো পড়েছি গভীরতম মনোযোগের সাথে। আমি জানতাম যে, আমাকে ইন্দোনেশিয়ার বিশেষ করে জাভা দ্বীপের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করতে হবে। তাই এ কাজে হাত পাকানোর জন্য কুয়েতের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কাজে হাত দিয়ে দেখলাম, ব্যাপারটি মোটেও সহজ নয়। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে

বিএস ডিগ্রী লাভ করলেই ইকোনোমেট্রিশিয়ান হওয়া যায় না। কিভাবে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদানের দক্ষতা অর্জন করতে পারব সেই রাস্তা খুঁজে বের করতে গিয়ে আমার কয়েক রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। অবশেষে কয়েকটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হলাম। এসব কোর্স আমার তৃতীয় নয়নকে উম্মোচিত করল। কিভাবে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলোকে কাজে লাগানো যায় তা আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারলাম। বিশেষ করে পরিসংখ্যানকে বাকিয়ে-চুরিয়ে একজন বিশ্লেষক কিভাবে পাকাপোক্তভাবে পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন তাও শিখলাম। আর এ ধরনের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের কলাকৌশলও আমি রপ্ত করতে পারলাম।

মেইন মূলত পুরুষ প্রধান একটি সংস্থা। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের পেশাদার কনসালট্যান্টদের মধ্যে মাত্র চারজন ছিলেন নারী। তবে ব্যক্তিগত সচিব ও স্টোনোটাইপিস্ট বিভাগ দুটিতে ২০০ জন নারী কাজ করতেন। শীর্ষতম পদধারী নির্বাহী কর্মকর্তাগণ মাথাপিছু একজন ব্যক্তিগত সচিব পেতেন। স্টোনো-টাইপিস্টগণ কাজ করতেন সংস্থাটির বিভাগগুলোতে। আমি এই রীতির ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বিপিএলের রেফারেন্স সেকশনে একদিন যে ঘটনা ঘটল তা আমাকে রীতিমতো হতবাক করে দিল।

এক আকর্ষণীয় কৃষ্ণকেশী যুবতী আমার টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসলো। গাঢ় সবুজ রংয়ের কমপ্লিট স্যুটে তাকে অত্যন্ত রুচিশীল দেখাচ্ছি। আমার দেখে মনে হলো যে, মেয়েটির বয়স আমার চেয়ে ৩-৪ বছর বেশি হবে। তবে আমি তার প্রতি বেশিক্ষণ তাকাইনি। বরঞ্চ কিছুটা উদাসীনতাই দেখিয়েছি। কয়েক মিনিট পর কোন কথা না বলে সে একটি খোলা বই আমার দিকে আস্তে ঠেলে দিলো। বইটির খোলা পৃষ্ঠায় কুয়েতের অর্থনীতি সম্পর্কে এমন কিছু পরিসংখ্যান ছিল যা আমি খুঁজছিলাম। আর সেই সাথে ছিল তার একটি কার্ড। নাম ক্লডিন মার্টিন, পেশায় শাস টি মেইন ইনকর্পোরেটেডের একজন স্পেশাল কনসালট্যান্ট। চোখ তোলা মাত্রই সে স্মিত হাসি হেসে তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

তারপর বলল, "আমাকে আপনার প্রশিক্ষণে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ হয়েছে।" এ রকম একটা ঘটনা যে ঘটলো তা আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

পরদিন আমার প্রশিক্ষণ শুরু হলো ক্লডিনের বেকন স্ট্রীট অ্যাপার্টমেন্টে। এটি মেইনের প্রুডেন্সিয়াল সেন্টার হেড কোয়ার্টার থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে অবস্থিত। প্রথম ঘন্টায় ক্লডিন আমায় জানাল যে, আমার চাকরিটি বিশেষ ধরনের। এ ধরনের চাকরিতে সব কিছুই গোপন রাখতে হয়। এ পর্যন্ত কেউই আমাকে আমার মূল দায়িত্ব সম্পর্কে কোন কথা বলে নি। কেননা, এটা বলার ক্ষমতা কাউকেই দেওয়া হয়নি। একমাত্র তাকেই এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার কাজ হচ্ছে আমাকে একজন অর্থনৈতিক ঘাতকে পরিণত করা।

এই নামটি আমাকে আবারও সেই দুর্ধর্ষ গোয়েন্দায় পরিণত হওয়ার পুরনো স্বপ্নের মধ্যে ঠেলে দিলো। নিজের অজান্তেই আমার ভেতর থেকে হাসি বেরিয়ে এলো। পরক্ষণেই এর

জন্য বিব্রত হলাম। ক্লডিনও হাসল। তারপর আমাকে জানাল যে, নিছক ঠাট্টার বশেই নামটিকে প্রথমে চালু করা হয়েছিল। "কে এ ধরনের নামকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে?"

আমি অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিলাম।

ক্লডিন হেসে ফেলল, "আপনি এক্ষেত্রে একা নন। তবে এই নোংরা দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। আপনি যে এ ধরনের কাজ করছেন তা আপনার স্ত্রীকেও বলা যাবে না।" তারপরই সে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে খোলামেলাভাবে সব কিছু শেখাব। এরপর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একবার এ জগতে প্রবেশ করলে সারা জীবনের জন্য থাকতে হবে।" তারপর সে খুব কমই অর্থনৈতিক ঘাতক নামটি পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করত। বরঞ্চ ইএইচএম বলেই বেশির ভাগ সময় কাজ সারতো।

আমি এখন যা জানি তা তখন জানতাম না। এনএসএ'র ফাইলে আমার দূর্বলতাগুলো সম্পর্কে যে সব কথা লেখা ছিল সেগুলোকে সে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছিল। তবে আমি এখনো জানি না যে, সে এই তথ্যগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল--এনএসএ, এইনার, মেইনের পার্সোনাল বিভাগ, না অন্য কেউ? তার প্রশিক্ষণ ছিল দৈহিক প্রলোভন ও মৌখিক প্রভাবের সমন্বয়। এটি আমার জন্য পুরোপুরিভাবে উপযোগী ছিল। সেই সাথে এটি হচ্ছে একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। যখন ব্যবসায়ে লাভের অংক বেশী থাকে তখন চুক্তি করার চাপ বাড়ে। সে সময় দৈহিক প্রলোভন থেকে মৌখিক প্রভাব সব কিছুকেই কাজে লাগানো হয়। ক্লডিন শুরু থেকেই জানতো যে আমাদের অনৈতিক সম্পর্কের কথা বলে আমি আমার দাম্পত্য জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবো না। অন্যদিকে আমার পেশার নোংরা দিকগুলো সম্পর্কে কথা বলার সময় সে কোনরকম দ্বিধা বোধ করেনি।

ক্লডিনের মতে, আমার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে একটি দেশে শত কোটি ডলার বিনিয়োগের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া। বিশেষ করে একটি প্রকল্প কিভাবে একটি দেশের অর্থনীতিকে ২০-২৫ বছর চাঙ্গা করবে সে সম্পর্কে আকর্ষণীয় প্রতিবেদন তৈরি করাই হবে আমার প্রথম কাজ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন দেশকে সোভিয়েত ব্লকে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার জন্য দেশকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হয় তাহলে সেই ঋণ দেওয়া হবে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন বা নতুন জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক নির্মাণ অথবা আধুনিকতম টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করার খাতগুলোতে। এমনও হতে পারে যে একটি দেশে তিনটি প্রকল্প একসাথে বা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করা হবে। আমার কাজ হচ্ছে এসব প্রকল্প যে দীর্ঘদিন যাবৎ দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে বিপুল হারে তা প্রমাণ করা। প্রতিটি প্রকল্পের আর্থ বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার সময় মোট জাতীয় আয়ে প্রকল্পটির দীর্ঘ মেয়াদী অবদান নির্ধারণ করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক সাথে একাধিক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় যেটি জিএনপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে সেটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা

হয়। যদি মাত্র একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় সেই ক্ষেত্রে জিএনপিতে সেই প্রকল্পের অবদানকে বড় আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

প্রতিটি প্রকল্পের অলিখিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ থেকে ঠিকাদারী সংস্থা বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করে। সেই সাথে ঋণগ্রহীতা দেশের ক্ষমতাসীন ও ব্যবসায়ী মহলগুলোও যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হয়। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা দেশের ঋণের বোঝা আরো বাড়ে। এতে করে দেশটি দাতা দেশ বা সংস্থার উপরে আরো বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ থেকে উদ্ভব ঘটে ঋণগ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার। তাই ঋণের অংক যত বড় হবে তত বেশিভাবে ঋণদাতা দেশ ও সংস্থা লাভবান হবে। অন্যদিকে এতে ঋণগ্রহীতা দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মহলই এই বঞ্চনার দিকে ফিরে তাকায়নি।

ক্লডিন ও আমি মোট জাতীয় আয়ের ফাঁকিগুলো সম্পর্কে মুক্ত মনে আলোচনা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মাত্র একজন ব্যক্তির বার্ষিক আয় বৃদ্ধিই জিএনপির হারকে বাড়াতে পারে। কেননা, ওই ব্যক্তিটি হয়তো বা একটি দেশের সকল বাণিজ্যিক খাতকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। অথচ দেশের অন্যান্য নাগরিকগণ খাতকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। অথচ দেশের অন্যান্য নাগরিকগণ হয়তোবা কঠোর দুর্দশার মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে ধনী আরও ধনী হচ্ছেন, দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছেন। সেই সাথে দেশটির জাতীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেশটির মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের মতই মেইনের অধিকাংশ কর্মচারী মনে করতেন যে, তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোতে বিবিধ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আমরা ওই সব দেশের উপকার সাধন করছি। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমগুলো আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে বিশ্ব মানবতার সেবারূপে দেখতে শিখিয়েছে আমাদেরকে। তাই বিশ্বের কোন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হলে আমরা বলি, "ওরা যদি আমেরিকান পতাকা পোড়ায় ও আমেরিকান দূতাবাসে ঢিল ছোঁড়ে তাহলে আমাদের উচিত ওদের দেশ ত্যাগ করা। ওরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হোক চিরদিনের জন্য।"

যে সব আমেরিকান এসব মন্তব্য করেন তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। অথচ এসব ব্যক্তি জানেন না যে, পুরো বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রে দূতাবাস স্থাপন করেছে স্রেফ নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। আর এই স্বার্থটি হচ্ছে গোটা বিশ্বকে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। যে সব আমেরিকান নাগরিক নিজ দেশের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মতই কুশিক্ষিত। সে সময়ের শ্বেতাঙ্গরা মনে করতেন যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী আদিবাসীগণ স্রেফ শয়তানের দোসর।

কয়েক মাসের মধ্যেই আমি ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের উদ্দেশ্যে বোস্টন ত্যাগ করব। সে সময়ের পৃথিবীতে জাভা ছিল সবচেয়ে জনবহুল ভূখণ্ড। সেই সাথে ইন্দোনেশিয়া ছিল পেট্রোলিয়াম সম্পদে সমৃদ্ধ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এছাড়াও দেশটি ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

ক্লডিনের ভাষায়, "ভিয়েতনামের পর ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে আরেকটি তাসের রাজ্য। আমাদেরকে ইন্দোনেশিয়া জয় করতেই হবে। যদি দেশটি সোভিয়েত ব্লকে যোগদান করে, তাহলে" বলেই সে নিজ গলার উপর দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে টান দিলো। তারপর সে মিষ্টি হেসে বলল, "নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সরবরাহ লাইন স্থাপনের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে উন্নয়নের বন্যা বইবে এটা উপস্থাপন করাই হবে তোমার মূল কাজ। এতে ইউএস এইড ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে বিরাট অংকের ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে। এই কাজে সফল হলে তুমি অঢেল পুরস্কার পাবে। সেই সাথে আরো আকর্ষণীয় দেশে আরো লাভজনক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব পাবে। গোটা বিশ্বই হবে তোমার জন্য লোভনীয় কর্মক্ষেত্র।"

আমার কাজ যে মোটেও সহজ নয় এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেও ক্লডিন ভোলে নি। "ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ তোমার পেছনে একেবারে জোঁকের মত লেগে থাকবে। তাদের কাজই হচ্ছে তেমার পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করা। এ জন্যই তাদেরকে মোটা অংকের বেতন দেওয়া হয়। তাই তারা চাইবে তোমার রিপোর্টকে আর্থ-বাণিজ্যিক দিক থেকে অনির্ভরশীল বলে আখ্যায়িত করতে।"

একদিন আমি ক্লডিনকে মনে করিয়ে দিলাম যে, ইন্দোনেশিয়াগামী মেইনের প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আমি সহ ১১ জন। আমি প্রশ্ন করলাম যে, বাকি ১০ জনকেও কি এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে? সে আমাকে নেতিবাচক জবাব দিলো। শুনে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

সে বলল, "ওরা তো প্রকৌশলী। ওদের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিদ্যুতের ট্রান্সমিটার ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ডিজাইন করা। সেই সাথে মালামাল ও জ্বালানী পরিবহণের জন্য উপযোগী সমুদ্র বন্দর, সড়ক ও বিমান বন্দরের নকশাও ওরা আঁকবে। তোমার কাজ হবে গোটা প্রকল্পের আর্থ-বাণিজ্যিক পূর্বাভাস প্রদান করা। তোমার রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ঋণের পরিমাণ ও প্রকল্পের পরিধি নির্ধারণ করা হবে। তুমিই হবে এই দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।"

যতবার আমি ক্লডিনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতাম ততবার আমি ঠিক পথে এগুচ্ছি কিনা এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতাম। আমার জীবন যে ঠিক পথে চলছে না এই চিন্তাটি প্রায়শই আমাকে পীড়া দিত। সাথে সাথে আমার অতীত হতাশাগুলোর স্মৃতিগুলোও আমার মনে জেগে উঠত। আমি এ পর্যন্ত জীবনে যা পাই নি তা পাওয়ার নিশ্চয়তা মেইনের কাছ থেকে পেয়েছি। তারপরও যা পাচ্ছি তা টম পেইন ও ইথান অ্যালেন পছন্দ করতেন কিনা সেই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। সবশেষে আমি স্থির করলাম যে, কাজ

ভালভাবে শিখে নিয়ে এতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনের পর আমি এই পদ্ধতির স্বরূপকে ঠিক ভাবে উন্মোচিত করতে পারব। এক্ষেত্রে আমার মনোভাব ছিল ঘরভেদী বিভীষণের মতো।

এ কথা শুনে ক্লডিন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বোকার মতো কথা বলো না। একবার এ জগতে ঢুকতে পারলে সারা জীবনের জন্য এতে বাস করতে হবে। তাই এতে ঢোকার আগে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও।" আমি তার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলাম। সেই সাথে ভয়ও পেলাম। দিনের শেষে আমি ধীরে ধীরে কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে ডার্টমাউথ স্ট্রীটে ঢুকলাম। আর নিজেকে বোঝালাম, "আমি ব্যতিক্রম হবই।"

একদিন বিকাল বেলায় জানালার পাশের সোফায় বসে আমি ও ক্লডিন বেকন স্ট্রীটে তুষারপাত উপভোগ করছিলাম। তখন সে বলল, "আমরা খুবই ক্ষুদ্র ও বিশেষ একটি শ্রেণী। আমাদেরকে মোটা অংকের বেতন দেওয়া হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশকে ধোঁকা দিয়ে শত কোটি ডলার আয় করার লক্ষ্যে। আমাদের দায়িত্বের অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থকে সংরক্ষণকারী নেটওয়ার্কের সদস্যে পরিণত করা। একটা পর্যায়ে এসব রাষ্ট্রনায়ক এমনভাবে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন যা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করে। তখন আমরা আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে তাদেরকে ইচ্ছে মাফিক কাজে লাগাতে পারি। এর পরিবর্তে তারা নিজেদের দেশে আকর্ষণীয় সব ভৌত অবকাঠামো তৈরি করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে সক্ষম হন। মাঝখান থেকে মার্কিন প্রকৌশী ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকেরা বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করেন।"

সেদিন বিকালে ক্লডিনের অ্যাপার্টমেন্টে অলস পরিবেশে বসে আমি আমার ভবিষ্যৎ পেশার ইতিহাস জানতে পারলাম। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিবারই সাম্রাজ্য গড়া হয়েছে সামরিক শক্তিকে ব্যবহার না করে বা একে ব্যবহারের ভয় দেখিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সাথে শুরু হল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও মোতায়েনের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সামরিক অভিযানের পথকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল তখন। ক্লডিন যখন এসব কথা শোনাচ্ছিল তখন জানালার বাইরে চলছিল তুষার ঝড়ের মাতামাতি।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে চূড়ান্ত ক্ষণটির আবির্ভাব ঘটল। ইরান একটি বৃটিশ জ্বালানী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। প্রতিষ্ঠানটি ইরানের পেট্রোলিয়াম সম্পদকে যথেচ্ছ মতো লুটপাট করছিল, দেশটির জনগণকে ইচ্ছেমাফিক ধাপ্পা দিচ্ছিল। সে যুগের ওই ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানটি আজকের ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের পূর্বসূরী। এর জবাবে ইরানের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ও জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং টাইম ম্যাগাজিনের ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ম্যান অফ দ্য ইয়ার মোহাম্মদ মোসাদ্দেক দেশটির পেট্রোলিয়াম সম্পদকে জাতীয়করণ করলেন। ক্রুদ্ধ বৃটেন

এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করল। তবে দু'দেশই সামরিক অভিযান চালালে ইরানের পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসে দাঁড়াবে এই ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল।

তাই সৈন্য না পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে পাঠাল আমাদের ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের নাতি কারমিট রুজভেল্টকে। সেই সময় কারমিট সিআইএ'র এজেন্ট ছিলেন। তিনি ঘুষ দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে ইরানের শাসক শ্রেণির একাংশকে কজা করলেন। এরপর এদেরকে কাজে লাগিয়ে গোটা ইরান জুড়ে সহিংস বিক্ষোভ ও দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। রাতারাতি মোসাদ্দেককে অদক্ষ ও অজনপ্রিয় শাসক বানানো হলো। অবশেষে ইরানের সেনাবাহিনী মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করে আমেরিকাপন্থী মোহাম্মদ রেজা শাহকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলো। এরপর দীর্ঘদিন রেজা শাহ ইরানকে শাসন করেছেন অপ্রতিহত স্বৈরতান্ত্রিকভাবে। অন্যদিকে মোসাদ্দেকের বাকি জীবন কেটেছে গৃহবন্দী রূপে। কারমিট রুজভেল্ট এক নতুন পেশার সূচনা করলেন যা আমার পেশা হতে যাচ্ছে।

রুজভেল্টের কৌশল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। সেই সাথে সাম্রাজ্য গঠনের যুগ প্রাচীন কৌশলগুলোকে বাতিলের খাতায় ঠেলে দিলো। একই সময়ে শুরু হয়েছিল "সীমিত অপারমাণবিক সামরিক অভিযান"-এর যুগ। কিন্তু কোরিয়ায় ও ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের শোচনীয় ব্যর্থতার পর সেই নীতিকে পরিত্যাগ করা হলো। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আমি এজেন্ট হওয়ার আশায় এনএসএ'র পরীক্ষাগুলোয় অংশ নিয়েছিলাম। সে বছরের মধ্যেই আমেরিকার নীতিনির্ধারক মহল বুঝতে পারলেন যে, আমাদের ৩৬তম প্রেসিডেন্ট লিন্ডন ব্রেন্ডন জনসন ও ৩৭তম প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিশহাউজ নিক্সনের নীতি অনুযায়ী বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে রুজভেল্টের ইরান নীতিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকিকে এড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

রুজভেল্টের নীতিকে পাইকারীভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকি ছিল। তিনি ছিলেন সিআইএ'র এজেন্ট। অপারেশন ইরানের সময় যদি তিনি ধরা পড়তেন তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক ভয়াবহ আন্তর্জাতিক কেলেংকারী বয়ে আনতো। তা না ঘটায় তিনি এক বিদেশী সরকারকে উৎখাতের প্রথম মার্কিন প্রচেষ্টাকে সফল করতে পেরেছিলেন। স্নায়ু যুদ্ধের যুগে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা যে বহুবার দেখা দেবে তা নীতি নির্ধারক মহল ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখবে, কিন্তু মার্কিন সরকারকে কোন মতেই বেকায়দায় ফেলবে না।

নীতি নির্ধারক মহলের জন্য স্বস্তির উদ্ভব ঘটল গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। এটি ঘটল একটি আর্থ-বাণিজ্যিক বিপ্লবের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের পরিধি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর

মত বহুজাতিক দাতা সংস্থাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা গোটা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হলো। আইএমএফ-মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হলেও এর নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বেশী। সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার এই যে, বিশ্বসাম্রাজ্য গঠনের লক্ষে মার্কিন সরকার, বহুজাতিক দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার ধারা গড়ে উঠল। এই ধারা বর্তমান বিশ্বে এক অচ্ছেদ্য চক্রে পরিণত হয়েছে।

আমি যখন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে ভর্তি হয়েছি, তখন রুজভেল্ট নীতির ত্রুটির সমাধান উদ্ভাবনের কাজ শেষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, যাদের মধ্যে এনএসএ বৃহত্তম, সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক ঘাতকদের খুঁজে বার করবে। এরপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসব ঘাতকদের চাকরি দেবে। অর্থাৎ ইএইচএমদের সাথে মার্কিন সরকারের কোন রকম সম্পর্ক থাকবে না। তাই তাদের কাজের প্রকৃত স্বরূপ যদি কখনও উম্মোচিত হয় তখন তা বাণিজ্যিক লোভ রূপেই চিহ্নিত হবে। কিন্তু তা কখনই আমেরিকান সরকারকে বিপদে ফেলবে না। যে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ঘাতকদের চাকরি দেবে যে সব প্রতিষ্ঠান বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থ পেয়ে থাকে। এই অর্থ মূলত আমেরিকান নাগরিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত বার্ষিক কর ও শুল্ক। এছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠান মার্কিন কংগ্রেসের তত্ত্বাবধান ও সংবাদ মাধ্যমগুলোর তদন্ত থেকে রেহাই পায়। এর পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে নানারকম আইনগত রক্ষাকবচ – যেমন ট্রেডমার্ক লাইসেন্স, পেটেন্ট আইন ও ফ্রিডম অফ ইনফর্মেশন ল দ্বারা রক্ষা করা হয়।

দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহার টেনে ক্লডিন বলল, "যখন তুমি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তখন যে ধারা শুরু হয়েছিল আমরা হচ্ছি তার গর্বিত উত্তরসূরী।" আমি গোটা ব্যাপারটি তখন মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারলাম।

অধ্যায়-৩

ইন্দোনেশিয়া ঃ ঘাতকের উপলব্ধি

আমি আমার নতুন পেশা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে পড়াশুনা করছিলাম। ক্লডিন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, "কোন দেশে কাজ শুরু করার আগে সেই দেশ সম্পর্কে ভাল মতো তথ্য আহরণ করতে পারলে তোমার কাজ সহজ হবে।" আমি একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো তার পরামর্শকে পালন করেছিলাম।

১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন জাহাজে চাপলেন তখন তার মূল লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া। সে সময় ইন্দোনেশিয়ার পরিচিতি ছিল মশলা দ্বীপ রূপে। ঔপনিবেশিক যুগে ইন্দোনেশিয়া থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ আমেরিকা থেকে অর্জিত আয়ের চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোর মধ্যে জাভা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দামি ফ্যাব্রিক, মশলা ও ঐশ্বর্যশালী রাজ্যগুলোর কারণে। তাই জাভার দখল নিয়ে স্পেন, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল ও বৃটেনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো ঘটেছে। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডস জাভা যুদ্ধে জয়ী হলো এক সাগর অর্থ ও রক্তের বিনিময়ে। তারপরে বাকি ইন্দোনেশিয়া জয় করতে নেদারল্যান্ডকে আরো ১৫০ বছর যুদ্ধ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জাপানের সামরিক বাহিনী ঝড়ের গতিতে ইন্দোনেশিয়াকে দখল করল তখন নেদারল্যান্ডসের সামরিক বাহিনী প্রায় যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করেছিল। ফলে জাপানী সৈন্যদের হাতে ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকগণ, বিশেষ করে জাভা দ্বীপের বাসিন্দাগণ চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দু'টি আমেরিকান পারমাণবিক বোমা পড়ার পর জাপান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বরে। অমনি ইন্দোনেশিয়ার এক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা সোয়েকর্ণ দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ওদিকে মিত্রশক্তি ইন্দোনেশিয়ার শাসনভার আবারও তুলে দিয়েছে নেদারল্যান্ডসের হাতে। শুরু হলো ডাচ শাসকদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের লড়াই। চার বছরের রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষ হলো ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বরে নেদারল্যান্ডসের পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে। সেই সাথে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের প্রায় তিন শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হলো। সোয়েকর্ণ নব্য স্বাধীন দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন।

নেদারল্যান্ডসকে পরাজিত করার চেয়েও ইন্দোনেশিয়াকে শাসন করা কঠিনতর ছিল। কেননা, ইন্দোনেশিয়া মোটেও একমাত্রিক দেশ নয়। গোটা দেশটিতে ১৭ হাজার ৫০০ বিভিন্ন আয়তনের দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দ্বীপপুঞ্জ। পুরো ইন্দোনেশিয়া জুড়ে অসংখ্য উপজাতীয় গোষ্ঠী বাস করে। প্রতিটি গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবিকা। সে সাথে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে যুগ প্রাচীন রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের ইতিহাস। প্রায়ই বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। সোয়েকর্ণ বাধ্য হলেন কঠোর হাতে এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তিনি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টের কর্মকাণ্ড স্থগিত ঘোষণা করলেন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার আজীবন প্রেসিডেন্ট পরিণত হলেন। বিনিময়ে ওই সব সরকারের কাছ থেকে পেলেন অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ। তার সোভিয়েত অস্ত্রধারী ইন্দোনেশিয়ান সৈন্যগণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ও সাবাহ প্রদেশ দুটিতে অনুপ্রবেশ করল ওই সব স্থানে কমিউনিস্ট শাসন স্থাপনের লক্ষ্যে।

ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকর্ণের শাসনের বিরুদ্ধে নীরব ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটল সামরিক অভ্যুত্থান। সোয়েকর্ণ তার এক উপপত্নীর ত্বরিত উপস্থিত বুদ্ধির সুবাদে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেন। কিন্তু তার রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগীদের ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন ছিল না। এরপর ইন্দোনেশিয়ায় যা ঘটল তা ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ইরানকেই মনে করিয়ে দেয়। অবশেষে ইন্দোনেশিয়ার সকল দুর্দশার জন্য দেশটির কমিউনিস্ট পার্টিকে, বিশেষ করে চীনাপন্থী গ্রুপগুলোকে দায়ী করা হলো। সামরিক বাহিনীর কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানে ৩-৫ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটল। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুহার্তো দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে সোভিয়েত ব্লক থেকে বের করে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা তীব্রতর রূপ ধারণ করল। কেননা, ততদিনে ভিয়েতনামে, লাওসে ও কম্বোডিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অবশ্য ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়র পর পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন ওই তিনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই আমেরিকা গোটা বিশ্বে নিজ আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার দিকে বেশি মনযোগ দিতে শুরু করেছে। একটি দেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রভাব যাতে প্রতিবেশী দেশগুলোতে না পড়ে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যাতে আর কমিউনিজম প্রসার লাভ না করে এ জন্য আমেরিকা ইন্দোনেশিয়ার দিকে শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। দেশটিতে আমেরিকান প্রভাব বৃদ্ধির জন্যেই মেইনের হাতে জাভা দ্বীপে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্প সফল হলে গোটা দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকবে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাধনের লক্ষ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকগণ মনে করেছিলেন যে, সুহার্তো ইরানের শাহের মতই আমেরিকার স্বার্থকে রক্ষা করবেন। ওয়াশিংটন আরও মনে করেছিলো যে, ইন্দোনেশিয়া

বাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য আদর্শ হবে। আমেরিকার ইন্দোনেশিয়ার নীতির অন্যতম ভিত্তি ছিল এই যে, দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক অর্জনগুলো মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে বিস্ফোরনুখ মধ্য প্রাচ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল এই যে, ইন্দোনেশিয়ার রয়েছে পেট্রোলিয়াম সম্পদ। তখনই এই সম্পদের গুণগতমান ও পরিমাণ সম্পর্কে কেউই সুনিশ্চিত ছিল না। তবে জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূকম্পনবিদগণ এই ভাণ্ডারের সম্ভাবনা সম্পর্কে রীতিমত উচ্ছ্বসিত ছিলেন।

বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে যতই ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কে বই পড়ি ততই আমার উত্তেজনা বাড়ে। আমি কল্পনার চোখে ভবিষ্যৎ মিশনের রঙীন ছবিগুলো দেখতে শুরু করলাম। মেইনের পক্ষে কাজ করার সুবাদে আমি পীস কোরের কঠোর জীবন যাত্রার পরিবর্তে বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে উপভোগ করার সুযোগ পাব। ক্লডিনের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে সময় কাটানোর ফলে আমার জীবনের একটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এ রকম একটি ঘটনা তো আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শুধুমাত্র ছাত্রদের স্কুলে পড়াশুনা করার আংশিক প্রতিশোধ নেওয়া তো সম্ভব হয়েছে।

আমার জীবনে অন্য ঘটনাও ঘটেছিল তখন। অ্যান ও আমার মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আমার দ্বৈত জীবন যাপনের কথা খুব সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল। আমাকে সে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল তারই প্রক্রিয়া ছিল ক্লডিনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। ইকুয়েডরে পীস কোরের চাকরি করার সময়ে সে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল আন্তরিকভাবে। এরপরও আমি তার মধ্যে আমার মা-বাবার রক্ষণশীল মানসিকতার ছায়াকেই দেখতে পেতাম। তবে ক্লডিনের সাথে আমার সম্পর্কই অ্যানকে দূরে সরিয়ে দিলো। আমি তাকে কোন কথা বলি নি। তারপরও সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিল। অবশেষে আমরা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের একটি দিনের ঘটনা। এক সপ্তাহ পর আমি ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে বোস্টন ত্যাগ করব। আমি ক্লডিনের অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে দেখি যে, লাইটিং রুমের ছোট্ট টেবিলটির উপরে নানা রকম রুটি ও পনির সাজানো। এক কোণায় বরফ ভর্তি একটি রূপালী বালতির মধ্যে বসে রয়েছে বিউহোলার একটি সুদৃশ্য বোতল। ক্লডিন বোতলটির মুখ খুলে দুটি ডিকাউন্টার পানীয় ঢেলে একটি আমার হাতে ধরিয়ে দিলো। আরেকটি আমার দিকে উঁচু করে তুলে ধরল।

সে কিছুটা শীতল হেসে বলল, "তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন থেকে তুমি আমাদের একজন।"

আধ ঘন্টার মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা বলতে বলতে আমরা মদের বোতলটি শেষ করে ফেললাম। এরপর সে আমার দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে নির্মম সুরে বলল, "আমাদের মধ্যে যে এতদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তা কাউকেই বলা চলবে না। যদি কাউকে এ কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। এমনকি আমি তোমাকে যে চিনি তা অস্বীকারও করব। আমাদের সম্পর্কে কোন কথা বললে তুমি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে।"

আমি হতবাক হলাম, ভয়ও পেলাম। খুব খারাপ বোধ করলাম। পরে যখন আমি প্রুডেন্সিয়াল সেন্টারের দিকে হেঁটে ফিরছি তখন গোটা পরিকল্পনার কৌশলের প্রশংসা করতে আমি বাধ্য হলাম। পুরো সময়টা আমি ক্লডিনের অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়েছি। আমাদের সম্পর্কের কোন প্রমাণ নেই। এমনকি মেইনের কেউই এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে ক্লডিনের পেশাদারী সততা প্রশংসনীয়। সে আমার মা-বাবার মতো টিল্টন ও মিডলবারি সম্পর্কে আমাকে ধোঁকা দেয়নি।

অধ্যায়-৪

কমিউনিজমের হাত থেকে একটি দেশকে রক্ষা

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আমি বহু রঙিন ছবি মনে মনে এঁকেছিলাম। টানা তিন মাস এই দেশে থাকতে হবে আমাকে। দেশটির উপরে আমি যেসব বইপত্র পড়েছিলাম সেগুলোর মধ্যে বহু রঙিন ছবি ছিল। এগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল রঙিন সারঙ পরিহিতা সুন্দরীদের, বালী দ্বীপের নর্তকীদের মুখ থেকে আগুন ছুঁড়ে মারা শামানদের ও ধোঁয়া উদগীরণকারী আগ্নেয়গিরিগুলোর পাদদেশস্থিত হ্রদগুলোতে ছিপকোষাগুলোর সশস্ত্র মাঝিদের ছবিগুলো ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। একটি বইয়ে পেয়েছিলাম সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ছবিগুলোর একটি সিরিজকে। কুখ্যাত বুগি জলদস্যুগণ কালো পাল বিশিষ্ট কাঠের তৈরি বিশালাকার জাহাজগুলো নিয়ে পুরো ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেকার সাগরগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। যখন ইউরোপীয়গণ প্রথমবারের মত ইন্দোনেশিয়াতে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন থেকেই তাদের সাথে বুগি জলদস্যুদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। তাই সেই যুগের ইউরোপীয় নাবিকগণ ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাত, "চুপ কর, নইলে বুগিরা তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে।" বুগিদের ছবিগুলো সেদিন আমার রক্তকে হিম করে দিয়েছিল।

দেশটির ইতিহাসে ও রূপকথাগুলোতে অতি প্রাকৃত চরিত্রগুলোর সংখ্যা অফুরন্ত। ক্রুদ্ধ দেবতাগণ, কমোডো ড্রাগনেরা, শক্তিশালী উপজাতীয় সুলতানবৃন্দ- কোনকিছুরই অভাব নেই। ইন্দোনেশিয়ার রূপকথাগুলো যীশু খ্রীস্টের জন্মের বহু হাজার বছর আগে এশিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমি ও ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। এরপর ইউরোপীয়দের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়। দেশটির বিখ্যাত দ্বীপগুলোর নাম — জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সুলাওয়েসি বিশ্বের বহু পরাক্রান্ত দেশকে অগ্নিমুখী পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট করেছে। বহির্বিশ্ব দেশটিকে সব সময়েই এক রহস্যময় রূপকথাপুরী বলে মনে করত। এর উত্তেজনাময় সৌন্দর্য বহু ভাগ্যান্বেষীকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করেছে। এই অজানা ঐশ্বর্যের খোঁজে কলম্বাস নিজের জীবনকে ব্যয় করেও একে খুঁজে পান নি। স্পেন, পর্তুগাল, বৃটেন, জাপান ও নেদারল্যাণ্ডস একে হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরে রাখতে পারেন নি।

আমার প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। বোধ হয় সকল বিখ্যাত অনুসন্ধানকারীর স্বপ্নই বড় হয়। তবে কলম্বাসের মতো নিজ স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল আমার। আমার বোঝা উচিত ছিল যে, ভাগ্যপট সব সময়ে আমাদের স্বপ্ন মাফিক আঁকা হয় না।

ইন্দোনেশিয়া অবশ্যই ঐশ্বর্যশালী একটি দেশ। তবে তা আমার স্বপ্নপুরীর মতো ঐশ্বর্যময় নয়। বরঞ্চ ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুর একটি দিনে ইন্দোনেশিয়ার প্রাণচঞ্চল রাজধানী জাকার্তায় পৌঁছে আমি রীতিমত হতাশ হলাম।

দেশটি অবশ্যই আকর্ষণীয় ও সুন্দর। চোখ ধাঁধানো রূপসীরা উজ্জ্বল রঙিন সারঙ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবুজ বাগানগুলোতে রঙের মেলা বসিয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফুলগুলো। বালি দ্বীপের উত্তেজনাময় নর্তকীদের ক্লাব রয়েছে অনেক। রিকশার সিটের পিছনে আঁকা রয়েছে রঙিন সব দৃশ্য। রিকশাচালকগণ যাত্রীদের দিকে ফিরে রিকশা চালায়। যাত্রীদের আসন নিচু হওয়ায় চালকের অসুবিধা হয় না। ঔপনিবেশিক যুগের প্রাসাদগুলো এখনও অক্ষত ও সুন্দর। মসজিদগুলোর একহারা সৌন্দর্য পর্যটকদের নজর কাড়ে।

দেশটির কুৎসিৎ দিকও রয়েছে। বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকেরা তারস্বরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়। বিদেশীদের, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের দেখলে উত্যক্ত করে মারে। মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য এক শ্রেণীর নারী দেহ বিক্রি করে। এক সময়ের সুদৃশ্য ডাচ খালগুলো এখন বদ্ধ নোংরা জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। নদীর দু'পারের ঘিঞ্জি বস্তিগুলোতে হতদরিদ্রের দল বাস করে। রাস্তায় যানজট লেগেই রয়েছে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও হর্নের বিকট শব্দ গোটা পরিবেশকে দূষিত করে রেখেছে।

সৌন্দর্য, বীভৎস্যতা, রুচিশীল, অশ্লীল, আত্মিক, জৈবিক সহ বিপরীত আঙ্গিকই পাশাপাশি বিরাজ করছে আজকের ইন্দোনেশিয়ায়। বিবিধ মশলার সুগন্ধ ও বিভিন্ন আবর্জনার দুর্গন্ধ পরস্পরের সাথে লড়াই করে প্রতিনিয়ত।

আমি এর আগে দারিদ্র্যের বীভৎস ছবি দেখেছি। নিউ হ্যাম্পশায়ারে আমার কয়েকজন সহপাঠী কাগজ ও কাঠের তৈরি খুপরিতে বাস করত। তারা শীতকালের তুষার ঝরা দিনগুলোতে স্কুলে আসত স্রেফ পাতলা একটি জ্যাকেট ও ছেঁড়াখোঁড়া কেডস জুতা পরে। তাদের অস্নাত দেহ থেকে ঘাম ও গায়ের গন্ধ বেরুত। আমি আন্দিজ পর্বতমালার আদিবাসী কৃষকদের সাথে কাঁদার তৈরি কুটিরে থেকেছি। সে সময় আমার নিত্যদিনের খাবার ছিল শুকনো ভুট্টা ও মেটে আলু। সেখানে অনেক শিশু প্রথম জন্মদিন উদযাপনের আগেই পৃথিবীকে চিরবিদায় জানাতো। কিন্তু তারপরও আমি জাকার্তার দারিদ্র্যের বীভৎস চিত্র দেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাদের দলকে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল পান্থশালা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইন্দোনেশিয়াতে রাখা হয়েছিল। পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলগুলোর মতই প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের মালিকানাধীন এই হোটেলটি ধনাঢ্য বিদেশী ব্যবসায়ী, বিশেষ করে জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের আতিথেয়তা প্রদান করত। ওই হোটেলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যায় আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার চার্লি ইলিংওয়ার্থ এক ডিনার পার্টির আয়োজন করলেন হোটেলটির শীর্ষে অবস্থিত রেস্তোরায়।

চার্লি ছিলেন যুদ্ধের ইতিহাসের এক ঝানু সমঝদার। তিনি তার অবসর সময় কাটাতেন

বিখ্যাত সামরিক নায়ক ও যুদ্ধগুলোর ইতিহাস পড়ে। তিনি ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমর্থনকারী গৃহনিবাসী সৈনিকদের মূর্ত প্রতীক। যথারীতি ডিনার পার্টির সময়ও তিনি খাকি রঙের ঢিলা প্যান্ট ও খাকি রঙের হাফ হাতা শার্ট পরেছিলেন। শার্টের দু'কাঁধে আবার সামরিক কায়দায় চাপরাশ লাগানো ছিল। তবে তা ছিল সামরিক প্রতীকহীন।

আমাদেরকে স্বাগত জানানোর পর চার্লি একটি চুরুট ধরালেন। প্রত্যেকের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে নিজের গ্লাস উঁচু করে বললেন, "সমৃদ্ধ জীবনের জন্য।" আমরা তার সাথে সুর মিলিয়ে বললাম, "সমৃদ্ধ জীবনের জন্য।" গ্লাসে গ্লাসে মৃদু টোকাটুকির শব্দ পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

চুরুটের ধোঁয়া চার্লির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি পুরো ঘরে নজর বুলিয়ে বললেন, "আমাদেরকে তো এখানে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হবে।" এ কথা বলে তিনি অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। এরপর নিজ হাতে ধরা নোট কার্ডগুলোয় চোখ বুলিয়ে বললেন, "ইন্দোনেশিয়ানরা আমাদের খুব ভালভাবেই আদর-যত্ন করবে। আর এখানকার আমেরিকান দূতাবাসতো আমাদের চোখের মণির মত পাহারা দেবে। কিন্তু আমরা যে এখানে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য এসেছি সে কথাটি ভুললে চলবে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জাভা দ্বীপে বিদ্যুতায়নের মাষ্টার প্ল্যান তৈরি করা। তবে এটা হচ্ছে হিমশৈলের অগ্রভাগ মাত্র।"

তখন তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে সময় তাকে জেনারেল প্যাটনের ভূমিকায় অভিনয়কারী জর্জ সি স্কটের মত দেখাচ্ছিল। জেনারেল প্যাটন চার্লির হিরোদের মধ্যে একজন। গুরুগম্ভীর সুরে চার্লি বললেন, "এখানে আমাদের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিজমের হাত থেকে একটি দেশকে রক্ষা করা। আপনারা জানেন যে, ইন্দোনেশিয়ার রয়েছে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। এখন যখন দেশটি বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই দেশটিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া যাতে তার উত্তরে অবস্থিত প্রতিবেশী তিনটি দেশ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তা সুনিশ্চিত করা। একটি সমন্বিত বিদ্যুতায়ন পদ্ধতি হচ্ছে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সফল হলে ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শাসন চিরস্থায়ী হবে।"

দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর চার্লি একটু থামলেন, চুরুটে দু-তিনটি টান দিলেন, এরপর একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর হাতের কার্ডগুলোয় আরেকবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "এবার পেট্রোলিয়ামের কথায় আসা যাক। আমাদের দেশ এটার উপরে কতটুকু নির্ভরশীল তা আমরা জানি। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া আমাদের শক্তিশালী মিত্রে পরিণত হতে পারে। তাই মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের সময় আগামী ২৫ বছর যাতে জ্বালানী শিল্প, সমুদ্র ও বিমানবন্দর, সরবরাহ লাইন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুতের যোগান পায় তা আপনারা নিশ্চিত করবেন।"

এবার নোট কার্ড থেকে চোখ তুলে চার্লি সরাসরিভাবে আমার দিকে তাকালেন। "সঠিক অবমূল্যায়নের চেয়ে ভুলক্রমে অতিমূল্যায়ন করা অনেক ভাল। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের হাতে ইন্দোনেশিয়ার শিশুদের ও আমাদের রক্তের দাগ লাগাতে চান না। আপনারা নিশ্চয়ই চান না যে, ইন্দোনেশিয়ার জনগণ কমিউনিষ্টদের বা চীনের অধীনে নিষ্পেষিত হোক।"

সে রাতে আমি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত একটি প্রথম শ্রেণীর স্যুটের বিছানায় শুয়ে রয়েছি। ক্লডিনের কথাগুলো অমার মনে পড়তে লাগল। বিশেষ করে বিদেশী ঋণ সম্পর্কে যে কথাগুলো সে বলেছিল সেগুলো আমার স্মৃতিকে নাড়া দিলো প্রবলভাবে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে আমি ম্যাক্রো-অর্থনীতি সম্পর্কে যে সব কথা শুনেছিলাম সেগুলো মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম। নিজের মনকে বোঝালাম যে, আমি এখানে এসেছি ইন্দোনেশিয়াকে মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক কারাগার থেকে বের করে আধুনিক শিল্পের কাতারে প্রবেশ করাতে। কিন্তু আমি এটাও বুঝেছিলাম যে, পরদিন সকালে যখন আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাব তখন হোটেলের বাগান ও সুইমিংপুলের প্রাচুর্য টপকে আমার চোখে পড়বে শ্রীহীন বস্তিগুলো। সেখানে সঠিক খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাবে শিশুরা মারা যাচ্ছে। সেই সাথে ওইসব বস্তির বাসিন্দারা নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করার কারণে নানারকম রোগে জর্জরিত হচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি, এপাশ-ওপাশ করছি, তবুও ঘুম পাচ্ছে না। অস্বীকার করতে পারছি না যে, চার্লি থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত আমাদের দলের প্রতিটি লোক ইন্দোনেশিয়ায় এসেছি বিশেষ স্বার্থ হাসিল করতে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিশেষ দূত রূপে কাজ করছি। আমরা মোটেও ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের উপকার করতে আসিনি। বরঞ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত লোভ আমাদেরকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাথে সাথে একটি শব্দ মনে পড়ল - কর্পোরেটোক্রেসি। শব্দটা আমি আগে শুনেছি, না সম্প্রতি মাত্র উদ্ভাবন করেছি, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তবে যে নয়া শাসকশ্রেণী গোটা বিশ্বকে শাসন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে শব্দটি পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য।

অল্প ক'জন ব্যক্তি তাদের আদর্শ ও লক্ষ্যমাত্রা এক হওয়ার কারণে এই সুসংহত শ্রেণীর সদস্যে পরিণত হয়েছেন। তারা সরকারের শীর্ষতম পদগুলো থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থাগুলোর শীর্ষতম পদগুলোতে অনায়াসে যাতায়াত করেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন রবার্ট ম্যাকনামারা। তিনি প্রথমে ছিলেন ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি ও ৩৬তম প্রেসিডেন্ট লিন্ডন ব্রেন্ডন জনসনের আমলে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেন। তারপর ম্যাকনামারা অধিষ্ঠিত হলেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদে।

আমি আরও বুঝতে পারলাম যে, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ম্যাক্রো-অর্থনীতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে পারেননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সুফল ভোগ করে শীর্ষতম পর্যায়ে অবস্থানকারী ক্ষুদ্রতম মহলটি। অন্যদিকে নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থানকারী বৃহত্তম জনগোষ্ঠী আরও দরিদ্র হয়। পুঁজিবাদী পদ্ধতি যত শক্তিশালী হয় ততই সংশ্লিষ্ট দেশটিতে মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথার পুনরুজ্জীবন ঘটে। যদি আমার কোন অধ্যাপক এ কথা জানতেন তাহলেও তিনি এ কথা স্বীকার করতে পারতেন না। কেননা, বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে প্রতিবছর।

যে ক'দিন আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইন্দোনেশিয়ায় ছিলাম সে ক'দিন রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। অবশেষে আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অর্জনগুলোকে বেছে নিলাম আত্মরক্ষার তাগিদে। আমি কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে টিল্টন টাউন, প্রেপ স্কুল ও সামরিক বাহিনীর ডাকের পর্যায়গুলোকে পার হয়ে এসেছি। সমানুপাতিক ঘটনাগুলো ও কঠোর পরিশ্রম মিলিয়ে আমি মোটামুটিভাবে সমৃদ্ধ জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছি। সেই সাথে আমি একজন সফল ও নির্ভরযোগ্য অর্থনীতিবিদে পরিণত হতে চলেছি। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যেভাবে তৈরি করেছিল সেভাবেই আমি কাজ করছিলাম। বিশ্বের সেরা চিন্তাবিদগণ যে মডেলকে অনুমোদন করেছিলেন সেই মডেলকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি সহায়তা করছিলাম।

তারপরও একদিন আমি সবকিছু ফাঁস করে দেবো এই অঙ্গীকার করে প্রায় প্রত্যেক দিন মধ্যরাতেও ঘুমাতে পারতাম না। কখনো কখনো লুই লা'আমুরের লেখা বুনো পশ্চিমের যুদ্ধকাহিনীগুলো পড়ে ঘুমকে ডেকে আনতে হতো।

অধ্যায়-৫
আত্ম বিক্রয়

আমাদের ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি ৬ দিন কাটালো জাকার্তায়। তবে আমরা একেবারে অলস সময় কাটাইনি। বরঞ্চ মার্কিন দূতাবাসে নাম তালিকাভুক্ত, বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা, কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও সুইমিংপুলের পাশে অবসর বিনোদন করেই এই সময়টা দিব্যি কেটে গেল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আমেরিকান অতিথিদের সংখ্যা দেখে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। মার্কিন জ্বালানী ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীদের দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। এরা দিন কাটাত সুইমিংপুলে। আর সন্ধ্যার পর পরই ভিড় জমাত হোটেলের আশপাশের আধা ডজন দামী রেস্তোরায়।

সপ্তম দিনে চার্লি আমাদের দলটিকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ি শহর বান্দুংয়ে। শহরটির আবহাওয়া কোমল, দারিদ্র্য অস্পষ্ট ও পরিবেশ প্রশান্ত। আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হলো একটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। ভবনটির নাম উইজমা। এর কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে একজন ম্যানেজার, একজন বাবুর্চি, একজন মালী ও পর্যাপ্ত সংখ্যক চাকর। ডাচ শাসনের যুগে নির্মিত এই ভবনটি একটি ছোটখাটো স্বর্গ বিশেষ। এর চওড়া বারান্দা থেকে জাভা দ্বীপের নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর ঢাল জুড়ে ছড়ানো চা বাগানগুলোকে দেখা যেত। থাকার জায়গা ছাড়াও আমাদের দেওয়া হয়েছিল ১১টি টয়োটা কোম্পানীর দামি গাড়ি। প্রতিটি গাড়িতেই ছিল একজন ড্রাইভার ও একজন দোভাষী। সেই সাথে আমাদেরকে বান্দুং গলফ ও র‍্যাকেট ক্লাবের সদস্য বানানো হয়েছিল সবশেষে সরকারী মালিকানাধীন বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান পেরুসাহান উমুম লিস্ত্রিক নেগারার স্থানীয় সদর দপ্তরে আমাদের প্রকল্প সেলের অফিস খোলা হয়েছিল।

বান্দুংয়ে প্রথম ক'দিন আমি চার্লি ও হাওয়ার্ড পার্কারের সাথে বৈঠক করে কাটালাম। হাওয়ার্ডের বয়স তখন ছিল সত্তরের কোঠায়। তিনি নিউ ইংল্যান্ড ইলেকট্রিক সিস্টেমের অবসরপ্রাপ্ত লোড ফোরকাস্টার। বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরে কেন্দ্রে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় একে লোড বলা হয়। এবার হাওয়ার্ডকে জাভা দ্বীপে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরবর্তী ২৫ বছরে এতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তার পূর্বাভাস প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ জন্য তাকে জাভা দ্বীপের প্রতিটি অঞ্চল, এমনকি শহরের বিদ্যুৎ চাহিদা আগামী ২৫ বছরে কী রকম হবে তা আগে নির্ধারণ করতে হবে। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বিদ্যুতের চাহিদার সম্পর্ক একেবারেই সরাসরি, সেহেতু আমার অর্থনৈতিক পূর্বাবাসের উপরে নির্ভর করতে হবে। আমাদের দু'জনের পূর্বাভাসের উপরে নির্ভর করে বাকি দল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, এর নকশা প্রণয়ন, পরিচালনা ও লাইন সরবরাহ এবং জ্বালানী পরিবহন ব্যবস্থার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবে। মাষ্টার প্ল্যান এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে আমার অর্থনৈতিক পূর্বাভাস ও হাওয়ার্ডের উৎপাদন পূর্বাভাস পুরোপুরিভাবে টেকে। আমাদের বৈঠকগুলোর সময় চার্লি আমার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে জোরালোভাবে কথা বলতেন। তিনি বার বার আমার পূর্বাভাসে আশাবাদের প্রতিফলন ঘটাতে বলতেন। ক্লডিনের কথাই ঠিক – পুরো মাস্টার প্ল্যান দাঁড়াবে আমার রিপোর্টের উপরে।

চার্লি ব্যাখ্যা করেছিলেন, "প্রথম কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে তথ্য সংগ্রহ করতে করতেই।"

চার্লির বিশাল অফিস কক্ষে আমরা তিনজন তিনটি ঢাউস আরাম কেদারার উপরে বসেছিলাম। কক্ষটির দেয়াল ঢাকা ছিল বুটিকের পর্দা দিয়ে। পর্দাগুলোয় আঁকা ছিল রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীর দৃশ্য। বরাবরের মতই চার্লি মোটা একটি চুরুট টানছিলেন।

তিনি আমার দিকে চুরুট তাক করে ধরে বললেন, "প্রকৌশলীরা বর্তমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বন্দরের ক্ষমতা, সড়ক, রেলপথ এসবের পুরো তথ্য সংগ্রহ করছেন। আপনাকে দ্রুত কাজ করতে হবে। প্রথম মাসের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ স্থাপনের পর যেসব অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটবে সেগুলোর আগাম চিত্র হাওয়ার্ডকে দিতে হবে। দ্বিতীয় মাসের মধ্যে তিনি অঞ্চল ভিত্তিক সম্ভাব্য চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহের চিত্র তৈরি করবেন। শেষ মাসে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। তখন পুরো দল এক সাথে কাজ করবে। তাই ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে যাবার আগে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। থ্যাংকস গিভিং ডে আমরা যার যার বাড়িতে বসে উদযাপন করব এটাই হচ্ছে আমার সিদ্ধান্ত। আমরা এখানে আর ফিরে আসব না।"

বাইরে হাওয়ার্ড ছিলেন এক শান্তশিষ্ট আমুদে বুড়ো মানুষ। কিন্তু ভেতরে তিনি ছিলেন ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত হওয়ার এক তিক্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নিউ ইংল্যান্ড ইলেকট্রিক সিস্টেমের শীর্ষে পৌঁছতে পারেন নি। এ জন্য তার ভেতরে ক্ষোভ জমা ছিল প্রচুর। তিনি বার বার আমাকে বলেছেন, "ওদের কথা মেনে চলি নি বলে ওরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।" তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন তিনি বেকার জীবন যাপন করেছেন। যখন মেইন তাকে কনসালটেন্টের চাকরির প্রস্তাব দিলো তখন তিনি তা লুফে নিলেন। মেইনের জন্য এবার নিয়ে তিনি দ্বিতীয় বারের মতো কাজ করছেন। এইনার ও চার্লি দুজনেই আমাকে হাওয়ার্ড সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারা হাওয়ার্ড সম্পর্কে জেদী, নীচ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন।

অথচ এই হাওয়ার্ডই ছিলেন আমার প্রাজ্ঞতম শিক্ষকদের অন্যতম। তবে প্রথমে আমি তার শিক্ষাকে গ্রহণ করতে চাইনি। ক্লডিন আমাকে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সে ধরনের প্রশিক্ষণ হাওয়ার্ড কোনদিনও পান নি। সম্ভবত তাকে বেশী বৃদ্ধ বা বেশী জেদী মনে করা হয়েছিল। অথবা তাকে নির্ভরযোগ্য মনে না হওয়ায় আমার মতো নমনীয় ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। খুব সম্ভবত ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তাকে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হাওয়ার্ড খুব পরিষ্কারভাবেই পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি কারও হাতের পুতুল হবেন না। তার সম্পর্কে এইনার ও চার্লি যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলো পুরোপুরি ভাবে ঠিক ছিল। কিন্তু কারও কাছে নতি স্বীকার না করার মনোভাব হাওয়ার্ডকে অনমনীয় করে তুলেছিল। তিনি অর্থনৈতিক ঘাতক কথাটি আদৌ শুনেছিলেন কিনা সন্দেহ। তারপরেও তিনি জানতেন যে, তাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারটিই হাওয়ার্ড মেনে নিতে পারেননি।

চার্লির সাথে প্রথম বৈঠকের পর হাওয়ার্ড আমাকে নিরালায় ডেকে নিলেন। তার কানে একটি শ্রবণ যন্ত্র লাগানো ছিল। এটার শব্দ বাড়ানো-কমানোর যন্ত্রটি লাগানো ছিল তার শার্টের ভেতরে। কথা বলার আগে হাওয়ার্ড শার্টের ভেতরের যন্ত্রটিকে নড়াচড়া করে নিলেন।

এরপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, "এখন যা বলব তা আপনার ও আমার মধ্যেই থাকবে। তারা আপনাকে বোঝাতে চাইবে যে, এই অর্থনীতি রকেটের মত উড়ে যাবে আকাশে। চার্লি অত্যন্ত নির্মম। উনি যেন আপনাকে খেয়ে না বসেন তা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে।" আমরা দু'জন পিএলএন ভবনের একই কক্ষে কাজ করতাম। ভবনের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল একটি জলাবদ্ধ খাল। আমাদের কক্ষের জানালা দিয়ে খালটিকে দেখা যেত।

হাওয়ার্ড যখন কথা বলছিলেন তখন আমার নজর ছিল জানালার দিকে। একটি তরুণী খালের পানিতে গোসল করছিল। তার নগ্ন দেহে কোন রকম একটি সারঙ জড়ানো ছিল। হাওয়ার্ডের কথাগুলো আমার মনকে কষ্ট দিচ্ছিল। আমি চাচ্ছিলাম তাকে বোঝাতে যে, চার্লির কথাই ঠিক। এছাড়াও মেইনের প্রধান কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টির উপরে আমার ক্যারিয়ার নির্ভর করছিল।

আমি তাকে গোসলরত তরুণীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "অবশ্যই এই অর্থনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটবে। চেয়ে দেখুন আপনার সামনে কী ঘটছে।"

হাওয়ার্ড খুব সম্ভবত জানালার বাইরের দৃশ্যটিকে দেখতে পাননি। তিনি নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন, "হুঁ বুঝেছি। আপনিও ওদের দলে ভিড়েছেন।"

খালের পাড়ের একটি দৃশ্য আমার নজর কাড়লো। একজন মাঝবয়েসী লোক পাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। এরপর প্যান্ট খুলে নিচে নামিয়ে খালের পাড়ে বসল মলত্যাগ করার জন্য। তরুণী লোকটিকে দেখল, তারপরও গোসলের কাজ চালিয়ে গেল। আমি জানালা থেকে নজর ফিরিয়ে হাওয়ার্ডের দিকে সরাসরি ভাবে তাকালাম।

আমি জবাব দিলাম, "আমার বয়স কম হতে পারে, কিন্তু আমি তিন বছর দক্ষিণ আমেরিকায় কাটানোর পর মাত্র কয়েকদিন আগে ফিরে এসেছি। ওখানে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর কি ঘটেছে তা দেখেছি। পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলাতে পারে।"

হাওয়ার্ড ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "আহা! আমিও তো ঘোরাঘুরি করেছি, তাও বহু বছর ধরে। হে যুবক, আমি আপনাকে ক'টি কথা বলব। আমি আপনার পেট্রোলিয়াম উদ্ভাবন ও এরকম ব্যাপার-স্যাপারকে কানাকড়ি দামও দিই না। আমি সারা জীবন ইলেকট্রিক লোডের পূর্বাভাস তৈরি করেছি। মহামন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উন্নয়ন-পতন সবই দেখেছি। ১২৮ রুটের তথাকথিত ম্যাসাচুসেটস বিপ্লব বোস্টনের জন্য কী ফল বয়ে এনেছিল তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, কোন অর্থনীতিই দীর্ঘ সময় ৭-৯% এর বেশী উন্নয়নসূচক ধরে রাখতে পারে না। তাও আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুঙ্গী পর্যায়ের জন্য। নইলে ৬% উন্নয়ন হার হচ্ছে বাস্তব ও যৌক্তিক।"

আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। তার কথা যে ঠিক তা আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলাম। তারপরেও আমি তা মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি তাকে আমার মত বোঝানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কেননা, আমার বিবেক গোটা ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখতে চাইছিল।

আমি খুব গম্ভীরভাবে বললাম, "হাওয়ার্ড, এটা বোস্টন নয়। এটা এমন একটা দেশ যেখানে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ ঠিক মতো শুরুই হয় নি। এখানকার পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে আলাদা।"

তিনি সজোরে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত ঝাপটা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। হিংস্রভাবে বললেন, "বেশ, তাহলে আপনি এগিয়ে যান। নিজের আত্মাকে বিক্রি করুন। আপনার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে কী লেখা থাকবে তা নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাব না।" সজোরে নিজের চেয়ারটিকে টেনে নিয়ে তাতে ঝপ করে বসলেন। তারপর শীতল কণ্ঠে বললেন, "আমি যা বুঝি সেভাবেই আমার বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বাভাস তৈরি করব। আপনাদের কল্পিত উন্নয়নের জোয়ারে ভাসব না।" বলেই পেন্সিল দিয়ে প্যাডের কাগজে লিখতে শুরু করলেন।

আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। বিনা যুদ্ধে এই হাড়বুড়োর কাছে আমি নতি স্বীকার করব না। আমি তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তারপর বললাম, "যদি আমি সবার প্রত্যাশা পূরণ করে ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণযুগের সাথে টেক্কা দিয়ে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস দিই, আর আপনি যদি ষাটের দশকের বোস্টনের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বাভাস দেন, তাহলে সবাই আপনাকে আহাম্মক বলবে।"

হাওয়ার্ড প্যাডের উপরে পেন্সিল আছড়ে ফেললেন। এরপর চোখের আগুনে আমাকে পুড়িয়ে ছাই করতে চাইলেন। তারপর দেয়ালের দিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন, "বিবেকহীন। আপনারা সবাই শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করেছেন। আপনাদের

একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অঢেল বিত্ত রোজগার করা।" কপট হাসি হেসে শার্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বললেন, "আমি আমার শ্রবণযন্ত্র বন্ধ করে নিজের কাজ শুরু করেছি।"

কথাগুলো আমাকে চুরমার করে দিলো। ঝড়ের বেগে আমাদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে চার্লির কক্ষের দিকে ছুটলাম। আমি এগিয়ে যাই, আর গতি কমে যায় মাঝপথে এসে আমার চলা থেমে গেল। কী করতে চাই তা বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। এরপর বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম বিকেলের পড়ন্ত রোদে। তরুণীটি তখন খালের পাড় বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ভেজা সারঙটি তার সদ্যস্নাত দেহে শক্ত করে জড়ানো। মাঝবয়েসী লোকটি তখন নেই। কয়েকটি ছেলে তখন খালের পানিতে নেমে পানি ছুঁড়ছে আর হৈ চৈ করছে। এক বৃদ্ধা হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। আরেক বৃদ্ধা কাপড় ঘষছে।

এক দলা কান্না আমার গলায় জমাট বেঁধে রয়েছে। খালের বিকট দুর্গন্ধকে উপেক্ষা করে পাড়ের উপরে পড়ে থাকা কংক্রিট খণ্ডের উপরে বসে পড়লাম। আমি শত চেষ্টা করেও চোখের জল আটকে রাখতে পারছিলাম না। কেন আমি এত কষ্ট পাচ্ছি তা আমাকে বুঝতেই হবে।

"আপনারা টাকা রোজগারের জন্য এই কাজ করছেন"-হাওয়ার্ডের কথাগুলো আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তিনি আমার মনকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছেন।

ছেলেরা তখনো পানি ছিটাচ্ছে। তাদের উল্লাসের সুর তখনো বাতাসের তারে বাজছে। আর আমি চিন্তা করছি আমি কী করব। কী করলে আমি তাদের মতো নির্ভয়ে জীবন কাটাতে পারব? ওদের নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দকে যতই দেখছি ততই প্রশ্নটি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। দূষিত পানি যে ওদের ক্ষতি করতে পারে সেই ভাবনা তো ওদের একেবারেই নেই। গুটি গুটি পায়ে বাঁকাচোরা লাঠি হাতে এক কুঁজো বুড়ো লোক এসে বসল খালের পাড়ে। কতক্ষণ ছেলেদের আনন্দকে উপভোগ করল। তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দাঁতহীন ফোকলা হাসি।

আমি হয়তো হাওয়ার্ডকে সব কথা খুলে বলতে পারি। দুজনে মিলে হয়তো একটা সমাধান খুঁজে পেতে পারি। সাথে সাথে আমার মন ফুরফুরে হয়ে উঠল। একটা ছোট্ট নুড়ি ছুঁড়ে মারলাম পানিতে। ঢেউ জাগল, মিলিয়ে গেল, সে সাথে আমার চাঙ্গা ভাবও উধাও হলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি এই কাজটি করতে পারব না। হাওয়ার্ড বয়োবৃদ্ধ ও চরমভাবে তিক্ত। তিনি তার ক্যারিয়ারকে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগগুলোকে হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এখন তিনি আর পিছু হটবেন না। আমি যুবক, মাত্র আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে, আমি তার মতো নিজের জীবনকে নষ্ট করতে পারব না।

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম। কেবলই আমি আমার জীবনে আসা লোকগুলোর কথা চিন্তা করছি। হাওয়ার্ড, চার্লি, ক্লডিন, অ্যান, এইনার, আঙ্কল ফ্র্যাঙ্ক – এরা যদি আমার জীবনে না আসত তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম? অবশ্যই ইন্দোনেশিয়ায় নয়। আমি কোথায় যাচ্ছি, আমার ভবিষ্যৎ কী হবে – তাও চিন্তা

করলাম। যে সিদ্ধান্ত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাও আমাকে চিন্তায় ফেলল। চার্লি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমার ও হাওয়ার্ডের পূর্বাভাস দু'টিতে বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কমপক্ষে ১৭% দেখতে চান। তাহলে এখন আমি কী করব?

হঠাৎ করে একটা আইডিয়া আমার মাথায় গজাল। সাথে সাথে আমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত প্রশান্ত হলো। কেন এটা আগে আমার চিন্তায় আসে নি? কী করতে হবে তাতো আমার মাথাব্যথা নয়। হাওয়ার্ড যা ভাল বুঝেন তা করবেনই সেটা আমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আমার সিদ্ধান্তকে আমলেই দেবেন না। আমি আকাশছোঁয়া প্রত্যাশার ছবি এঁকে আমার কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে পারি। হাওয়ার্ড কঠিন বাস্তবের ছবি আঁকবেন তার রিপোর্টে। আমার রিপোর্ট মাস্টার প্ল্যানকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করবে না। যারা আমার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বার বার তারা ভুল করেছেন। আমার মন থেকে সকল দুর্ভাবনা উধাও হলো। আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

ক'দিন বাদে হাওয়ার্ড ভয়াবহ আমাশায় আক্রান্ত হলেন। আমরা তাকে সাথে সাথে নিয়ে গেলাম স্থানীয় ক্যাথলিক মিশনারী হাসপাতালে। ডাক্তাররা ওষুধ লিখে দিলেন। সেই সাথে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করলেন। হাওয়ার্ড জানালেন যে, তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি এরই মধ্যে সংগ্রহ করেছেন। তিনি অনায়াসেই বোস্টনে বসে তার পূর্বাভাস তৈরি করতে পারবেন।

বিদায় নেওয়ার আগে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা তার আগের সতর্কবাণীকেই মনে করিয়ে দিলো আবার। তিনি বললেন, "সংখ্যা বানানোর কোন দরকার নেই। আপনার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে যত বড় স্বপ্নই থাকুক না কেন, আমি এই যুক্তির অংশীদার হবো না।"

দ্বিতীয় পর্ব

১৯৭১-১৯৭৫

অধ্যায়-৬
আমি যখন তদন্তকারী

মেইনের চুক্তি ছিল ইন্দোনেশিয়ার সরকার, ইউএস-এইড ও এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে। এই চুক্তির একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, মেইনের প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য মাস্টার প্ল্যানের আওতাধীন এলাকার জনবহুল স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন। আমার কাঁধেই এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো। প্রজেক্ট ম্যানেজার চার্লি হাসতে হাসতে বললেন, "যেহেতু আপনি আমাজান জয় করতে পেরেছেন, সেহেতু আপনিই পারবেন মশা, মাছি, সাপ ও দূষিত পানিকে জয় করতে।"

যে কথা সেই কাজ। ড্রাইভার ও দোভাষীকে নিয়ে আমি জাভা দ্বীপের বহু অপূর্ব সুন্দর স্থানে ঘুরলাম। তবে থাকার জায়গাগুলো প্রায়ই হতো বদখৎ। এসব স্থানে আমি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করেছি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের মতামত শুনলাম। তবে এদের বেশীর ভাগই আমার সাথে খোলামেলা ভাবে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তাদের কাছ থেকে আমি খুব কমই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছি। বরঞ্চ আমার সামনে কথা বলতে তারা ভয় পাচ্ছেন বলেই আমার মনে হয়েছে। প্রায়ই তারা আমাকে বলতেন যে, আমাকে তাদের উর্ধ্বতন নেতাদের সাথে কথা বলতে হবে। অথবা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নতুবা জাকার্তায় অবস্থিত বাণিজ্যিক সদর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

এসব ভ্রমণ ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, মাত্র দু-তিন দিনের জন্য। প্রতিটি ভ্রমণ শেষে আমি ফিরে যেতাম বান্দুংয়ের উইজমা ভবনে। এই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের ম্যানেজার ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। তার রাসমন নামের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার মা বাদে আর সকলেই তাকে রাসি বলে ডাকতো। সে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিল। পরিচয় হওয়ার পর থেকেই সে আমার কাজে গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে। তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগল যে সে হয়তো এক সময় আমার কাছে চাকরি চেয়ে বসবে। রাসি আমাকে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া শেখাতেও শুরু করল।

নেদারল্যান্ডসের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই সোয়েকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার জন্য একটি সহজ ভাষা উদ্ভাবনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। গোটা দেশটিতে ৩৫০টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষায় লোকজন কথা বলে। বহু দ্বীপের ও বহু সংস্কৃতির লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হলে যে একটি সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন তা সোয়েকর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এ কাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদদের নিয়োগ করেছিলেন। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সুফল ফসল হচ্ছে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। মালয় ভাষার উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা বাহাসা ইন্দোনেশিয়ায় বহু ভাষার মতো কাল পরিবর্তন, অনিয়মিত ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য জটিলতা নেই। সত্তরের দশকের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার সিংহভাগ নাগরিক এই ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল। তবে নিজ গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সাথে কথা বলার সময় প্রত্যেক ইন্দোনেশীয় নাগরিক নিজ গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করত। এছাড়াও ছিল প্রতিটি দ্বীপের সাধারণ ভাষা। রাসি ছিল তুখোড় রসবোধ সম্পন্ন এক অসাধারণ শিক্ষক। সেই সাথে স্প্যানিশ বা শুয়ার ভাষা শেখার চেয়ে বাহাসা শেখা ছিল অনেক সহজ।

রাসির একটি মোটর বাইক ছিল। এটিতে চড়িয়ে সে আমাকে বহু জায়গায় নিয়ে গেছে। এভাবেই আমি বান্দুং শহর ও এর অধিবাসীদের ভালভাবে চিনতে-বুঝতে-জানতে পেরেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাসি আমাকে বলল, "বাইকে চাপুন। যে ইন্দোনেশিয়া আপনি এখন পর্যন্ত দেখেননি সেই ইন্দোনেশিয়াকে আজ আমি আপনাকে দেখাব।" আমি সাথে সাথে রাজি হলাম।

রাসির বাইক আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল ছায়া ও পুতুল নাচের শো, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজানো যন্ত্রশিল্পী, মুখ থেকে আগুন ছুঁড়ে মারা শামান ও একশ' আমেরিকান ক্যাসেট থেকে দুর্লভ স্থানীয় পুরাকীর্তি পর্যন্ত সব ধরনের জিনিস বিক্রয়কারী হকারদের ছাড়িয়ে। থামল গিয়ে একটি সরু গলির ভেতরে একটি ক্ষুদে কফি হাউজের সামনে। ষাটের দশকের শেষদিকে বিটলস গ্রুপের মিউজিক শোর দর্শকদের মতো পোশাক, টুপি ও লম্বা চুলওয়ালা তরুণ-তরুণীরা কফি হাউজটিতে চুটিয়ে আড্ডা মারছিল। তবে এরা সবাই খাঁটি ও অকৃত্রিম ইন্দোনেশীয়। রাসি আমাকে কোণার একটি টেবিলে নিয়ে গিয়ে ওটির চারপাশে বসে থাকা তরুণ-তরুণীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা দুটি চেয়ার টেনে বসলাম।

রাসির বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই ইংরেজী বলতে পারত। তবে একেক জনের বাকপটুতা একেক রকম ছিল। কিন্তু তারা সকলেই আমার বাহাসা বলার চেষ্টাকে পছন্দ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা আমার সামনে খোলাখুলিভাবে এ সম্পর্কে কথা বলেছে। পরে আমার কাছে জানতে চেয়েছে যে, কেন আমেরিকানরা তাদের ভাষা শেখে না? আমি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিনি। তারা আরও জানতে চেয়েছিল যে, আমেরিকানরা সব সময়ই গলফ, র‍্যাকেট ক্লাব, দামী রেস্তোরা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপার মার্কেটে ভিড় জমায়। কিন্তু কেন তারা শহরের অন্যান্য অংশে যায় না? এ ক্ষেত্রেও আমাকে বাধ্য হয়েই নিরুত্তর থাকতে হয়েছে।

এই রাতটির কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। রাসি ও তার বন্ধুরা আমাকে ওদের একজন হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। আমি তাদের সাথে শহর ঘুরে দেখেছি। রাতের খাবার খেয়েছি। গান-বাজনা শুনেছি। নানা রকম শো দেখেছি। বহু রকম সুগন্ধী দ্রব্য শুঁকেছি। লবঙ্গ মেশানো সিগারেট ফুঁকেছি। তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করেছি। সেই তিন বছর আগেকার পীস কোর জীবনের সহজ-সরল আনন্দ-উল্লাসকে ফিরে পেয়েছিলাম আমি। আমি নিজেকে শুধোলাম, "কেন এসব লোককে এড়িয়ে তুমি একাকি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চাও?" রাত যত বাড়ল তত ওরা ওদের দেশ সম্পর্কে আমার ধারণা শুনতে চাইল। এরপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মত জানতে চাইল। ওদের প্রশ্ন ছিল একটাই, "কেন যুক্তরাষ্ট্রের মত পরাশক্তি ভিয়েতনামের মত দেশকে অবৈধভাবে দখল করে রাখবে?" এ ব্যাপারে আমার অভিমত শুনে ওরা শুনে ওরা খুশি হলো।

যখন আমি ও রাসি অতিথি ভবনে ফিরে এলাম, তখন প্রায় মধ্যরাত। আমি আমাকে তার জগতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে ধন্যবাদ জানালাম। সে আমাকে পাল্টা ধন্যবাদ জানাল তার বন্ধুদের সাথে আন্তরিকভাবে মেশার জন্য। আমরা ঠিক করলাম যে, আমরা মাঝে মধ্যে এ রকম নিশীথ-নগর ভ্রমণে বেরুব। এরপর খুশি ভরা মনে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর যে যার কক্ষের দিকে চলে গেলাম।

রাসির সাথে নগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমাকে মেইনের বাকি দল থেকে আলাদাভাবে চলাফেরা করতে উৎসাহী করে তুলল। পরদিন সকালে আমি চার্লিকে জানালাম যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের স্লথগতি আমাকে হতাশ করে তুলেছে। তাই অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জাকার্তায় অবস্থিত সরকারী দপ্তরগুলো থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্য জাকার্তায় এক থেকে দুই সপ্তাহ ব্যয় করা উচিত। চার্লি আমার সাথে একমত হলেন।

তিনি বান্দুংয়ের মতো সুন্দর শহর ছেড়ে জাকার্তার মত ঘিঞ্জি শহরে আমাকে সময় কাটাতে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তার কথায় সায় দিলাম। কিন্তু মনে মনে খুশি হলাম স্বাধীনভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে। একা একটা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকতে পারব, জাকার্তায় ইচ্ছে মতো ঘোরাফেরা করতে পারব এ ব্যাপারটি আমাকে উল্লসিত করে তুলল। কিন্তু জাকার্তায় পৌছার পর বুঝতে পারলাম যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও মন-মানসিকতা পাল্টে গেছে। রাসি ও তার বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এবং জাভা দ্বীপে ভ্রমণ করার সুবাদে আমি পুরোপুরিভাবে পাল্টে গেছি। আমি অন্যান্য আমেরিকানদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বসবাসকারী আমেরিকান যুবতী স্ত্রীদের দেখতে আগের মতো আকর্ষণীয় মনে হলো না। সুইমিংপুলের চারধারে অনুচ্চ ইস্পাত বেস্টনী দেখে অবাক হলাম। হোটেলের নিচ তলার জানালাগুলোর বাইরে ইস্পাতের গ্রীল মনকে খুব কষ্ট দিলো। দামী রেস্তোরাঁগুলোর খাবারকে মনে হলো বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন।

আমি আর একটি ব্যাপার খেয়াল করলাম। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী মহলের

সাথে বৈঠক করার সময় আমি আমার প্রতি তাদের ব্যবহারে সূক্ষ্ম কৌশলের আভাস টের পেয়েছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমার উপস্থিতিকে চরমভাবে ঘৃণা করে। যখন তারা আমাকে অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় তখন তারা দু'টি বাহাসা শব্দ ব্যবহার করে। এই শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে তদন্তকারী ও জেরাকারী। আমি যে বাহাসা ভাষা বেশ ভালভাবে বলতে পারি তা কারও কাছেই প্রকাশ করি নি। এমনকি আমার দোভাষীও মনে করত যে, আমি খুব বড়জোর বাহাসা ভাষার কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারি। অথচ আমি একটি খুব ভালো বাহাসা-ইংরেজী ডিকশনারী কিনেছি। এটি সব সময় আমার সাথে সাথে থাকত। প্রতিটি বৈঠক শেষে আমি ডিকশনারী খুলে বৈঠকের সময় বাহাসা বলা কথাবার্তার সঠিক অর্থ বার করে নিতাম। তবে অবশ্যই তা করতাম অন্যদের অগোচরে।

এসব নাম কি ছিল শুধু ভাষা ব্যবহারের ফাঁকফোকর? না ডিকশনারীতে ছাপানো অর্থের ভুল ব্যাখ্যা? আমি দু'টোর যে কোন একটিকে মেনে নিতে তৈরি ছিলাম। কিন্তু আমি এসব লোকের সাথে যতবেশী সময় কাটিয়েছি ততবেশী করে নিজেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী বলে মনে হয়েছে। এরা আমার সাথে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে নি। বরঞ্চ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশের কারণেই সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছে। আমি জানি না এই নির্দেশ কে দিয়েছে? সরকারী আমলাতন্ত্র, ব্যাংক, সামরিক বাহিনী, না আমেরিকান দূতাবাস? আমি এটুকু জানি যে, তারা আমাকে তাদের অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। চা-নাস্তা খাইয়েছে। ভদ্রভাবে আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। দৃশ্যত তারা আমাকে স্বাগতই জানিয়েছে। কিন্তু এই সহজ-সরল দৃশ্যের আড়ালে ছিল অসহায়ত্ব ও অসন্তুষ্টির কুটিল-গরম মনোভাব।

তাই তাদের জবাব ও তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনে সব সময়ই সন্দেহের কাঁটা খচখচ করত। উদাহরণস্বরূপ, আমি কারও সাথে আলোচনা করার জন্য আমার দোভাষীকে সাথে নিয়ে সরাসরিভাবে কোন অফিসে যেতে পারতাম না। এ জন্য তাকে আগে যোগাযোগ করে সময় ঠিক করতে হতো। দৃশ্যত কাজটি ছিল দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের অংশ মাত্র। কিন্তু বাস্তবে যোগাযোগ করতেই প্রচুর সময় লাগত। টেলিফোন হয় ব্যস্ত থাকত, না হয় এর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না। সৌভাগ্যক্রমে লাইন পাওয়া গেলেও ব্যক্তিগত সচিব মধুর স্বরে কর্মকর্তাটির ব্যস্ততার কথা জানতেন। তাই আমাদেরকে অসহ্য যানজট পেরিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটিয়ে মাত্র এক মাইল দূরের কোন অফিসে পৌঁছাতে হতো। এরপর শুরু হতো এক গাদা ফর্মপূরণ করার পালা। অবশেষে দৃশ্যপটে একজন পুরুষ ব্যক্তিগত সচিবের আবির্ভাব ঘটত। মুখে থাকত মধুর হাসি – জাভা দ্বীপের অধিবাসীরা এ জন্য বিশ্বখ্যাত। এরপর বিগলিত বিনয়ের সাথে তিনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে সব তথ্য জেনে নিতেন। তারপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে আলোচনার সময় নির্ধারণ করতেন।

আলোচনার সময় সকল ক্ষেত্রেই যোগাযোগের কয়েকদিন পরেই ঠিক করা হতো। যখন আলোচনা ঘটত তখন আমার হাতে তুলে দেওয়া হতো এক ফাইল ভর্তি তথ্যবহুল

কাগজপত্র। শিল্পের মালিকরা আমাকে পাঁচসালা বা দশসালা পরিকল্পনা উপহার দিতেন। ব্যাংকাররা দিতেন এক গাদা চার্ট ও গ্রাফ। সরকারী আমলাগণ দিতেন অনেক প্রকল্পের বিবরণ যা বাস্তবায়িত করা হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বইবে। ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসন, ব্যাংক ও শিল্পের প্রধানগণ যে তথ্য দিতেন ও আলোচনার সময় যা বলতেন তাতে মনে হতো যে, জাভা দ্বীপের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিশ্বের মধ্যে অতুলনীয়। কেউই আমাকে জাভায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন কঠিন প্রশ্ন করেন নি এমনকি কোন নেতিবাচক তথ্যও দেননি।

বান্দুংয়ে ফিরে যাওয়ার সময় আমি জাকার্তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। একটা ব্যাপার আমাকে এ সময় প্রবলভাবে খোঁচাচ্ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, আমি ইন্দোনেশিয়ায় যা করছি তা একটি পাতানো খেলার অংশ। আমরা সবাই পোকার খেলতে বসেছি। আমরা প্রত্যেকেই যার যার কার্ডগুলোকে সযত্নে আড়াল করে রাখছি। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এমনকি সংগৃহীত তথ্যের উপরে পুরোপুরিভাবে নির্ভর করতেও পারছি না।

অথচ এই খেলাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর ফলাফল দীর্ঘদিন যাবৎ ইন্দোনেশিয়ার লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে।

অধ্যায়-৭
সভ্যতার বিচার

রাসি উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল, "আজ আমি আপনাকে এক 'দালাঙের শো'তে নিয়ে যাব। আপনি জানেন বোধহয় যে, এরা ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত পুতুল নাচিয়ে। আজ শহরে একজন সেরা দালাঙ তার শো দেখাবেন।" আমি বান্দুংয়ে ফিরে আসায় রাসি যে খুব খুশি হয়েছে তা বুঝতে পারলাম।

রাসির বাইকে চড়ে বান্দুং শহরের এমন সব এলাকার ভেতর দিয়ে চললাম যেগুলোর নাম আমি আগে কখনো শুনি নি। এসব এলাকার বাড়িগুলোর মধ্যে কাম্পংয়ের সংখ্যাই বেশি। কাম্পং হচ্ছে টাইলসের ছাদ বিশিষ্ট ক্ষুদে চিরায়ত মন্দিরের দরিদ্র সংস্করণ। ডাচ শাসনামলের বিশালাকার প্রাসাদ ও অফিসগুলোর কোন অস্তিত্ব এসব এলাকায় নেই। অথচ আমি ইন্দোনেশিয়ায় আসার পর এ ধরনের স্থাপনা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

লোকজন পরিষ্কারভাবে দরিদ্র। অথচ এদের আত্ম-গৌরব চোখে পড়ার মতো। তারা পরেছে জীর্ণ অথচ পরিষ্কার বুটিক সারঙ, উজ্জ্বল বর্ণের ফতুয়া ও খড়ের টুপি। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের স্বাগত জানায় নির্মল হাসি ও উষ্ণ-আন্তরিক ব্যবহার সহকারে। যখন আমাদের বাইক থামল, তখন ক্ষুদে ছেলেমেয়েদের দল আমার জীনসের পোশাক ছুঁয়ে দেখতে লাগল। একটি ছোট মেয়ে আমার চুলে গুঁজে দিল একটি ফ্র্যাঙ্গিপ্যানি ফুল।

রাসি বাইটকটাকে ভেড়াল একটি গলির ভেতরে একটি থিয়েটারের সামনে। থিয়েটারের সামনে কয়েকশ লোক জমায়েত হয়েছে। অনেকেই হাল্কা চেয়ারগুলোতে বসে রয়েছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে রাতের আকাশ ছিল মেঘহীন। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। আমরা বান্দুংয়ের সবচেয়ে প্রাচীন অংশে অবস্থান করছি। এই এলাকায় কোন সড়কবাতি নেই। মাথার উপরে তারাগুলোর আলো জ্বলজ্বল করছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আগুনে পোড়া কাঠ, চিনাবাদাম ও লবঙ্গের সুগন্ধ।

রাসি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ফিরে এল কফি হাউজের সেদিনের ওই আড্ডাটার অনেককে নিয়ে। তারা আমাকে প্রথমে খাওয়াল ছোট চিনাবাদামের তেলে ভাজা মাংসের টুকরো, যার নাম স্যাতে। এরপর খাওয়াল ছোট ছোট পিঠা। অবশেষে এলো ক্ষুদে ক্ষুদে

কাপ ভর্তি গরমা গরম চা। সাতে খাওয়ার আগে আমি দোটানায় ভুগছিলাম। কেননা, রাসির এক বান্ধবী সাতেওয়ালার ভ্যানের চুলা দেখিয়ে বলেছিল, একেবারে ভাজা মাংস। মাত্র ভাজা হচ্ছে।"

ঠিক তখনই শুরু হলো বাজনা। গোটা অস্তিত্বকে সম্মোহিত করে ফেলল এর সুর। যন্ত্রটির নাম হচ্ছে গামালং। এর আওয়াজ ঠিক চিনা মন্দিরের বিশাল ঘন্টার মতো।

রাসি ফিস ফিস করে বলল, "দালাঙ নিজেই সব বাজনা বাজান। তিনি পুতুলদেরও নাচান। এগুলোর সংলাপও বলেন বহু ভাষায়। আমরা এসব সংলাপ আপনাকে অনুবাদ করে শোনাব।"

সেদিন দালাঙ প্রাচীন রূপকথার সাথে চলতি ঘটনা মিশিয়ে অসাধারণ এক শো দেখালেন। পরে শুনেছিলাম যে, দালাঙ হচ্ছেন একজন বিশেষ শামান যিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গোটা শো পরিচালনা করেন। একজন দালাঙের কাছে একশ'রও বেশি পুতুল থাকে। তিনি প্রত্যেকের সংলাপ বলেন ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে। এই রাতটির কথা আমি জীবনেও ভুলব না। এ রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে বাকী জীবন ধরে প্রভাবিত করেছে।

শোটির দু'টি পর্ব ছিল। প্রথম পর্বে আমরা দেখলাম রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী। দ্বিতীয় পর্বে দালাঙ নিয়ে এলেন সে সময়ের আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সনের পুতুলকে। অবিকল সেই দীর্ঘ খাড়া নাক ও ঝুলে পড়া চোয়াল। নিক্সনের পুতুলকে আঙ্কল স্যামের চির পরিচিত পোশাক ছাড়াও ডোরাকাটা টুপি এবং পেছনে লম্বাচেরা ঝুল বিশিষ্ট কোট পরানো হয়েছিল। নিক্সনের পুতুলের পেছনে মঞ্চে উঠে এলো আরেকটি পুতুল। এটির পরনে ছিল লম্বা ডোরাকাটা থ্রি পিস স্যুট। দ্বিতীয় পুতুলটির এক হাতে ছিল ডলার চিহ্ন আঁকা একটি বালতি। আরেক হাতে ছিল একটি আমেরিকান পতাকা। দ্বিতীয় পুতুলটি নিক্সনের মাথার উপরে পতাকাটা দোলাচ্ছিল। দেখে মনে হলো যেন চাকর তার মনিবকে হাওয়া খাওয়াচ্ছে।

পুতুল দু'টির পেছনে মধ্য ও দূর প্রাচ্যের একটি মানচিত্র উদয় হলো। এই দু'টি অঞ্চলের দেশগুলো আলাদা আলাদা ঝুলছিল। মজার ব্যাপার হলো এই যে, প্রতিটি দেশের ভৌগলিক অবস্থান ছিল একেবারে সঠিক। নিক্সন সাথে সাথে মানচিত্রের কাছে গিয়ে ভিয়েতনামকে হুক করে টেনে নামাল। এরপর একে মুখে পুরে কতক্ষণ চিবাল। পরে থুৎ করে এটিকে ফেলে দিল বালতিতে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "বাজে! জঘণ্য!! আমরা আর এটাকে চাই না।" এরপর এগুলো অন্যান্য দেশের দিকে।

নিক্সনের পরবর্তী শিকারগুলোকে দেখে আমি অবাক হলাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুর্বল ও অরক্ষিত দেশগুলোকে বেছে নিল না সে। বরঞ্চ তার পরবর্তী শিকার হলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো - ফিলিস্তিন, কুয়েত, সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া ও ইরান। এগুলোকে আত্মসাৎ করার পর নিক্সনের নজর পড়ল পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দিকে। প্রতিবারই নিক্সন একটি দেশকে মুখে পুরে কতক্ষণ চিবায়। এরপর চেঁচিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে দেশটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দ্বিতীয় পুতুলের হাতের বালতিতে।

দর্শকরা উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল বালতিতে ভিয়েতনামকে ছুঁড়ে ফেলার সাথে সাথে। এরপর বালতিতে যত দেশ পড়ে তত দর্শকদের উত্তেজনা বাড়ে। তারা কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। কখনও স্তম্ভিত হচ্ছিল। কখনও বা চাপা ক্রোধে দাঁতে দাঁত পিষছিল। কখনও আমিও ভয় পাচ্ছিলাম। দর্শকদের মাঝে একমাত্র আমিই শ্বেতাঙ্গ ও দীর্ঘদেহী। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, এই বুঝি দর্শকদের সমস্ত ক্রোধ আমার উপরে পাশবিকভাবে আছড়ে পড়বে। হঠাৎ করে নিক্সন একটি সংলাপ বলল। এর অনুবাদ রাসির মুখে শোনামাত্র আমার মাথার সবকটি চুল খাড়া হয়ে গেল।

নিক্সন হুক থেকে ইন্দোনেশিয়াকে টেনে নামিয়ে বলল, "এটি বিশ্বব্যাংককে দাও। দেখা যাক এভাবে আমরা দেশটি থেকে কিছু অর্থ রোজগার করতে পারি কি না।" বলেই দেশটিকে বালতিতে ফেলে দিতে গেল। ঠিক সেই সময় ছায়া থেকে আরেকটি পুতুল লাফিয়ে উঠল। এটি ইন্দোনেশীয়। এর পোশাক হচ্ছে বুটিকের শার্ট ও ঢোলা খাকি প্যান্ট। পুতুলটির ডান হাতে পরিষ্কারভাবে এটির নাম লেখা রয়েছে।

রাসি ফিস ফিস করে বলল, "বান্দুংয়ের একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা।"

ইন্দোনেশীয় পুতুলটি নিক্সন ও তার সহচরের মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ল। তারপর হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, "থামুন! ইন্দোনেশিয়া একটি স্বাধীন দেশ।"

অমনি দর্শকেরা সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। ঠিক তখনই নিক্সনের সহচর হাতের পতাকাটাকে বর্শার মতো ধরে ইন্দোনেশীয় পুতুলটির বুকে বসিয়ে দিলো। সাথে সাথে ইন্দোনেশীয় পুতুলটি মঞ্চের মেঝের উপরে পড়ে ছটফটিয়ে মারা গেল। দর্শকরা সাথে সাথে তীব্রভাবে ধিক্কার দিতে লাগল। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত রাগে কাঁপতে থাকল। তখন নিক্সন ও তার সহচর মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করল।

আমি আস্তে করে রাসিকে বললাম, "আমার মনে হয় এখান থেকে আমার চলে যাওয়া উচিত।"

সে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইল। তারপর চাপা সুরে বলল, "কোন সমস্যা হবে না। আপনার বিরুদ্ধে এদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই।" কিন্তু তারপরও আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না।

শো থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই মিলে গেলাম প্রথম দিনের সেই কফি হাউজে। আগের মতই কোণার একটি ফাঁকা টেবিলের চারপাশে সবাই গোল হয়ে বসলাম। শুরুতেই রাসি ও তার বন্ধুরা আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে, এবারের শোতে যে নিক্সন-বিশ্বব্যাংকের বিষয়টি দেখানো হবে তা তারা আগে থেকে জানতো না। এক তরুণ বলল, "পুতুল নাচিয়েদের মাথায় যে কখন কোন আইডিয়া গজায় তা আগে থেকে বোঝা ভারী মুশকিল।"

আমি জোরে জোরে স্বগতোক্তি করলাম যে, "এবারের শো বোধহয় আমাকে উপলক্ষ করেই দেখানো হয়েছে!" একজন হেসে উঠল বলল, "আপনার প্রচন্ড আত্ম-অহমিকা

রয়েছে।" আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে যোগ করল, "এটা অবশ্য আমেরিকানদের অতি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।"

আমার পাশের তরুণটি শান্ত স্বরে মন্তব্য করল, "ইন্দোনেশিয়ানরা রাজনীতি সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন। আমেরিকানরা কি এ ধরনের 'শো' দেখে না।?"

আমার উল্টো দিকে বসেছিল একটি সুন্দরী মেয়ে। সে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রী। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বিশ্বব্যাংকে চাকরি করেন?"

আমি হাল্কা সুরে জবাব দিলাম, "আমার বর্তমান মিশনটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

মেয়েটি তখন আবারও প্রশ্ন করল, "এসব সংস্থা তো একই রকম, তাই না কি?" সে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলতে লাগল, "আজকের 'শো'তে যা দেখানো হয়েছে তার থেকে কি বাস্তব পরিস্থিতি আলাদা। আপনার সরকার কি ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোতে একগুচ্ছ...।" যুৎসই শব্দ না পেয়ে মেয়েটির কথা বন্ধ হয়ে গেল।

তার পাশের মেয়েটি শব্দ জোগালো, 'আঙ্গুর।' প্রথম মেয়েটি বলল, "ঠিক। একগুচ্ছ আঙ্গুরের মত ভাবে না? আপনি যখন খুশি তখন যে কোন একটিকে বেছে নিতে পারেন। ইংল্যান্ডকে টিকিয়ে রাখুন। চীনকে খান। ইন্দোনেশিয়াকে ছুঁড়ে ফেলুন।"

দ্বিতীয় মেয়েটি যোগ করল, "অবশ্য তার আগে আপনারা আমাদের জ্বালানী সম্পদকে চুষে শেষ করে ফেলবেন।"

চারপাশের এই ক্ষুরধার আক্রমণ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। আমি শহরের এমন একটি অংশে এসে আমেরিকা বিরোধী 'শো' দেখার অহঙ্কার ব্যক্ত করতে পারতাম। অথচ এই 'শো'টি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছে। আমি তাদেরকে বলতে পারতাম যে, আমাদের দলের একমাত্র আমিই বাহাসা ভাষায় কথা বলতে শিখেছি। তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছি। পুরো শহর ঘুরে দেখার দুঃসাহস দেখিয়েছি। এই রাতের পুতুল নাচের 'শো'তে আমিই ছিলাম একমাত্র বিদেশী। কিন্তু আমি এসব কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। বরঞ্চ আমি আলোচনার মোড় ঘুরাতে চাইলাম। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "দালাঙ কেন তার শো'তে ভিয়েতনাম বাদে আর সব মুসলমান দেশকে বাছাই করলেন?"

ইংরেজীর সুন্দরী ছাত্রীটি হেসে উঠে বলল, "এটাই তো আসল পরিকল্পনা।"

একজন তরুণ চট করে বলে ফেলল, "আসলে ভিয়েতনাম তো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বার। ঠিক যেমন নেদারল্যান্ডস ছিল পশ্চিম ইউরোপে নাৎসী বাহিনীর আগ্রাসনের প্রথম পদক্ষেপ।"

মেয়েটি যোগ করল, "মুসলিম বিশ্বই হচ্ছে মূল লক্ষ্য।"

এবার আমি পাল্টা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রতিবাদের সুরে বললাম, "আপনারা

নিশ্চয় যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলাম বিরোধী দেশ বলে মনে করেন না।"

মেয়েটি ক্রুদ্ধ স্বরে পাল্টা জবাব দিলো, "তাই নাকি! কখন আপনার এই মনোভাব গড়ে তুলবেন!! আপনাদের উচিত আপনাদের ইতিহাসবিদদের লেখা বই পড়া। পঞ্চাশের দশকে এক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টয়েনবি লিখেছিলেন যে, পরবর্তী শতাব্দীর যুদ্ধ কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ঘটবে না। বরঞ্চ তা ঘটবে খ্রীস্টান ও মুসলমান শক্তিগুলোর মধ্যে।"

আমি হতবিহ্বল সুরে জিজ্ঞেস করলাম। "আর্নল্ড টয়েনবি এ কথা বলেছেন?"

মেয়েটি দৃপ্ত জবাব দিল, "হুঁ। তার লেখা *Civilization on Trial* (বিচারের কাঠগড়ায় সভ্যতা) *I World and the West* (বিশ্ব এবং পশ্চিমা জগৎ) বই দুইটি পড়ুন।"

আমার হতবুদ্ধি ভাব কিছুতেই কাটতে চাইছে না, "কিন্তু মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে এহেন শত্রুতা কেন বিরাজ করবে?"

সাথে সাথে গোটা টেবিলের চারপাশে এক কঠিন নীরবতা নেমে এলো। ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, আমি এমন বোকার মত প্রশ্ন করতে পারি।

এক নিরেট বোকাকে সহজভাবে জটিল বিষয় বোঝানোর ভঙ্গিতে মেয়েটি বলতে লাগল, "কেননা পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে এর নেতা যুক্তরাষ্ট্র, গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে। আমেরিকা এই লক্ষ্যকে অনেকটাই হাসিল করে ফেলেছে। এখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশী দিন টিকতে পারবে না। টয়েনবি অনাগত ভবিষ্যতকে ঠিকই দেখতে পেরেছেন। সোভিয়েতদের কোন ধর্ম নেই, কোন বিশ্বাস নেই, তাদের আদর্শের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। শ্রেয়তর শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন এবং বাস্তব ভিত্তিক আদর্শ হচ্ছে টিকে থাকার ও বেড়ে উঠার সেরা পন্থা, এটাই হচ্ছে ইতিহাসের রায়। মুসলমানদের এই দু'টি শক্তিই রয়েছে। পৃথিবীর আর যে কোন গোষ্ঠীর চেয়ে আমাদের এই দুটি শক্তি অনেক বেশি। এমনকি তা খ্রীস্টানদের চেয়েও শ্রেয়তর।" তাই আমরা অপেক্ষা করছি। আরও বেশি শক্তিমান হচ্ছি।"

একটি তরুণ যোগ করল, "আমরা সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করব। এরপর কেউটে সাপের মতো মরণ আঘাত হানব"

আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, "কী ভয়ঙ্কর ধারণা! এটাকে বদলানোর জন্য আমরা কী করতে পারি?"

মেয়েটি সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের অতিরিক্ত লোভকে সামলান। নিজেদের স্বার্থপরতাকে পাল্টান। আপনাদের বিশাল প্রাসাদ ও চোখ ধাঁধানো দোকানপাটের বাইরে যে দুনিয়া রয়েছে তার কথা ভাবুন। লোকজন না খেতে পেয়ে মরছে। অথচ আপনারা আপনাদের যানবাহনের জন্য জ্বালানী যোগাড় করার কথা

ভাবছেন। বাচ্চারা তৃষ্ণায় যন্ত্রণায় প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু আপনারা লেটেস্ট ফ্যাশনকে নকল করার নেশায় ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোকে নেশাগ্রস্তের মত ঘাঁটছেন। আমরা দারিদ্র্যের মহাসাগরে তলিয়ে যাচ্ছি। তারপরও আপনারা আমাদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন না। যারা আপনাদেরকে এমন কথা বলতে চায় তাদের মুখকে আপনারা বন্ধ করে দেন। আপনারা তাদেরকে কমিউনিস্ট বা চরমপন্থী বলে গালি দেন। দরিদ্রকে আরো দরিদ্র, বঞ্চিতকে স্রেফ ক্রীতদাস না বানিয়ে আপনাদের উচিত তাদের দুঃখ দুর্দশাকে উপলব্ধি করা। আপনাদের হাত সময় বেশী নেই। আপনারা যদি নিজেদেরকে না পাল্টান তাহলে নিজেদের পতনকেই ডেকে আনবেন।"

ক'দিন পরে বান্দুংয়ের যে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার পুতুলটি নিক্সনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিক্সনের সহচরের হাতে নিহত হয়েছিল, সেই রাজনৈতিক নেতা এক সড়ক দুর্ঘনায় প্রাণ হারালেন।

একটি মালবাহী ট্রাক তার গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চুরমার করে ফেলেছিল।

অধ্যায়-৮
ভিন্ন দৃষ্টিতে যীশু খ্রীস্ট

পুতুল নাচের ওই 'শো'টির স্মৃতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সেই সাথে ইংরেজীর ছাত্রী ওই সুন্দরী তরুণীর কথাগুলোও। বান্দুংয়ের ওই রাতটি আমাকে চিন্তা-চেতনার নতুন পর্যায়ে উপনীত করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় আমরা যা করছিলাম তার সম্ভাব্য ফলাফলকে আমি উপেক্ষা করতে পারছিলাম না। আবেগ আমার অনুভূতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। তারপরও বাস্তব ভিত্তিক যুক্তি, ঐতিহাসিক উদাহরণ ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আমার আবেগ-অনুভূতিগুলোর রাশকে টেনে ধরেছিল। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের তাগিদেই যে আমাদের সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত এই বোধটি আমাকে শান্ত করে তুলল। এইনার, চার্লি, আমি ও দলের অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারগুলোর প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কাজ করছি। আর এটাই হচ্ছে মানুষের অতি স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য।

রাসির বন্ধুদের সাথে আমার আলোচনা গোটা বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য করল। আমি বুঝতে পারলাম যে, সংকীর্ণ স্বার্থ কেন্দ্রিক বৈদেশিক নীতি আমাদের বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনকে মেটাতে পারবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তাকেও সংরক্ষণ করতে পারবে না। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন ও রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী কৌশলের মতই এই পররাষ্ট্রনীতি একেবারেই ক্ষণস্থায়ী।

আমার অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রায়ই আমাকে জাকার্তা যেতে হতো। সারাদিনের কাজ শেষে নিজ হোটেল কক্ষের নির্জনতায় বসে আমি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতাম। আর এগুলোর ফসলকে নিজের ডায়রিতে লিখে রাখতাম। সেই সাথে দিনের বেলায় সুযোগ পেলেই জাকার্তার সরু অলিগলিতে একা হেঁটে বেড়াতাম। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতাম। আর অতি সাধারণ মানুষদের সাথে বাহাসা ভাষায় মতামত বিনিময় করতাম।

আমি বৈদেশিক ঋণের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল নিয়ে বহু সময় ব্যয় করেছি। স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি। বৈদেশিক ঋণ কখন যথার্থ ও কখন লোভকেন্দ্রিক হয় তা নির্ধারণের পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছি। আমি নিজেকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছি। "আদৌ কি বৈদেশিক ঋণ বিশ্বমানবতার জন্য উপকারী?"

জবাবটি অবশ্যই ছিল নেতিবাকচ। তখন আমি বৈদেশিক ঋণ দেওয়ার ও নেওয়ার মানসিকতাকে পাল্টানোর কথা ভেবেছি। দরিদ্র ও বঞ্চিত বিশ্বকে সাহায্য করার জন্য যে উন্নত বিশ্ব, তথা যুক্তরাষ্ট্রের এগিয়ে আসা উচিত তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেই সাথে এটাও বুঝতে পেরেছি যে, আমরা কখনোই বিশ্ব মানবতার উপকার সাধনের মানসিকতাকে গড়ে তুলতে পারব না।

আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো একটি প্রধান প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল। যদি বৈদেশিক ঋণের মূল লক্ষ্য হয় বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়া তাহলে তা কি ভুল? আমি প্রায়ই চার্লির মতো লোকদের হিংসা করতাম। তারা আমাদের পদ্ধতিকে এমন অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন যে বাকি দুনিয়ার উপরে তা চাপিয়ে দিতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে বাকি বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমি সব সময়ই সন্দিহান ছিলাম। অথচ খোদ যুক্তরাষ্ট্রের লাখ লাখ নাগরিক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। এছাড়াও বাকি বিশ্ব আমাদের মতো প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে চায় কিনা সে বিষয়ও আমি সন্দেহমুক্ত ছিলাম না। সন্ত্রাস, হতাশা, মাদকাশক্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ ও অপরাধ সম্পর্কে আমাদের জাতীয় পরিসংখ্যান একটা কথাই প্রমাণ করে। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী জাতিগুলোর একটি হলেও আমরা বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী জাতিগুলোর মধ্যে একটি। তাহলে অন্যরা আমাদের অনুকরণ করুক এটা কেন আমরা চাইব?

খুব সম্ভবত ক্লডিন এ ব্যাপারে আমাকে আগেই সতর্ক করেছিল। সে আমাকে আসলে কী বলতে চেয়েছিল সে ব্যাপারে আমি আর নিশ্চিত ছিলাম না। যাই হোক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কগুলোকে বাদ দিয়েও বলা যায় যে, আমার নিষ্পাপ দিনগুলো যে শেষ হয়ে গেছে, তা আমার কাছে কষ্টদায়ক পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমি আমার ডায়রিতে লিখলামঃ

"যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিক কি নিষ্পাপ? যদিও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে যারা অবস্থান করছেন তারা সবচেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করেন, তবে আমাদের মতো লাখ লাখ লোক নিজ জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্বকে শোষণ করার উপরে নির্ভরশীল। আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের উপরে নির্ভরশীল সেগুলোর উৎস হচ্ছে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলো। কিন্তু প্রতিদানে এসব দেশ খুব কমই ফিরে পায়। বৈদেশিক ঋণগুলোর চক্র এমন দুশছেদ্য যে, ভবিষ্যতের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর এর শেকলে বাঁধা থাকবে। আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে তারা নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে তুলে দিতে বাধ্য হবে। এর পাশাপাশি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক খাতগুলোতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতে বাধ্য হবে। অথচ এই ঋণের অধিকাংশই ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্মাণের ব্যয় বাবদ ফিরে গেছে আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলে। কিন্তু এতে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর ঋণভার একটুও হ্রাস পায় না। বেশীর ভাগ আমেরিকানই এ সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু তাতে কি তাদেরকে নির্দোষ বলা যাবে? হয় তারা কিছু জানেন না, না হয় তাদেরকে

ইচ্ছা করেই ভুল বোঝানো হয়েছে। এ কথাটি পুরোপুরিভাবে সঠিক। কিন্তু তাই বলে কি তারা নিস্পাপ?"

আমি যে ভুল তথ্য প্রদানকারী দলের একজন সদস্যে পরিণত হয়েছি তা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।

বিশ্বব্যাপী ধর্মযুদ্ধের ধারণা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু আমি ব্যাপারটি সম্পর্কে যত চিন্তা ভাবনা করি ততই এর সম্ভাবনাকে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। আমার মনে হয় যে, খুব সম্ভবত এটা সরাসরি ভাবে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যেকার জেহাদে পরিণত হবে। বরঞ্চ এটা হবে উন্নত বিশ্ব এবং স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের মধ্যকার আর্থ-বাণিজ্যিক লড়াই। আর এই লড়াইয়ে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। উন্নত বিশ্ব গোটা পৃথিবীর সকল সম্পদকে উপভোগ করছে। অন্যদিকে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্ব এসব সম্পদের যোগান দিচ্ছে। এক কথায়, ঔপনিবেশিক যুগের অবসান ঘটলেও এর আর্থ-বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হচ্ছে। যে সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডার সীমিত বা একেবারেই নেই অথচ যারা প্রবল ক্ষমতাধর, তারা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দুর্বল দেশগুলোকে ইচ্ছে মতো শোষণ করছে। আর এই শোষণচক্রকে অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষমতাধর দেশগুলো যে কোন পন্থাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করছে না।

আমার কাছে আর্নল্ড টয়েনবির বইগুলো ছিল না। কিন্তু আমি যেটুকু ইতিহাস পড়েছি, তা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, দীর্ঘদিনের শোষণ শোষিতকে বিদ্রোহী করে তোলে। এটা বোঝার জন্য আমেরিকান বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করাটাই যথেষ্ট। বিশেষ করে বিদ্রোহের ঠিক আগে প্রকাশিত টম পেইনের লেখা *কমনসেন্স* বইটি পড়লে এর কারণগুলোকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। সেদিন বৃটেন এই বলে তার কর ও শুল্ক পদ্ধতির পক্ষে সাফাই গেয়েছিল যে, সামরিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে সে উপনিবেশগুলোকে আদিবাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করছে। কিন্তু আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশগুলোর কাছে বৃটেনের অতিরিক্ত কর-শুল্ক ভারকে শোষণ বলে মনে হয়েছিল। অনুরোধ-উপরোধে কাজ না হওয়ায় তারা বিদ্রোহের পথকে বেছে নিয়ে ছিল।

পেইন তার *Common Sense* শীর্ষক বইতে সাম্যের আদর্শ, নিরপেক্ষ বিচারের প্রতি বিশ্বাস, সকলের জন্য স্বাধীনতা ও সবার সাথে মৈত্রী স্থাপনের ধারণাগুলোকে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। রাসি ও তার বন্ধুরা বান্দুংয়ের কফি হাউজের দ্বিতীয় আড্ডায় একেই শ্রেয়তর শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন ও বাস্তব ভিত্তিক আদর্শ বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি ও এর প্রতিভূ শাসকশ্রেণীর মনোভাব ছিল ঠিক এর বিপরীত। এ যুগের মুসলমানদের ধারণাও প্রায় একই রকম। তারা শ্রেয়তর শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সেই সাথে তারা মনে করে যে, গোটা দুনিয়াকে শোষণ করার অধিকার উন্নত বিশ্বের নেই। আমেরিকান বিদ্রোহীদের মতই মুসলমানরা তাদের

অধিকার আদায়ের জন্য জেহাদ শুরু করার হুমকি দিচ্ছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির মতো আমরা জেহাদীদের চরমপন্থীরূপে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হচ্ছি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে বড় বিচিত্রভাবে।

আমি মাঝে মধ্যে একটি উদ্ভট ধারণায় আক্রান্ত হই। যদি যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্র দেশগুলো ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো সকল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্যয়িত অর্থকে গোটা বিশ্বের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, গৃহহীনতা ও বেকারত্ব বিমোচনের জন্য ব্যয় করত তাহলে কী ঘটত? তাহলে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী নতুন যুগের সন্ধান পেত। আজ যদি আমরা পুরো বিশ্বের দুঃখ-দুর্দশা মোচন ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে নির্মল করার জন্য কাজ শুরু করি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখী, সুন্দর ও নিরাপদ বিশ্বে বাস করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আজ আমরা গোটা বিশ্বকে আমাদের উপনিবেশ বানানোর জন্য কাজ করছি। স্বাধীন আমেরিকার স্বপ্নদ্রষ্টাগণ সবার জন্য স্বাধীনতা, সাম্য, নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার ও মৈত্রীর নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। আজ আমরা বাকি বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে চাইছি।

ইন্দোনেশিয়ায় আমার শেষ রাত কাটালাম হোটেল ইন্টারকনিন্টনেন্টালে। শেষ রাতের দিকে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখে আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হলো যে, আমার কক্ষে কেউ ঘোরাফেরা করছে। বিছানায় উঠে বসে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলাম। এরপর ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র, বুটিকের পর্দা, দেওয়ালে ঝোলানো ছায়া-পুতুলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। না, কেউই নেই। ঠিক তখনই স্বপ্নের স্মৃতিটি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল।

আমার সামনে এক খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যীশু খ্রীস্ট। ছোটবেলায় ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করার পর যে যীশুকে মনের সকল কথা খুলে বলতাম সেই যীশুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে ছোটবেলায় দেখা ফর্সা, সোনালী চুল ও নীল চোখের যীশু নন তিনি। বরঞ্চ আমার স্বপ্নে দেখা যীশুর গায়ে রং, চুল ও চোখ সবই কালো। তিনি নিচু হয়ে একটি ভারী জিনিষকে তার কাঁধে তুলে নিলেন। প্রথমে আমি ওটিকে ক্রস মনে করেছিলাম। পরে দেখলাম যে, ওটি একটি গাড়ির অ্যাক্সল। ওটির সাথে সংযুক্ত চাকা বসানোর রিমটি তার মাথার উপরে একটি ধাতব জ্যোতির্মণ্ডল তৈরি করেছে। তার সারা শরীর বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার চোখের দিতে তাকিয়ে, তিনি বললেন, "যদি এখন আমি পৃথিবীতে ফিরে আসতাম তাহলে তুমি আমাকে এভাবেই দেখতে পেতে। আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "পৃথিবীটা পাল্টে গেছে।"

চীনা ঘড়ির গুরু গম্ভীর মধুর ঘন্টার আওয়াজে আমার ঘোর ভাঙল। বাইরে তখন দিনের আলো একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে। ঘুমানোর চেষ্টা করে আর লাভ নেই তা বুঝতে পারলাম। পোশাক পাল্টে লিফটে চেপে নেমে এলাম নিচতলায়। এরপর বাগানে

গিয়ে সুইমিংপুলের পাশে বসলাম। পূর্ণিমার চাঁদ আলো ছড়াতে ছড়াতে নেমে যাচ্ছে পশ্চিম পাটে। পূর্ব পাট তখন অদৃশ্য সূর্যের প্রথম আলোয় সোনালী হতে শুরু করেছে। সকালের শীতল হাওয়া ভরে রয়েছে বাগানের অর্কিডের সুগন্ধে। লাউঞ্জ চেয়ারে বসে ভাবলাম, কেন আমার জীবন এমন হলো? কেন আমি ইন্দোনেশিয়ায় তিন মাস সময় কাটালাম। আমার জীবন যে পাল্টে গেছে তা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু কতটুকু পাল্টেছে তা তখনও বুঝতে পারি নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে প্যারিসে যাত্রাবিরতি করলাম। অর্লি বিমানবন্দরে হঠাৎ করে অ্যানের সাথে দেখা হলো। ছুটির মেয়াদ বাড়ালাম। চেষ্টা করলাম ভাঙা সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে। শুরু হলো বিশেষ মধুর ভাবে। শেষ হলো তিক্ত ঝগড়ার মধ্য দিয়ে। দু'জনেই বুঝতে পারলাম যে, এই সম্পর্ক আর কোনদিনও জোড়া লাগবে না। তাছাড়া অ্যানকে আমার পেশা সম্পর্কে কোন কথা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেবলই ক্লডিনের কথা মনে পড়তে লাগল। বুঝতে পারলাম যে, শুধুমাত্র তাকেই আমি সবকিছু খুলে বলতে পারব।

বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরে নেমে আমি ও অ্যান আলাদা ভাবে ব্যাক বে'তে যার যার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলাম।

আমাদের আলাদা পথ আর কোনদিনও এক হলো না।

অধ্যায়-৯
জীবনের সেরা সুযোগ

ইন্দোনেশিয়া সফরের মূল পরীক্ষাটি ঘটল মেইনে। সকালে আমি হাজির হলাম মেইনের প্রুডেনশিয়াল সেন্টার সদর দপ্তরে। লিফটে উঠার জন্য যখন লাইনে দাঁড়িয়েছি তখন জানতে পারলাম যে, মেইনের দুর্বোধ্য ও আশি বছর বয়সের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যাক হল অরিগনের পোর্টল্যাণ্ড অফিসের প্রেসিডেন্ট পদে এইনারকে পদোন্নতি দিয়েছেন। ফলে, আমাকে ব্রুনো জামবত্তির কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

চুলের রং ও যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুদ্ধির মারপ্যাচে পরাস্ত করার দুর্ধর্ষ ক্ষমতার কারণে ব্রুনোকে সবাই "রুপালী শেয়াল" নামে ডাকত। তার চেহারা ছিল ক্যারি গ্র্যান্টের মতই আকর্ষণীয়। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে অত্যন্ত নিপাট এই ভদ্রলোকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিএ ডিগ্রীধারী। তিনি ইকনোমেট্রিক্স খুব ভাল ভাবেই বুঝতেন। তাই তাকে মেইনের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়েছিল। এ কারণে তিনি প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলোর সিংহভাগের তত্ত্বাবধায়ন করতেন। মেইন কর্পোরেশনের বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট জেক ডবার যখন অবসর নেবেন তখন তার উত্তরসূরী রূপে ব্রুনো জামবত্তির নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। মেইনের আর সব কর্মচারীর মতই আমিও তাকে সমীহ ও ভয় করতাম।

লাঞ্চের ঠিক আগে ব্রুনো আমাকে ডেকে পাঠালেন। তার অফিসে বসে আমরা ইন্দোনেশিয়া সফর সম্পর্কে আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা করলাম। আলোচনার শেষ অংশে তিনি এমন একটি কথা বললেন যা আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিলো।

স্মিত হাসি হেসে টেবিলের উপরে রাখা কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমি হাওয়ার্ড পার্কারকে ছাঁটাই করব। কেন করব তার কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। তবে এটুকু জেনে রাখুন যে, তিনি বাস্তবের সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। তার লোড ফোরকাস্টে বলা হয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ৮% এর বেশী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটা কি বিশ্বাস করা সম্ভব? অথচ ইন্দোনেশিয়ার সম্ভাবনা এর দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।"

তার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার অর্থনৈতিক পূর্বাভাস যে আমাদের প্রত্যাশাকে পূরণ করবে সে কথা চার্লি ইলিংওয়ার্থ আমাকে জানিয়েছেন। আপনার রিপোর্টে নাকি ইন্দোনেশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ১৭-২০% হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। কথাটা কি সত্যি?"

আমি জবাব দিলাম, "জ্বী হ্যাঁ।"

তার মুখে স্মিত হাসি ফিরে এলো। উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি এইমাত্র একটি পদোন্নতি অর্জন করেছেন।"

আমার উচিত ছিল সহকর্মীদের সাথে এই সুখবরটি উদযাপন করা যে কোন দামী রেস্তোরায়। এমনকি আমি তা একা একাও করতে পারতাম। কিন্তু তখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল শুধুই ক্লডিন। আমি তাকে ইন্দোনেশিয়া সফরের অভিজ্ঞতা ও পদোন্নতির খবর জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। সে আমাকে বিদেশ থেকে ফোন করতে নিষেধ করেছিল। আমি তা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পদোন্নতির সুখবর পেয়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে তাকে ফোন করলাম। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে জানানো হলো যে, এই নম্বরটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এমনকি ক্লডিনের নামে কোন নতুন টেলিফোন নম্বরও বরাদ্দ করা হয়নি। তখন আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানে আরেকটি বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সদ্য বিবাহিত এক তরুণ দম্পতি অল্প ক'দিন আগে অ্যাপার্টমেন্টটিকে ভাড়া করেছে। তখন মাঝ দুপুর। তারপরও মাত্র গভীর ঘুম ভাঙার কারণে বিরক্ত দম্পতিটি নিরসভাবে জানালো যে, তারা ক্লডিনের কোন খবর জানে না। বাড়িটির মালিক যে রিয়েল এস্টেট এজেন্সির সেটার অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম যে, এর আগে একজন পুরুষ অ্যাপার্টমেন্টটিকে ভাড়া করেছিলেন। তবে তার অনুরোধে এজেন্সি তার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করবে না। মেইনের কর্মসংস্থান বিভাগে খোঁজখবর নেওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় বিস্ময়টি আমাকে রীতিমত ধাক্কা মারল। ক্লডিনের কোন রেকর্ড বিভাগটির কাছে নেই। তবে স্পেশাল কনসালট্যান্টদের রেকর্ড রয়েছে একান্ত গোপনীয় বিভাগে। কিন্তু সেই বিভাগের রেকর্ড দেখার ক্ষমতা রয়েছে শুধু মাত্র মেইনের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টদের।

বিকেল নাগাদ আমি রীতিমত ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়লাম। দৈহিক ক্লান্তির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জেট ল্যাগ। নিজের ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত বলে বোধ হলো। মনে হলো যে, আত্মা বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত পদোন্নতিটি স্রেফ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। বিছানায় শুয়ে রইলাম। হতাশা তখন আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ক্লডিন আমাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছে। এরপর কাজ শেষে ছুঁড়ে ফেলেছে। এই বোধোদয় ঘটার সাথে সাথে আমি আমার মনের আগুনকে নিভিয়ে ফেললাম। বিছানায় শুয়ে ফাঁকা দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ঘন্টার পর ঘন্টা।

অবশেষে উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি ফিরে পেলাম। দাঁড়িয়ে এক ক্যান হিমশীতল বিয়ার পান করলাম। পান শেষে ক্যানটিকে ছুঁড়ে মারলাম দেওয়ালে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। মনে হলো যেন ক্লডিন এদিকেই হেঁটে আসছে। তাড়াতাড়ি অ্যাপার্টমেন্টের

দরজার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম। পরক্ষণেই মনে সন্দেহ জাগলো, আবার জানালার কাছে ফিরে এসে বাইরে তাকালাম। নারীটি আরো কাছে চলে এসেছে। সে ক্লডিনের মতই আকর্ষণীয়া ও সুন্দরী। তার হাঁটার ধরন প্রায় ক্লডিনের মতই। কিন্তু সে ক্লডিন নয়। আমার মন থেকে ক্ষোভ মুছে গেল। জেগে উঠল ভয়।

কল্পনার চোখে দেখলাম, টিপটিপে বৃষ্টিতে ভেজা পিচ্ছিল পথ দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে ক্লডিন। আর তার পড়ন্ত সুন্দর দেহকে আঘাত হানছে এক ঝাঁক বুলেট। ক্লডিনের নিস্প্রাণ দেহটি আছড়ে পড়ল মাটিতে। ক্ষতগুলো থেকে চুঁইয়ে বেরুনো রক্ত মুছে যাচ্ছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মিহি ধারায়। জোর করে ঝেড়ে ফেললাম কল্পনাটিকে। এক জোড়া ভ্যালিয়াম ট্যাবলেট খেয়ে তলিয়ে গেলাম নীরব নিদ্রাতে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের কর্কশ শব্দে। রিসিভার কানে লাগাতেই ভেসে এলো মেইনের কর্ম সংস্থান বিভাগের প্রধান পল মর্মিনোর গলা "আপনার বিশ্রাম নেওয়ার কারণটি বুঝতে পেরেছি। তবু আজ বিকেলে অফিসে আসতেই হবে আপনাকে। সত্যি সুখবর রয়েছে আপনার জন্য। এটি আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে।" আমি জবাব দিলাম, "আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হচ্ছি।"

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে গিয়ে হাজির হলাম পল মর্মিনোর বিভাগে। তার কাছে শুনতে পেলাম যে, ব্রুনো তার ওয়াদার চেয়ে বেশিই দিয়েছেন আমাকে। হাওয়ার্ড পার্কারের স্থানটি আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে দেওয়া হয়েছে প্রধান অর্থনীতিবিদের পদ। বেতন-ভাতাও বেড়েছে তিনগুণ। মনে মনে বেশ খুশিই হলাম।

লাঞ্চের পর অফিস থেকে ছুটি নিলাম। চার্লস নদীর পাড়ে গিয়ে বসলাম এক কার্টন বিয়ার নিয়ে। একের পর এক ক্যান খালি হলো নিমিষেই। এরপর ঘাসের উপরে শুয়ে পালতোলা নৌকাগুলোর মসৃণ মরাল গতি উপভোগ করতে করতে দেহ মনের সকল ক্লান্তি ও হতাশাকে ঝেড়ে ফেললাম। আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি যে, ক্লডিনের পর্বের ইতি ঘটেছে আমার জীবনে। আর কোনদিনও আমি তার দেখা পাব না। পুরো ব্যাপারটি ঘটেছিল এক কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে। এই গোপনীয়তার পর্দা কোনদিনও উঠবে না। পল মর্মিনো ঠিকই উপদেশ দিয়েছেন আমাকে। যে সময় অতীত হয়ে যায় তাকে ফিরিয়ে আনা কখনই সম্ভব নয়। আমার মন ফিরে এলো বর্তমানের কঠিন বাস্তবে।

পরের কয়েকটি সপ্তাহ কেটে গেল ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসকে চূড়ান্ত ভাবে তৈরি করতে। বিশেষ করে হাওয়ার্ড পার্কারের বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বাভাসকে বদলানোর জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হলো। অবশেষে আমি মেইন কর্তৃপক্ষের মনের মতো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারলাম। জাভা দ্বীপে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পদ্ধতি স্থাপনের পরের ১২ বছরে ইন্দোনেশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার হবে ১৯%। এরপরের ৮ বছরে দেশটির উন্নয়ন হার হবে প্রতি বছরে ১৭%। শেষ ৫ বছরে দেশটির বার্ষিক উন্নয়ন হার হবে ১৫%।

ওয়াশিংটন ডিসিতে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর সাথে মেইনের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত

হলো তাতে আমি আমার পূর্বাভাস উপস্থাপন করলাম। দাতা সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞগণ আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নির্দয়ভাবে জেরা করলেন। কিন্তু শুরু থেকেই আমি ছিলাম নিজ মতে অনড়, অটল ও অবিচল। কিছুতেই আমি পরাজয় স্বীকার করতে রাজি ছিলাম না। সেই সাথে ক্লডিনের স্মৃতিও আমাকে যথেষ্ট ভাবে সাহায্য করেছিল। পুরো এক বিকাল ধরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সুনাম প্রত্যাশী এক তরুণ অর্থনীতিবিদ জেরা করল নির্মমভাবে। তখন বার বার ক্লডিনের বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল।

প্রায় এক বছর আগে তার বেকন স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্টে বসে সে বলেছিল, "২০-২৫ বছর পর কী ঘটবে তা বোঝার ক্ষমতা কারও নেই। তোমার ধারণা আর সবার মতই ভাল। মনে রেখ, নিজ মতে দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রাখাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।"

ততক্ষণে আমি নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ রূপে ভাবতে শুরু করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এদের সিংহভাগ বয়সে প্রবীণ হলেও স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তাই এরা সঠিকভাবে আমার কাজকে যাচাই করতে পারবেন না। আমি প্রায় এক বছর আমাজানের গহীন অরণ্যে বাস করেছি। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে বাস করেছি তিন মাস। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ইকনোমেট্রিক্সের কোর্সগুলোতে সাফল্যের সাথে পাশ করেছি। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, কেনেডি-জনসন প্রশাসনের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ফোর্ড মটর কোম্পানীর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিসংখ্যান ভিত্তিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদানকারী যে অর্থনীতিবিদদের উত্থান ঘটেছে আমি তাদেরই একজন। ম্যাকনামারা তার আকাশছোঁয়া খ্যাতিকে গড়ে তুলেছিলেন পরিসংখ্যান, সম্ভাবনা তত্ত্ব, গাণিতিক সমীকরণ ও আত্ম-অহমিকাকে পুঁজি করে।

আমি ম্যাকনামারা ও ব্রুনোকে হুবহু ভাবে অনুকরণ করেছিলাম তখন। ম্যাকনামারার বাচনভঙ্গি ও ব্রুনোর রাজসিক চলাফেরা আমাকে অন্যদের চাইতে পুরোপুরি পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছিল। সেদিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান ছিল রীতিমত সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা আমি পুষিয়ে নিয়েছিলাম নিজের দুঃসাহস দিয়ে।

পরিশেষে আমার দুঃসাহসই বিজয় অর্জন করল। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞগণ আমার পূর্বাভাসকে হুবহু অনুমোদন করলেন।

পরের কয়েক মাস কেটে গেল ঝড়ের গতিতে। আমি তেহরান, কারাকাস, গুয়াতেমালা সিটি, লণ্ডন, ভিয়েনা ও ওয়াশিংটন ডিসিতে একগাদা বৈঠকে অংশগ্রহণ করলাম। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হলাম। এদের মধ্যে ছিলেন ইরানের শাহ, অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ও খোদ রবার্ট ম্যাকনামারা। তখন আমার ভাগ্যে কোন সুন্দরী নারীর সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য জোটে নি। আমার নতুন পদবী ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর সাথে বৈঠকে অর্জিত সাফল্য আমাকে কত উঁচুতে নিয়ে গেছে তা

ভাবতেও অবাক লাগত।

শুরুতে এসব সাফল্য আমাকে অহঙ্কারী করে তুলেছিল। আমি নিজেকে এমন এক যাদুকর রূপে ভাবতে শুরু করেছিলাম যার যাদুকাঠির ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিক আলো ছড়িয়ে পড়ে, শিল্প গজিয়ে উঠে, রাতারাতি তৈরি হয় সড়ক, সেতু, রেলপথ, সমুদ্র ও বিমানবন্দর, এরপর ধীরে ধীরে আমি কঠিন বাস্তবের জগতে নেমে এলাম। আমি নিজেও যাদের জন্য কাজ করতাম তাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাথা ঘামাতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদ কাউকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বেকারত্ব, অপুষ্টি ও আবাসনহীনতার স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে না। যারা বাস্তব পরিসংখ্যানে শুভঙ্করের ফাঁকি খুঁজে দেয়, তারা গোটা বিশ্বের ভবিষ্যতকে ঝরঝরে করে তোলে। পুরো বিশ্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে আমার পরিচিতি যত বাড়ল তত আমি এদের মন মানসিকতাকে ভালভাবে বুঝতে পারলাম। ততই আমি এদের সামর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হতে লাগলাম। আলোচনার টেবিলের চারধারে জমায়েত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে একেক সময় আমি নিজের রাগকে সামলাতে পারতাম না। তারপরও অতি কষ্টে ভদ্রতার মুখোশকে বজায় রাখতে হতো।

ধীরে ধীরে আমার মানসিকতাও পাল্টাতে লাগল। আমি বুঝতে শুরু করলাম যে এদের বেশীর ভাগই নিজেদের কাজকে সঠিক বলে মনে করেন। চার্লির মতই তারা কমিউনিজম ও সন্ত্রাসকে অকল্যাণকর বলে মনে করেন। তাদের পূর্বসূরীও তাদের কাজের কারণে গোটা বিশ্বে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠছে তাকে তারা মোটেও মেনে নিতে রাজি নন। তারা বিশ্বাস করেন যে, বিধাতা নিজ দেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের কারণেই তারা গোটা দুনিয়াকে পুঁজিবাদের পথে পরিচালিত করতে চাইছেন। তারা "যোগ্যতমের জয়" নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। এর সুবাদে তারা শৈশব থেকেই নানারকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে উচ্চতম শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছেন। এরপর তারা দেশী-আন্তর্জাতিক, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতম পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। তাই তারা এসব সুযোগ-সুবিধা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুনিশ্চিত করার জন্য মানসিকভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন।

আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, এদেরকে কোন শ্রেণীতে ফেলব হয় – এরা চক্রান্তকারী, না হয় এরা বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী। কখনও কখনও এদেরকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের আগেকার দক্ষিণের খামারগুলোর মালিকের মত মনে হতো। মনে হতো যে, কোন গুপ্ত স্থানে বসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে হাসিলের জন্য এরা ষড়যন্ত্র করছেন না, বরঞ্চ সাধারণ লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্যই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। গৃহযুদ্ধের আগে দক্ষিণের খামারগুলোর মালিকেরা কর্মচারী, চাকর ও ক্রীতদাসের জগতে বড় হয়েছিলেন। তারা মনে করতেন যে, তাদের জন্মই হয়েছে শুধুমাত্র অধীনস্থদের শাসন ও শোষণ করার জন্য। ক্রীতদাস প্রথার বীভৎসতা যে এদের কাউকে মানসিকভাবে পীড়া দেয় নি তা কিন্তু নয়। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয়

প্রেসিডেন্ট টমাস জেফার্সনের মত ব্যক্তিরা একে নিত্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। তাদের মতে, ক্রীতদাস প্রথাকে উচ্ছেদ করা হলে আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমার মতে, আধুনিক কর্পোরেটোক্রেসির মালিকদের মনোভাবও ঠিক একই ধরনের।

আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, যুদ্ধ ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ করা থেকে আসলে কারা লাভবান হয়? কাদের লাভের জন্য উন্নয়নের নামে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে? অপর্যাপ্ত খাদ্য, দূষিত পানি ও নিরাময়যোগ্য রোগগুলোর কারণে প্রতিদিন যে সব মানুষের মৃত্যু ঘটছে তা থেকে কারা লাভবান হচ্ছে তা আমি বিচার করতে শুরু করলাম। দেখতে পেলাম যে, দীর্ঘমেয়াদীভাবে এসব কাজ থেকে কেউই লাভবান হচ্ছে না। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী ভাবে গোটা বিশ্বের আর্থ-বাণিজ্যিক পদ্ধতির শীর্ষে অবস্থানকারীরা এ থেকে বৈষয়িকভাবে লাভবান হচ্ছে। তবে একে সুনিশ্চিত করার পন্থাগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উৎস রূপে কাজ করছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, এই পরিস্থিতি কেন বিরাজ করছে? কেন তা দীর্ঘদিন ধরে টিকে রয়েছে? "শক্তি সকল ক্ষমতার উৎস" এই প্রাচীন প্রবাদটির মাঝেই কি এসব প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে রয়েছে? ক্ষমতা কি শুধুমাত্র পদ্ধতিকেই চিরস্থায়ী করে?

এতে প্রকৃত সমস্যাগুলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে সহজভাবে দেখা হয় মাত্র। শুধুমাত্র ক্ষমতার কারণেই এই পদ্ধতি এতোটা শক্তিশালী হয়নি। এমনকি "শক্তি সকল ক্ষমতার উৎস" এই প্রবাদ দিয়েও পুরো প্রক্রিয়াটিকে ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয়। এগুলোর বাইরেও আরও অনেক শক্তি এ জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে একজন উত্তর ভারতীয় অধ্যাপক বাণিজ্যিক অর্থনীতি পড়াতেন। তিনি সম্পদের সীমাবদ্ধতা, মানুষের ক্রমাগত উন্নয়ন অর্জনের মনোভাব ও ক্রীতদাস প্রথার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একদিন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, প্রতিটি সফল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে গুটি কয়েক বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা। এদের কঠোরতম নিয়ন্ত্রণে গোটা পদ্ধতিটি পরিচালিত হয়। পদ্ধতিটির সবচেয়ে নিচের স্তরে অবস্থান করে অসংখ্য শ্রমিক যারা বস্তুতপক্ষে ক্রীতদাস বৈ আর কিছুই নয়। উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের মাঝে রয়েছে নানা স্তরের নির্বাহীগণ। এরা পর্যায় ভেদে সমতা ও সুবিধা ভোগ করেন। বিনিময়ে তাদেরকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে তামিল করতে হয়।

আমি বুঝতে পারলাম যে, আধুনিক কর্পোরেটোক্রেসির প্রকৃত ক্ষমতাবানরা এই পদ্ধতির শীর্ষে থেকে গোটা দুনিয়াকে শাসন করাকে নিজেদের বিধিপ্রদত্ত অধিকার বলে মনে করেন। তাদের এই মানসিকতার কারণেই আমরা বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছি।

বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র এই পথের প্রথম পথিক নয়। বরঞ্চ ব্যবিলন, মিশর, চীন, দক্ষিণ এশিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম, খ্রীস্টান ক্রুসেডারগণ, তুরস্ক ও ইউরোপের উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো পর্যায়ক্রমে এই পথ দিয়ে হেঁটেছে। ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে গোটা বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্য গঠনের এই উগ্র মানসিকতা প্রতিটি যুগেই যুদ্ধ, গণহত্যা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও জাতিগোষ্ঠীর বিলুপ্তির প্রধানতম উৎসরূপে কাজ করেছে। এমনকি এসব পাশবিকতা প্রতিটি সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্রের বাসিন্দাদের বিবেকবোধ ও জীবন যাত্রার উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই প্রতিটি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগেই এগুলোর মূল নাগরিকগণ নৈতিক অবক্ষয় ও বিলাসিতায় আক্রান্ত হয়েছে। এভাবেই প্রতিটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। আর এর স্থান দখল করেছে নতুন আরেকটি সাম্রাজ্য।

আমি এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালেও এতে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা করাকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি। আমি তখন থেকেই নিজেকে আর অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে মনে করতাম না। নিজেকে দেখতাম মেইনের প্রধান অর্থনীতিবিদ রূপে। এই চিন্তা আমাকে খুশি করত। আমাকে বেতন দিতো মেইনের মতো একটি বেসরকারী বাণিজ্যিক সংস্থা। এনএসএ বা কোন সরকারী সংস্থার সাথে আমার কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। তাই নিজের কাজের বৈধতা সম্পর্কে আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম।

একদিন বিকালে ব্রুনো আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমি চেয়ারে বসা মাত্র তিনি এর পেছনে দাঁড়িয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। এরপর মধুর স্বরে বললেন, "আপনি খুবই ভালভাবে কাজ করছেন। এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাই আমরা আপনাকে এমন একটা সুযোগ দেব যা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারাও এখন পর্যন্ত পাননি। আর এটি হবে আপনার জীবনের সেরা সুযোগ।"

আমি মনে মনে খুশি হলাম - খুবই খুশি।

অধ্যায়-১০
পানামার প্রেসিডেন্ট ও নায়ক

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক রাতে আমি পানামার তোকুমেন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমান থেকে নামলাম। বাইরে তখন গ্রীষ্মকালের প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেসব দিনে আমরা ক'জন নির্বাহী কর্মকর্তা মিলে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করতাম। যেহেতু আমি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারতাম সেহেতু চালকের পাশের আসনে আমাকেই বসতে হলো। গাড়ির সামনের কাঁচ দিয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি। বাইরে তখন ঝড়ো বর্ষণের প্রবল মাতামাতি। হঠাৎ করে গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ল একটি বিশাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের উপরে। এতে জ্বলন্ত চোখ ও বিশাল কপাল বিশিষ্ট এক সুদর্শন ব্যক্তির ছবি আঁকা রয়েছে। তার চওড়া টুপির একটি অংশকে উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু করে রাখা হয়েছে। আমি একে পানামার সে সময়ের নায়ক ওমর তোরিজো বলে চিনতে পারলাম।

আমি বরাবরের মতই এই ভ্রমণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার লক্ষ্যে বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীর রেফারেন্স সেকশনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। আমি পানামার জনগণের মাঝে তোরিজোর জনপ্রিয়তার মূল কারণগুলো বুঝতে পেরেছি। তিনি পানামার স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে চান। সেই সাথে তিনি পানামা যোজক প্রণালীর উপরে দেশটির নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এছাড়াও তিনি দেশটির অতীত কলঙ্কগুলোকে মুছে ফেলতে চান।

সুয়েজ প্রণালীর খনন কার্যের পরিচালক ফরাসী প্রকৌশলী ফার্দিনান্দ দ্য লেসপ যখন পানামা প্রণালী খননের দায়িত্ব পেলেন তখন পানামা ছিল কলম্বিয়ার একটি প্রদেশ। সেই সময় মধ্য আমেরিকার সরু যোজকের মাঝ দিয়ে পূর্ব দিকের আটলান্টিক মহাসাগর ও পশ্চিম দিকের প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোজন করার লক্ষ্যে একটি প্রণালী খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রণালী খননের কাজ শুরু হলো। ফ্রান্স এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা শুরু থেকেই বাধাগ্রস্ত হলো একের পর এক বিপর্যয়ের কারণে। অবশেষে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের আর্থিক দেউলিয়াত্বের কারণে প্রকল্পটির কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে থিওডোর রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের ২৬তম প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পর পরই তিনি পানামা যোজক প্রণালী খননের কাজ নতুন ভাবে শুরু করতে চাইলেন। তিনি মধ্য আমেরিকার সরু যোজকটিকে উত্তর আমেরিকার একটি কনসোর্টিয়ামের কাছে হস্তান্তরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য কলম্বিয়ার উপর কূটনৈতিক চাপ দিলেন। কিন্তু কলম্বিয়া তা প্রত্যাখ্যান করল।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পানামা যোজকে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ন্যাশভিলকে পাঠালেন। আমেরিকান সৈন্যরা পানামার মাটিতে নেমে এটিকে দখল করল। সেই সাথে তাদেরকে বাধা দানকারী স্থানীয় আধা সামরিক বাহিনীর জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে মারল। এরপর বাকি প্রতিরোধ তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। একটি পুতুল সরকার বসিয়ে প্রথম প্রণালী চুক্তি স্বাক্ষর করা হলো। ভবিষ্যৎ প্রণালীর দু'পাশের জমিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হলো। আমেরিকার আগ্রাসনকে আইনগত বৈধতা দেওয়া হলো। সেই সাথে নব্য স্বাধীন (!) পানামার উপরে ওয়াশিংটনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো।

মজার ব্যাপার এই যে, প্রথম প্রণালী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সেই সময়ের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হে ও ফরাসী প্রকৌশলী ফিলিপ বোয়াঁও ভারিলা। ভারিলা ছিলেন লেসপ দলের একজন সদস্য। কিন্তু ওই চুক্তিতে পানামার একজন নাগরিকেরও স্বাক্ষর নেই। এক কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পানামা কলম্বিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো। সেই সাথে পানামা এমন একটি চুক্তিকে মানতে বাধ্য হলো যাতে স্বাক্ষর করেছেন একজন আমেরিকান মন্ত্রী ও একজন ফরাসী প্রকৌশলী। অর্থাৎ পানামার যাত্রা শুরু হলো একটি নামে স্বাধীন, কাজে উপনিবেশ রূপে।

টানা ৬৫ বছর পানামাকে শাসন করেছে মার্কিন মদদপুষ্ট ধনী পরিবারগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এসব ডানপন্থী স্বৈরশাসক আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিন্দু মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নি। ল্যাটিন আমেরিকার আর সব স্বৈশাসকদের মতো পানামার শাসকগণও যে কোন জনপ্রিয় গণ আন্দোলনকে কমিউনিস্ট সন্ত্রাসরূপে আখ্যায়িত করে এগুলোকে নির্মমভাবে দমন করেছেন। সেই সাথে তারা নিজ মাটি থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে দক্ষিণ আমেরিকায় কমিউনিস্ট বিরোধী কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তারা পানামাকে রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ও ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর মতো আমেরিকান বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর উপনিবেশে পরিণত করেছেন। এর বিনিময়ে পানামার স্বৈরশাসকগণ ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছেন। অন্যদিকে পানামার জনগণ মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিকে পরিণত হবার পরেও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এমনকি দেশটির শাসকগণও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কথাও কোনদিন ভাবেন নি।

এ সময় আমেরিকান সামরিক বাহিনী কমপক্ষে ৬ বার পানামায় অভিযান চালিয়েছে

দেশটির স্বৈরশাসকদের শাসনকে অব্যাহত রাখতে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পানামার ইতিহাসের মোড় আচমকাই ঘুরে গেল। এক সামরিক অভ্যুত্থান পানামার সর্বশেষ স্বৈরশাসক আর্নুলফো আরিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন পানামার সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওমর তোরিজো। অবশ্য এই অভ্যুত্থানে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না।

তোরিজো পানামার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর কাছে অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় ছিলেন। তার জন্ম পানামার মফস্বল শহর সান্তিয়াগোতে। তার মা-বাবা ছিলেন ওই শহরের শিক্ষক। তার শৈশব ও কৈশোর কাল ওই শহরে কেটেছে। সিনিয়র হাই স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি ন্যাশনাল গার্ডের একজন ক্যাডেট অফিসার রূপে যোগ দেন। এটি পানামার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় ইউনিট। গত শতকের ষাটের দশকে এই ইউনিটটি নানারকম সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য দেশটির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিশেষ করে তোরিজো সমাজের সবচেয়ে হতভাগ্য অংশের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনতেন দ্বিধাহীনভাবে। তিনি বস্তিগুলোর নোংরা গলি দিয়ে হেঁটেছেন। এগুলোর বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেছেন। বেকারদের জন্য যতটা সম্ভব কাজের ব্যবস্থা করেছেন। রোগ-শোকে জর্জরিত পরিবারগুলোকে নিজের শেষ কড়ি নিঃশেষ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। পানামার কোন বেসামরিক রাজনীতিবিদ এসব কাজ করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

দরিদ্রদের প্রতি তার সহমর্মিতার খ্যাতি পানামার সীমান্ত ছাড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিলির স্বৈরশাসক জেনারেল অগাস্তো পিনোশে উগার্তের পাশবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে দেশটির বামপন্থী নেতা-কর্মীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন পানামাতে। অন্যদিকে ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা থেকে দেশটির ডানপন্থী নেতা-কর্মীরাও পালিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন ওই পানামাতেই। এভাবেই তোরিজোর পানামা মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল। অনেকেই তোরিজোকে শান্তির দূত মনে করতেন। এই ধারণা গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় তাকে ঈর্ষণীয়ভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সেই সাথে তিনি অসংখ্য আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার এই ভূমিকা হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, কিউবা, কলম্বিয়া, পেরু, আর্জেন্টিনা, চিলি ও প্যারাগুয়েকে বহু রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেছে। ২০ লাখ নাগরিকের ক্ষুদে দেশ পানামা গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় সমাজ সংস্কারের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সেই সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তির জন্য গোপনে সক্রিয় সংস্থা ও দেশগুলোর জন্যও পানামা ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মের গাদ্দাফী ছিলেন এ কাজে অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্রনায়ক।

পানামায় আমার প্রথম রাতে যখন ট্রাফিকের লাল বাতি জ্বলার কারণে আমার ট্যাক্সিটি থামল তখন ওমর তোরিজোকে প্রথমবারের মত দেখার সুযোগ পেলাম আমি। বিলবোর্ড থেকে তিনি আমর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তার পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্য, স্পর্ধিত ব্যক্তিত্ব

ও ব্যক্তিগত ভাবে আকর্ষণের ক্ষমতা যে কারোর নজর কাড়বে। বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীর বইগুলো পড়ার ফলে আমি জানতে পেরেছি যে, তোরিজো নিজ মতে ও বিশ্বাসে অনড়, অবিচল ও অটল। এই প্রথম পানামার ইতিহাসে দেশটি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন পরাশক্তির তাবেদারী করছে না। তোরিজোকে নিজেদের পথে টেনে আনতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও কিউবা কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু তিনি কোন প্রলোভনের ফাঁদেই পা দেননি। তিনি সামাজিক সংস্কার ও দারিদ্র্য বিমোচনের নীতিগুলোতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে নিজ দেশকে মুক্ত করার জন্য কখনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে হাত মেলান নি। তিনি কখনই পানামাতে কমিউনিস্ট কর্মসূচীগুলোকে চালু করেন নি। আর এখানেই ওমর তোরিজো, ফিদেল কাস্ত্রো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে পানামা সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে একটি অখ্যাত সাময়িকীতে প্রকাশিত এক অজ্ঞাত লেখকের একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম। এতে ওমর তোরিজোকে পুরো আমেরিকা অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জকারী প্রথম প্রকৃত রাষ্ট্রনায়করূপে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি যদি সফল হন তবে গোটা আমেরিকার ইতিহাস পাল্টে যাবে। লেখক আমেরিকান অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপনের ভিত্তি হিসাবে ১৮৪০-এর দশকে প্রচারিত "বিধি নির্দিষ্ট নিয়তি" তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তত্ত্বটি যুক্তরাষ্ট্রের দশম প্রেসিডেন্ট জন টাইলার প্রচার করেছিলেন। এই তত্ত্বের মতে, বিধাতার নির্দেশেই যুক্তরষ্ট্র পুরো আমেরিকান অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য কাজ করছে। এই নির্দেশ তামিল করতে গিয়েই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অরণ্যাঞ্চল ও বন্য প্রাণীদের ধ্বংস করছে। এই নির্দেশের কারণেই জলাভূমিগুলোকে ভরাট করে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে, নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এই নির্দেশের ফলেই এমন এক অর্থনীতি গড়ে উঠছে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের শ্রমের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বিধাতা স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রকে পরাশক্তি হওয়ার সামর্থ ও ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই নিবন্ধ পড়ার পর বিশ্ব সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে দেশটির পঞ্চম প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো "মনরো মতবাদ" প্রচার করেছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে দশম প্রেসিডেন্ট জন টাইলার "বিধি নির্দিষ্ট নিয়তি" তত্ত্ব প্রচার করলেন। ১৮৫০-এর দশকে ত্রয়োদশতম প্রেসিডেন্ট মিসিয়ার্ড ফিলিমোর ও ১৮৬০-এর দশকে ১৭তম প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসন এই দুটি তত্ত্বকে একীভূত করলেন। ১৮৭০-এর দশকে অষ্টাদশতম প্রেসিডেন্ট ইউলিসেস পিটার গ্র্যান্টের শাসনামলে শুরু হলো এসব তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কাজ। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েই ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট ডমিনিকান রিপাবলিকে, ভেনেজুয়েলায় ও পানামাতে সামরিক অভিযান চালালেন মনরো মতবাদকে ব্যবহার করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ২৭তম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টাফট, ২৮তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ও ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ভেলানো রুজভেল্ট ১৯০৯-১৯৪৫ সময়ে

গোটা আমেরিকান অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কমিউনিস্ট ভীতিকে কাজে লাগিয়ে মনরো মতবাদকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র পুরো বিশ্বকে নিজ সাম্রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে ওয়াশিংটনকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি বিশ্বের আর কোন দেশের আছে কিনা সন্দেহ।

যুক্তরাষ্ট্রের পথে সে সময় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি। আমি জানতাম যে, এক্ষেত্রে তিনিই প্রথম নন। কাস্ত্রো ও আলেন্দে এরও আগে এ পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তোরিজো তার পূর্বসূরীদের মতো কমিউনিজমের অনুসারী ছিলেন না। এমনকি তিনি নিজের কর্মকাণ্ডকে বিপ্লবরূপে আখ্যায়িত করেন নি কখনও। তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন, "পানামা একটি স্বাধীন দেশ। এর ভূখণ্ড, নাগরিক, প্রাকৃতিক সম্পদ, যোজক প্রণালী ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে রাষ্ট্রটির সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। এর এই অধিকার আইনগত দিক থেকে পুরোপুরি ভাবে বৈধ। আর এই বৈধতা যুক্তরাষ্ট্রের বিধি প্রদত্ত নিয়ন্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

পানামা যোজক প্রণালী পানামা দেশটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে। প্রণালীর দু'পাশের ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই ভূখণ্ডে রয়েছে স্কুল অব আমেরিকা ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডের ট্রপিক্যাল ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং সেন্টার। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার স্বৈরশাসকদের সন্তানদের ও এদের ঘনিষ্ঠতম সামরিক কর্মকর্তাদের এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই দু'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উত্তর আমেরিকার বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ও সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ স্থাপনা। সেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের গোয়েন্দা তদন্ত জেরা পদ্ধতি, গুপ্ত অভিযান চালানোর কৌশল ও প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান কৌশল শেখানো হয়। স্নায়ুযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে এসব কৌশলকে নির্মমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই সাথে এসব কৌশল ল্যাটিন আমেরিকায় দেশী-বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থকেও রক্ষা করেছে। এছাড়াও এসব কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের মার্কিন সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেতেন।

ল্যাটিন আমেরিকার স্বৈরশাসকগণ ও তাদের ঘনিষ্ঠতমরা বাদে সাধারণ জনগণ এ দু'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ঘৃণা করত। কেননা, এ দু'টি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ডানপন্থী ঘাতক দলগুলোকে তৈরি করেছিল। এসব দল স্বৈরশাসকদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নির্মূল করার মাধ্যমে বিভিন্ন ল্যাটিন আমেরিকান দেশকে মূলত একদলীয় রাষ্ট্রের পরিণত করেছিল। তোরিজো এ দু'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি এ দু'টি কেন্দ্রকে পানামা থেকে প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তার মতে, পানামা যোজক প্রণালী ও এর দু'পাশের ভূখণ্ড পানামা দেশটির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিলবোর্ডে ওমর তোরিজোর ছবির নিচে লেখা ছিল, "ওমরের আদর্শ হচ্ছে স্বাধীনতা,

কোন মিসাইল এই আদর্শকে হত্যা করতে পারবে না।" এ কথা পড়ে আমার সারা শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেল। সাথে সাথে আমি বুঝলাম যে, বিংশ শতাব্দীর পানামার কাহিনী তখনও শেষ হয়ে যায়নি। তোরিজো খুবই কঠিন ও মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

বাইরে ঝড়ো বৃষ্টি গাড়ির কাঁচকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। এরই মধ্যে ট্রাফিকের সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। আমাদের ট্যাক্সির চালক হর্ন বাজিয়ে সামনের গাড়িকে তাড়া দিল। আমি নিজের মিশন নিয়ে চিন্তা করলাম। মেইন আমাকে পানামায় পাঠিয়েছে সংস্থাটির প্রথম ব্যাপক মাস্টার ডেভেলপম্যান্ট প্ল্যানের চুক্তিকে চূড়ান্ত করার জন্য। এই পরিকল্পনার অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক, আন্তঃআমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক ও ইউএস এইড। এসব সংস্থা পানামার মতো ছোট ও দরিদ্র দেশের কৃষি, যোগাযোগ ও জ্বালানী খাতগুলোতে শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। অন্যদিকে মেইন এসব প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। গোটা ব্যাপারটিই হচ্ছে একটি অপকৌশল, যা পানামার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশকে চিরদিনের জন্য ঋণী ও তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

ট্যাক্সি ঝড়ো রাতের প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। এক তীব্র অপরাধবোধ আচমকাই আমাকে গ্রাস করল। কিন্তু আমি তা সাথে সাথে চাপা দিয়ে ফেললাম। আমার কি অসুবিধা? আমি জাভায় নিচে নেমেছি, নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছি। এখন আমার জীবনের সেরা সুযোগটি কাজে লাগানোর সময়।

এক ধাক্কায় আমি হব ধনী, ক্ষমতাবান ও বিখ্যাত।

অধ্যায়-১১
যোজকে প্রণালীর দস্যুগণ

পরের দিন পানামা সরকার আমাকে সব কিছু দেখানোর জন্য একজন লোককে নিয়োগ করলেন। তার নাম ফিদেল। প্রথম দেখাতেই তার সাথে আমার ভাব জমে উঠল। ফিদেল ছিলেন দীর্ঘ ও একহারা গড়নের। নিজ দেশ সম্পর্কে তার অহঙ্কার দেখার মতো। তার পরদাদা সিমোঁ বলিভারের বাহিনীতে যুদ্ধ করেছিলেন স্পেনের বিরুদ্ধে। আমি তাকে জানালাম যে, টম পেইন ছিলেন আমার পূর্ব পুরুষ। তিনি জানালেন যে, তিনি টম পেইনের লেখা কমনসেন্স বইটির স্প্যানিশ অনুবাদ পড়েছেন। শুরুতে আমরা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেছিলাম। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারি তখন তার আনন্দ দেখে কে।

ফিদেল তখন হেসে বললেন, "আপনাদের অনেক লোক এখানে যুগ যুগ ধরে বাস করছে। অথচ এরা এখনো স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শেখেনি।"

ফিদেল আমাকে পানামা শহরের নতুন অংশ ঘুরিয়ে দেখালেন। বিশাল সব আকাশ ছোঁয়া স্টীল ও কাঁচের তৈরি ভবন দেখে আমি তো রীতিমতো অবাক হলাম। তখন তিনি জানালেন যে, রিও গ্রান্ডি নদীর দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে পানামাতেই সবচেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক ব্যাংকের অফিস রয়েছে।

তিনি বললেন, "পানামাকে আমেরিকার সুইজারল্যান্ড বলা হয়। আমরা গ্রাহকদের কোন বিব্রতকর প্রশ্ন করি না।"

সন্ধ্যাবেলায় যখন সূর্য প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবতে শুরু করেছে তখন আমাদের গাড়ি চলেছে উপকূলের সড়ক দিয়ে। এক দল জাহাজ সারি বেঁধে একটি ডকে ভিড়ে ছিল। আমি ফিদেলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, যোজক প্রণালীতে কোন সমস্যা ঘটেছে কিনা।

তিনি হেসে জবাব দিলেন, "এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। একবারে তো সব জাহাজ প্রণালী দিয়ে পার হতে পারে না। তাই এরা এসব ডকে লাইন বেঁধে অপেক্ষা করে। এরপর সময় হলে প্রণালী পার হয়। এই প্রণালী দিয়ে পার হওয়া জাহাজগুলোর অর্ধেকই হচ্ছে জাপানী আর তা মার্কিন জাহাজগুলোর প্রায় দ্বিগুণ"

আমি যে এই খবরটা জানতাম না তা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। সাথে সাথে ফিদেল জবাব দিলেন, "এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, উত্তর আমেরিকার লোকেরা বাকি দুনিয়া সম্পর্কে তেমন একটা কিছুই জানে না।"

আমরা একটি সুন্দর পার্কে এসে নামলাম। প্রাচীন সব ধ্বংসস্তূপের মাঝে ফুটে রয়েছে অসংখ্য বোগেনভিলা ফুল। একটি নোটিশ বোর্ডে লেখা রয়েছে যে, ইংরেজ জলদস্যুদের লুটপাট থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্য এখানে একটি দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। পার্কের মাঝখানে একটি পরিবার সান্ধ্যকালীন বনভোজনের আয়োজন করছে। পরিবারের সদস্য হচ্ছে পাঁচজন – বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে ও একজন প্রবীণ লোক। শেষজন বোধহয় ছেলেমেয়েদের দাদা বা নানা। তাদের চারপাশের প্রশান্ত আবহ দেখে আমার খুব লোভ হলো। মনে হলো ওদের একজন হতে পারলে ভাল হতো। তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা হাসলেন, হাত নাড়লেন, ইংরেজীতে স্বাগত জানালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি পর্যটক?" শুনে তারা হাসলেন। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এলেন।

এসে গর্বের সাথে বললেন, "আমরা তিন পুরুষ ধরে যোজক প্রণালী এলাকায় বাস করছি। এটির খনন শেষ হওয়ার তিন বছর পর আমার দাদা এখানে এসেছিলেন। তিনি গাধায় টানা গাড়ি চালিয়ে লকগুলোর ভেতর দিয়ে জাহাজগুলোকে টানার কাজ করতেন। এরপর তিনি টেবিল সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছেলেমেয়েদের সাহায্যকারী প্রবীণকে দেখিয়ে বললেন, "আমার বাবা ছিলেন একজন প্রকৌশলী। আমি তার পেশাকেই বেছে নিয়েছি।"

ভদ্রলোকের স্ত্রী যোগ দিলেন টেবিল সাজানোর কাজে। তাদের পেছনে লাল টুকটুকে সূর্য ডুব দিল প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলে। কি অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে, যেন মনের আঁকা একটি অপূর্ব ছবি। আমি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, "আপনারা কি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?"

তিনি অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, "অবশ্যই। যোজক প্রণালী ও এর দু'পাশের এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড।" ছেলেটি দৌড়ে এসে জানাল যে, খাবার তৈরি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ছেলে কি এখানে বসবাসকারী চতুর্থ পুরুষ হবে?"

ভদ্রলোক প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দু'টোকে এক সাথে করে আকাশের দিকে তুললেন।

এরপর বললেন, "আমি প্রতিদিন বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমার ছেলে সেই সুযোগ পায়। এখানকার জীবন সত্যিই খুব ভাল।" তারপর হাত দু'টিকে নামিয়ে ফিদেলের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, "আমরা যাতে আরও ৫০ বছর এই এলাকাকে ধরে রাখতে পারি সে কামনাই করি। ওই স্বৈরশাসক তোরিজো অনেক গণ্ডগোল

পাকাচ্ছে। লোকটি বড় বিপজ্জনক।

এ কথা শুনে আমার ভেতরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। স্প্যানিশ ভাষায় তাকে বললাম, "বিদায়! আশা করি আপনি ও আপনার পরিবার এখানে ভালভাবেই সময় কাটাবেন। সেই সাথে পানামার সংস্কৃতিকে ভালভাবে বুঝতে শিখবেন।"

তিনি আমার দিকে ঘৃণাভরা চাহনি হেনে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "আমরা এদের ভাষায় কথা বলি না।" বলেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহনিয়ে চলে গেলেন পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে।

ফিদেল আমার কাছে সরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে শক্ত চাপ দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, "ধন্যবাদ।"

শহরে ফিরে তিনি একটি ঘিঞ্জি বস্তির ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলেন। বললেন, "সবচেয়ে বাজেগুলোর মধ্যকার একটি নয়। তবে আপনি পুরো চিত্রটিকে বুঝতে পারবেন।"

বাড়িগুলো সব জীর্ণ কাঠের তৈরি। নর্দমাগুলোর আবদ্ধ দূষিত পানি পাড় ছুঁয়েছে। দেখলে মনে হবে যে, আবদ্ধ দূষিত পানির উপরে যেন কতকগুলো ভাঙাচোরা নৌকা ভাসছে। পঁচা আবর্জনা ও নর্দমার পানির দুর্গন্ধে চারদিক ছেয়ে রয়েছে। পাটকাঠির মতো শুকনো হাত-পা ও বেলুনের মতো ফোলা পেট নিয়ে বস্তির শিশু-কিশোররা গাড়ির দু'পাশে দৌড়াচ্ছে। গাড়ি ক্ষণিকের জন্য থামল। অমনি ছেলেমেয়েরা গাড়িটিকে ঘিরে ধরল। আমাকে আঙ্কেল বলে ডাকল। দু'টো পয়সা ভিক্ষা চাইল। জাকার্তার বস্তিগুলোর কথা আমার মনে পড়ল।

বস্তির দেয়ালগুলোতে নানারকম কথা লেখা। কয়েকটিতে হৃদয়ের চিহ্ন এঁকে পাশে প্রেমিক-প্রেমিকাদের নাম লেখা, কিন্তু বেশির ভাগই হচ্ছে আমেরিকা বিরোধী শ্লোগান। "ফিরে যাও শ্বেতাঙ্গ", "আমাদের প্রণালীকে নষ্ট করো না", "দাস মালিক শ্যাম চাচা", "পানামা নয় ভিয়েতনাম"। যে শ্লোগানটি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় ধরাল সেটি হলো, "স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করাই যীশুর পথ।" আর সেই সাথে প্রতি দেয়ালেই কমপক্ষে একটি করে ওমর তোরিজোর পোস্টার লাগানো।

ফিদেল বললেন, "এবারে বিপরীত চিত্র দেখাতে হয়। আপনি আমেরিকান নাগরিক। সেই সাথে আমার কাছে দু'সরকারের অনুমতিপত্রই রয়েছে।" ফিরোজা রংয়ের আকাশের নিচ দিয়ে গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটে পৌঁছলো যোজক প্রণালী এলাকায়। কি দেখতে পাব তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম তার জন্য আমার প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। এত ঐশ্বর্যময় স্থান খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও খুব কমই রয়েছে। বিশাল শ্বেদ প্রাসাদ, মসৃণ ভাবে ঘাস ছাঁটা বাগান, সুবিশাল গলফ ক্লাব, সুপার মার্কেট, সিনেমা হল। বিত্তের প্রাচুর্য যেন সবখানেই উপচে পড়ছে।

তিনি জানালেন, "এখানে যা দেখছেন সবই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি। সকল ব্যবসা, সুপার

মার্কেট, নাপিতের দোকান, বিউটি পার্লার, রেস্তোরাঁ সবকিছুই পানামার আইন ও করের আওতার বাইরে। ৭টি ১৮-গর্ত বিশিষ্ট গফ ক্লাব রয়েছে এখানে। আমেরিকার ডাক বিভাগ অনেকগুলো ডাকঘর চালায়। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে পুরোদমে চালু। প্রকৃত অর্থে অঞ্চলটি পানামার ভেতরে আলাদা একটি দেশ।"

আমি অপরাধীর সুরে বললাম, "এতো স্রেফ অপমান করা।"

ফিদেল যেন এক নজরে তাকিয়ে আমার কথার আসল অর্থটি বুঝতে চেষ্টা করলেন। এরপর সায় দিলেন, "হুঁ। ঠিকই বলেছেন।" তারপর শহরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ওইখানের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১ হাজার ডলারের চেয়েও কম। বেকারত্বের হার হচ্ছে ৩০%। যে বস্তিটি আমরা এই মাত্র দেখে এলাম তাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় জাতীয় আয়ের চেয়ে শতগুণেও কম। আর কারোরই স্থায়ী কোন কাজ নেই।"

আমি থমথমে গলায় জানতে চাইলাম, "সে ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কী করা হয়েছে?"

তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তার চোখ দুটি থেকে ক্রোধের আগুন নিভে গেল। জেগে উঠল হতাশা।

আপন মনে মাথা নেড়ে বললেন, "আমাদের কিইবা করার আছে?

সঠিক পথ আমার জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে, তোরিজো আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এতে হয়তো বা তার মৃত্যু ঘটবে। তারপরও তিনি হাল ছাড়ছেন না। তার লোকদের জন্য তিনি আমৃত্যু লড়াই করে যাবেন।

গাড়ি ততক্ষণে যোজক প্রণালী থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফিদেল এতক্ষণে সহজ হলেন। দুষ্টু হাসি হেসে তরল সুরে জানতে চাইলেন, "নাচতে কি চান আপনি?" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, "চলুন আগে রাতের খাবার খাব। এরপর এমন এক পানামাকে দেখাব যা আপনি এখনও দেখেননি।"

অধ্যায় -১২
সৈনিক ও বেশ্যা

রাতের খাবারের মেনু ছিল বিশাল একটি স্টেক ভাজা ও ঠান্ডা বিয়ার। এরপর গাড়িতে চেপে চললাম একটি প্রায় অন্ধকার সরু রাস্তা দিয়ে। ফিদেল আমাকে উপদেশ দিলেন, কখনই এই রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন না। এখানে আসতে গেলে ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা দরজার সামনে নামবেন। আর এই তারকাঁটার বেড়ার ওপাশেই হচ্ছে যোজক প্রণালী অঞ্চল।"

আমাদের গাড়ি এসে থামল একটি কার পার্কে। আগে থেকেই সেখানে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ফিদেল একটি ফাঁকা স্থান বেছে নিয়ে গাড়ি পার্কিং করলেন। একটি বুড়ো লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হলো। ফিদেল গাড়ি থেকে নেমে বুড়ো লোকটির পিঠ চাপড়ে দিলেন। এরপর তিনি গাড়ির ফেন্ডারে আদরের ভঙ্গিতে হাত বুলালেন।

তারপর বুড়ো লোকটির হাতে একটি নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "একে ভাল করে যত্ন করো। সে আমার প্রেমিকা।"

পার্কিং লট থেকে একটি ছোট্ট পথ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম আরেকটি সরু রাস্তায়। অসংখ্য চোখ ধাঁধানো নিয়ন বাতির আলোয় পুরো রাস্তাটি ঝলমল করছে। দু'টি ছেলে একে অপরের দিকে লাঠি তাক করতে করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। দু'জনের মুখ দিয়ে খই ফোটার মতো গুলির আওয়াজ বেরুচ্ছে। একটি ছেলে এসে ধাক্কা খেলো ফিদেলের পায়ে। ছেলেটির মাথা বড় জোর ফিদেলের উরুর সমান উঁচু হবে। ছেলেটি থেমে গিয়ে পিছু হটল। এরপর জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "দুঃখিত স্যার।"

ফিদেল ছেলেটির দু'কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু তোমরা কাকে গুলি করছিলে?"

ততক্ষণে দ্বিতীয় ছেলেটিও এসে হাজির হয়েছে। প্রথম ছেলেটিকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দ্বিতীয় জন বলল, "স্যার আমরা খুবই দুঃখিত, ও আমার ভাই।"

ফিদেল মৃদু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আমি ব্যথা পাইনি। তোমরা কী খেলা খেলছিলে

তা জানতে চাইছি। আমার মনে হয় যে, ছোটবেলায় আমিও এই খেলাটা খেলেছি।"

দু'ভাই একে অপরের চোখের দিকে তাকাল। এরপর বড় জন হেসে বলল, "ও হচ্ছে প্রণালী এলাকার শ্বেতাঙ্গ জেনারেল। সে আমাদের মাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। আমি এখন তাকে ওর দেশে ভাগিয়ে দিচ্ছি।"

ফিদেল আমার দিকে চোরা চাহনি হেনে জিজ্ঞেস করলেন, "এই শ্বেতাঙ্গ জেনারেল কোন দেশের লোক?"

দু'ভাই সমস্বরে জবাব দিল, "যুক্তরাষ্ট্রের।"

ফিদেল আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মা কি এখানে চাকরি করে?"

দু'ভাই একটি নিয়ন বাতিকে দেখিয়ে বলল, "ওখানে মদ বিক্রি করে।"

ফিদেল দু'ভাইকে দু'টি পয়সা দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, তোমাদের খেলা তোমরা খেলতে থাক। কিন্তু সাবধান, আলোর বাইরে যাবে না।"

মহা খুশী হয়ে দু'ভাই বলল, "জ্বী স্যার, ধন্যবাদ স্যার।" এরপর আবার শুরু হলো তাদের দৌড়াদৌড়ি ও মুখ দিয়ে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ফিদেল বোঝালেন, "পানামার নারীরা বারে মদ বিক্রি করতে পারবে, এমনকি তারা নাচতেও পারবে। কিন্তু তাহা দেহ বিক্রি করতে পারবে না। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই এ কাজে বাইরের মেয়েদের নিয়োগ করা হয়।"

আমরা একটি বারে ঢুকলাম। সাথে সাথে বিকট শব্দে বাজানো আমেরিকান পপ গান অমাদেরকে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা দিলো। কিছুক্ষণ পর তা অবশ্য সয়ে গেল। দরজার কাছে এক জোড়া বিশাল দেহী মার্কিন সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের বাহুর লাল ব্যাণ্ড দেখেই এদেরকে মিলিটারী পুলিশ বলে চিনতে পারলাম।

ফিদেল আমাকের বারের ভেতরের মঞ্চের কাছে নিয়ে এলেন। মঞ্চের উপরে উদ্দাম বাজনার তালে তালে নাচছে তিন তরুণী। এদের শরীর পুরোপুরিভাবে নগ্ন, শুধু মাথা ছাড়া। একজন পরেছে নাবিকের টুপি। দ্বিতীয় জনের মাথায় রয়েছে সবুজ বেরেট। আর তৃতীয় জন মাথায় চাপিয়েছে কাউবয়দের টুপি। তাদের দেহের গঠন অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাদের মুখে লেগে রয়েছে প্রলোভনের হাসি। তারা একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে নাচছিল। অথচ দেখে মনে হচ্ছিল যে, এরা স্রেফ খেলার ভঙ্গিতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। বাজনা, নাচের ধরন, মঞ্চ সব মিলিয়ে গোটা পরিবেশকে বোস্টনের কোন ডিস্কো ক্লাবের মতো মনে হচ্ছিল। শুধু তফাৎ এই যে, ডিস্কো মিউজিকের সাথে মঞ্চের উপরে নাচছে তিন নগ্ন তরুণী।

আমরা একদল ইংরেজী ভাষী যুবকের ভিড় ঠেলে কাউন্টারের কাছে হাজির হলাম। যুবকরা টিশার্ট ও নীল রঙের জিন্সের প্যান্ট পরেছিল। কিন্তু তাদের কমদছাঁট চুল দেখেই

এদেরকে সৈনিক বলে চিনতে পারলাম। 'এরা এসেছে প্রণালী এলাকার আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি থেকে। ফিদেল এক ওয়েট্রেসের কাঁধে আলতো টোকা দিলেন। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুশির হাসি হেসে ফিদেলকে জড়িয়ে ধরল। যুবকের দল এই দৃশ্য দেখে অপছন্দের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। খুব সম্ভবত এরা তাদের বিধি প্রদত্ত নিয়তির মধ্যে পানামার এই সুন্দরী তরুণীকেও ধরে নিয়েছিল। ওয়েট্রেসটি আমাদেরকে একটি কোণায় নিয়ে এলো। কোত্থেকে একটি টেবিল ও দু'টি চেয়ার যোগাড় করে আমাদেরকে বসতে দিলো।

বসার পর ফিদেল আশপাশের টেবিলগুলোর লোকজনদের সাথে অভিবাদন বিনিময় করলেন। পানামার লোকেরা রঙিন প্রিন্টের হাফহাতা শার্ট ও বিভিন্ন রঙের নানা রকম কাপড়ের প্যান্ট পরেছিলেন। ওয়েট্রেসটি এক জোড়া বালবোয়া বিয়ারের বোতল এনে টেবিলের উপরে রাখল। এরপর যখন সে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, তখন ফিদেল তার নিতম্বে মৃদু চাপড় মারলেন। তখন মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে ফিদেলের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে একটা হাওয়াই চুমু ছুঁড়ে চলে গেল। আমি সৈনিকদের দিকে তাকালাম। তারা তখন অখণ্ড মনোযোগের সাথে নাচ দেখছে।

বারের খদ্দেরদের বেশীর ভাগেই হচ্ছে আমেরিকান সৈনিক। এ ছাড়াও রয়েছে পানামার লোকজন। এদেরকে দেখে চেনা যায় অতি সহজেই। এদের চুল লম্বা। এদের পরণে রয়েছে রঙিন হাফহাতা শার্ট ও সাধারণ প্যান্ট। আমেরিকান সৈনিকদেরকেও অনায়াসে চেনা যায়। এদের চুল কদমছাঁট। এদের পরণে টিশার্ট ও নীল রঙের জিন্সের প্যান্ট। পানামার লোকদের মধ্যে খুব কমই বসে ছিল। বেশীর ভাগেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক মনে হচ্ছিল। যেন একদল কোলি কুকুর একপাল ভেড়াকে পাহারা দিচ্ছে।

একদল স্বল্পবসনা তরুণী চঞ্চল প্রজাপতির মতো এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরা কখনও সম্ভাব্য খদ্দেরদের কোলে বসছিল। কখনও ওয়েট্রেসদের হুকুম করছিল। কখনও নাচছিল। কখনও গান গাইছিল। কখনও কয়েকজন মিলে দু'টেবিলের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কখনও মঞ্চে উঠে নগ্ন নর্তকীদের সাথে পাল্লা দিয়ে নাচছিল। এদের পরণে ছিল মিনি স্কার্ট ও স্লিভলেস টপস, মিনি গাউন, জিন্সের শর্টস ও সুতির শর্ট ব্লাউজ, টুপিস বিকিনি। শুধুমাত্র একজনকেই দেখা গেল গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত গাউন পরে মাথায় ঘোমটা দিতে। অথচ ঘোমটার আড়ালে সবচেয়ে বেশী খ্যামটা নাচ নাচল এই মেয়েটিই। আমি বুঝতে পারলাম যে, সৌন্দর্য, দৈহিক গড়ন ও ফস্টিনস্টির কলাকৌশল মিলিয়েই এই জগতে মেয়েগুলো টিকে থাকে। এদের সংখ্যা পানামার মেয়েদের কমপক্ষে দ্বিগুণ দেখে অবাকই হলাম। কোন হতাশা তাদেরকে এই নোংরা জগতে ঠেলে দিয়েছে?

বাজনার বিকট শব্দকে ছাপিয়ে আমি চিৎকার করে প্রশ্ন করলাম, "সব অন্যান্য দেশ থেকে।"

ফিদেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানালেন, "শুধুমাত্র ওয়েট্রেসরা বাদে। এরা পানামার মেয়ে।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "এরা কোন দেশ থেকে এসেছে?"

ফিদেল জবাব দিলেন, "হন্ডুরাস, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া ও গুয়াতেমালা।

আমি তৃতীয় প্রশ্ন করলাম, "সবই তো প্রতিবেশী দেশ?"

ফিদেল হেসে জানালেন, "না, তা ঠিক নয়। কোস্টারিকা ও কলম্বিয়া হচ্ছে পানামার নিকটতম প্রতিবেশী।

এমন সময় ফিদেলের চেনা ওয়েট্রেসটি ফিরে এসে ফিদেলের কোলে বসল। ফিদেল মোলায়েম ভঙ্গিতে ওয়েট্রেসটির উন্মুক্ত পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

এরপর ফিদেল বললেন, "ক্লারিসা, আমার উত্তর আমেরিকান বন্ধুকে জানাও, কেন তারা এখানে এসেছে?" বলে সে মঞ্চের দিকে ইঙ্গিত করলেন। পুরোনো নর্তকীদের পালা শেষ হয়েছে। এরা ডিস্কো মিউজিকের তালে তালে পোশাক পরে নাচতে নাচতে নেমে গেল মঞ্চ থেকে। নামার আগে নাচতে নাচতে উঠে আসা তিন নতুন তরুণীর মাথায় টুপিগুলো পরিয়ে দিলো। নতুন তরুণীরা মঞ্চে উঠে আসা মাত্র ডিস্কো মিউজিক পাল্টে সাম্বা নৃত্যের বাজনা শুরু হলো। সেই বাজনার তালে তালে নতুন তরুণীরা পোশাক ছাড়তে লাগল।

ক্লারিসা ফিদেলের কোলে বসেই আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলো। বলল, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। এরা বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্য এখানে এসেছে। আমি আরও এক জোড়া বালবোয়া আনছি।" বলেই উঠে দাঁড়িয়ে খালি বোতলগুলো নিয়ে চলে গেল।

তখন আমি ফিদেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, "সবই ঠিক। তবে এরা এখানে এসেছে মার্কিন ডলার কামানোর জন্য।"

ফিদেল জবাব দিলেন, "ঠিক। কিন্তু যেসব দেশে স্বৈরশাসকদের শাসন করছেন সে সব দেশের মেয়েরা কেন এখানে ভিড় জমাবে?"

আমি মঞ্চের দিকে আবার তাকালাম। মেয়ে তিনটি হাসছে। আর নাবিকের টুপিটিকে বলের মতো ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। আমি ফিদেলের চোখের দিকে তাকালাম "আপনি তো ঠাট্টা করছেন না?"

তিনি গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, "না। তবে তা করতে পারলে তো ভালই হতো। এখানে বেশির ভাগ মেয়েই তাদের বাবা, ভাই, স্বামী, প্রেমিকদের হারিয়েছে। তারা অত্যাচার ও হত্যার মধ্য দিয়েই বড় হয়েছে। তারা অত্যাচার ও হত্যার মধ্য দিয়েই বড় হয়েছে। নগ্ন নাচ ও দেহ বিক্রি তাদের কাছে কদর্য বলে মনে হয় না। তারা এখানে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। এরপর অন্য কোথাও দোকান বা কফি হাউজ কিনে....।"

বারের কাছে একটি হট্টগোলের শব্দে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। একজন ওয়েট্রেস একজন সৈনিককে চড় মারার জন্য হাত উঠাল। সাথে সাথে সৈনিকটি তার হাত ধরে মোচড়াতে শুরু করল। ওয়েট্রেসটি তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে কুঁজো হয়ে গেল। সৈনিকটি হাসতে হাসতে চিৎকার করে তার বন্ধুদের কিছু একটা বলল। অমনি বন্ধুরা সজোরে হেসে উঠল। ওয়েট্রেসটি তার খোলা হাত দিয়ে সৈনিকটিকে দুর্বলভাবে আঘাত করতে চাইল। সৈনিকটি তার হাত আরো জোরে মুচড়ে ধরল। ওয়েট্রেসটি একেবারে নিচু হয়ে পড়ল। ব্যথায় তার মুখ নীল হয়ে গেছে।

মিলিটারী পুলিশরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ঘটনাটিকে দেখছে। ফিদেল লাফিয়ে ওঠে বারের দিকে ছুটে যেতে চাইলেন। পাশের টেবিলের এক লোক তাকে আটকে বললেন, "শান্ত হন ভাই। এনরিক কাছেই রয়েছে।"

মঞ্চের ছায়া ফুঁড়ে উদয় হলো দীর্ঘ ও একহারা গড়নের এক পানামানিয়ান। চিতা বাঘের নিঃশব্দে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকের উপরে। এক হাতে সৈনিকের গলা পেছন থেকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে ধরল। আরেক হাতে ধরা এক গ্লাস পানি ঢেলে দিল সৈনিকের মুখের উপরে। এই সুযোগে ওয়েট্রেসটি হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলো এগিয়ে এসে পানামার লোক ও মার্কিন সৈনিকটিকে ঘিরে ধরল। পানামানিয়ানটি সৈনিককে বারের উপরে তুলে ধরে কয়েকটি কথা বলল। এরপর সৈনিককে নামিয়ে সে ধীরে ধীরে ইংরেজিতে কয়েকটি কথা বলল। বাজনার শব্দ ছাপিয়ে তা পুরো কক্ষ থেকেই শোনা গেল।

"আপনারা কেউই ওয়েট্রেসদের ছোঁবেন না। আর অন্যদের ছোঁয়ার আগে দাম মেটাতে হবে।"

এতক্ষণে মিলিটারি পুলিশ দু'টি এগিয়ে এলো। তারা পানামিয়ানদের ভিড়ের কাছে গিয়ে বলল, "এনরিক, এখন এর দায়িত্ব আমাদের।"

এনরিক সৈনিকটিকে মেঝেতে নিচু করে ধরল। এরপর সৈনিকের ঘাড়ে হাল্কা চাপ দিলো। সৈনিকটিকে মাথা নিচু করে কঁকিয়ে উঠল যন্ত্রণায়।

এনরিক জিজ্ঞেস করল, "আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন?" জবাবে শুধু গোঙানির শব্দ শোনা গেল। "ভাল", কথাটি বলে এনরিক মিলিটারী পুলিশদের কাছে সৈনিকটিকে ঠেলে দিল।

তারপর বলল, "একে এখান থেকে নিয়ে যান।"

অধ্যায় -১৩
জেনারেলের সাথে আলোচনা

আমন্ত্রণটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পানামা সফরের সময় একদিন সকালে আমার অফিসে বসে ছিলাম। সে সময় পানামার সরকার আমাকে ইন্সটিটিউট দ্য রিসোর্স হাইড্রোলিকা ইলেকট্রিফিকোশিওতো একটি অফিস কক্ষ দিয়েছিল। এটি পানামার রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা। আমি পরিসংখ্যানে বোঝাই একতাড়া কাগজপত্র অখণ্ড মনোযোগের সাথে দেখছিলাম। সে সময় একটি লোক আমার কক্ষের খোলা দরজার পাল্লায় মৃদু টোকা দিলো। আমি তাকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। সেই সাথে একগাদা সংখ্যা দেখা থেকে রেহাই পেয়ে মনে মনে খুশিও হলাম। লোকটি নিজেকে জেনারেলের গাড়ির চালক বলে পরিচয় দিলো। জানাল যে, সে আমাকে জেনারেলের বাংলোয় নিয়ে যেতে এসেছে।

এক ঘন্টা পর আমি বসলাম ওমর তোরিজোর উল্টোদিকে। মাঝখানে রইল শুধু একটি টেবিল। তার পোশাক পানামার আর সব পুরুষদের মতই। খাকি রংয়ের প্যান্ট ও নীল সবুজ রংয়ের হাফ শার্ট। তিনি দীর্ঘ ও সুঠাম দেহের আকর্ষণীয় সুপুরুষ। এক গোছা কালো চুল তার চওড়া কপালের উপরে পড়ে রয়েছে। তার দায়িত্বের যে চাপ সে তুলনায় তাকে অদ্ভুত রকমের নিরুদ্বেগ বলে মনে হলো।

তিনি আমাকে ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও গুয়াতেমালায় আমার সাম্প্রতিক সফরগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তবে তার সবচেয়ে বেশী কৌতূহল ছিল ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী সম্পর্কে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারের সাথে চক্রান্ত করার দায়ের শাহের বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এরপর শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল।

ওমর তোরিজো বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে বাবার বিরুদ্ধে পাকানো ষড়যন্ত্রে অংশ নেবে একি বিশ্বাস করার মতো কথা?

এরপর তিনি সুদূর ইরানের ইতিহাস সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। আর আমি তন্ময় হয়ে তা শুনতে থাকলাম। মাঝে মধ্যে অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি তার কথার মধ্যে কিছু নতুন তথ্য যোগ করতে পেরেছি। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে সে সময় ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক কিভাবে শাহকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বিদেশে নির্বাসনে পাঠিয়ে

ছিলেন তাও তিনি বললেন। তারপর সিআইএ কিভাবে মোসাদ্দেককে কমিউনিস্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে শাহকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনল তাও তিনি জানালেন। আমি তাকে এ ক্ষেত্রে কারমিট রুজভেল্টের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য জানাতে পারতাম। কিন্তু তা জানাতে পারলাম না। কেননা, এ থেকেই শুরু হয়েছিল বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের নতুন যুগ। আর সেই সাথে গোটা বিশ্বজুড়ে জ্বলে উঠল অশান্তি নয়া দাবানল।

ওমর তোরিজো বলে চললেন, "ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শাহ ইরানের শিল্প খাতগুলোকে উন্নয়নের জন্য বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এসব কর্মসূচী সফল হলে ইরান আধুনিক যুগে প্রবেশ করবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি ইরান সম্পর্কে এতো কথা জানলেন কিভাবে?"

তিনি হেসে জবাব দিলেন, "পড়াশুনা ও চিন্তা-ভাবনা করে। তবে ইরানের শাহের রাজনীতি আমার কাছে ভালো লাগেনি। নিজের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য তিনি তার বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। সেই সাথে সিআইএ'র হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি তার দেশের জন্য ভালো কাজ করছেন। আমি তার কাজ থেকে শেখার চেষ্টা করছি। অবশ্য তিনি কতদিন টিকবেন সেটাই হচ্ছে আসল কথা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি মনে করেন যে, তিনি বেশীদিন ক্ষমতায় টিকবেন না?"

ওমর তোরিজো গম্ভীর সুরে বললেন, "তার অনেক শক্তিশালী শত্রু রয়েছে।"

আমি তার চেয়েও গম্ভীর ভাবে বললাম, "তার হাতে রয়েছে বিশ্বের সেরা দেহরক্ষী বাহিনীর একটি।"

তিনি আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, "তার গোয়েন্দা সংস্থা 'সাভাক' নির্মমতার জন্য কুখ্যাত। এ ধরনের সংস্থা শাসকের জন্য অসংখ্য শত্রু তৈরি করে।" তিনি থেমে দম নিয়ে বললেন, "দেহরক্ষীদের কথা বলছেন তো? আমারও এ রকম কয়েকজন রয়েছে।" বলেই দরজার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন। এরপর প্রশ্ন করলেন, "যদি আপনার দেশ আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় তাহলে ওরা কি আমাকে রক্ষা করতে পারবে?"

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "আপনি সত্যিই এটা ঘটতে পারে বলে মনে করেন?"

তার চোখের চাহনি দেখেই প্রশ্নটা যে বোকার মত করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম। তারপরও তিনি জবাব দিলেন। "আমাদের হাতে রয়েছে যোজক প্রণালী, এটি আর্বেঞ্জ ও ইউনাইটেড ফ্রুটের চেয়ে অনেক বড়।"

আমি গুয়াতেমালাতে কাজ করেছি। দেশটি সম্পর্কে পড়াশুনাও করেছি। তাই তোরিজোর কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিলাম। পানামাতে যোজক প্রণালীর যে গুরুত্ব রয়েছে গুয়াতেমালাতে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর ঠিক সেই গুরুত্ব রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংস্থার জন্ম হয়েছিল। খুব দ্রুত এটি মধ্য আমেরিকার অন্যতম সেরা

বাণিজ্যিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সংস্কারপন্থী রাজনীতিবিদ হাকোবো আর্বেঞ্জ গুয়াতেমালার ইতিহাসের সবচেয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই সময় গোটা আমেরিকান অঞ্চলে ওই নির্বাচন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আদর্শ রূপে আখ্যায়িত হয়েছিল। তখন গুয়াতেমালার জনসংখ্যার মাত্র ৩% দেশটির ৭০% জমির মালিক ছিল। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় আর্বেঞ্জ গুয়াতেমালার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি ভূমি সংস্কারের কাজে হাত দিলেন।

ওমর তোরিজো বললেন, "গোটা লাতিন আমেরিকার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী আর্বেঞ্জের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন আমার হিরো। কিন্তু সেই সাথে আমরা তার পরিণতি সম্পর্কে শঙ্কিতও ছিলাম। আমরা জানতাম যে, ইউনাইটেড ফ্রুট আর্বেঞ্জের সংস্কারের বিরোধিতা করছে। কেননা, ততদিনে সংস্থাটি বেনামে গুয়াতেমালার সেরা জমিগুলোর মালিকে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে সংস্থাটি কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, জ্যামাইকা, নিকারাগুয়া, সান্তো দোমিঙ্গো ও পানামার বড় খামারগুলোর মালিকানা লাভ করেছে। তাই সংস্থাটি আর্বেঞ্জকে শায়েস্তা করার জন্য পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। নইলে এর বাণিজ্যিক স্বার্থ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরের ঘটনা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী আর্বেঞ্জের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাল। এতে মার্কিন কংগ্রেস ও জনগণের কাছে আর্বেঞ্জ কমিউনিস্ট স্বৈরশাসক ও গুয়াতেমালা সোভিয়েত ইউনিয়নের তাবেদার দেশ রূপে পরিচিতি লাভ করল। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে সিআইএ এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালো গুয়াতেমালায়। আমেরিকান বৈমানিকরা গুয়াতেমালার জঙ্গি বিমানগুলো থেকে বোমা বর্ষণ করল গুয়াতেমালা সিটিতে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আর্বেঞ্জ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন ডানপন্থী স্বৈরশাসক ও গুয়াতেমালার সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল কার্লোস কাস্তিলো আর্মাস।

নতুন সরকার শুরু থেকেই হলো ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর তল্পিবাহক। সংস্থাটিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আর্মাস সরকার ভূমি সংস্কারের কর্মকাণ্ড বাতিল ঘোষণা করল। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অর্জিত লভ্যাংশের উপরে আরোপিত আয়কর রহিত করল। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের প্রথাকে অবলুপ্ত করল। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাল। এরা কেউই মুক্তি পান নি। এসব গণবিরোধী আর্থ-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিহাসবিদরা ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী, সিআইএ ও গুয়াতেমালার সামরিক বাহিনীর প্রকাশ্য জোটকে দায়ী করেছেন। দীর্ঘদিন এই জোট দেশটিকে নিরঙ্কুশভাবে শাসন করেছে।

ওমর তোরিজো বলে চললেন, "আর্বেঞ্জকে দু'বার হত্যা করা হয়েছিল। প্রথমে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী তাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করেছিল মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে। পরে তার দেহরক্ষী বাহিনী তাকে বুলেটের আঘাতে দৈহিক ভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু এখনও আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও সভ্য দেশের সরকার, আইনসভা, প্রচার মাধ্যম ও জনগণ এই মিথ্যা প্রচারণাকে অন্ধভাবে

বিশ্বাস করেছিল!! তবে এত সহজে আমার পতন ঘটবে না। এ দেশের সামরিক বাহিনী আমার সন্তানের মতো। তাই আমাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা যাবে না।" বলেই তিনি হাসলেন।

এরপরে গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমাকে হত্যা করতে হলে সিআইএকে মাঠে নামতে হবে। তারপর আমরা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইলাম। আমার মাথায় তখন চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। তোরিজোই প্রথমে মুখ খুললেন।

আমার দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় তিনি বললেন, "আমি এখন বেখটেলের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।"

আমি আঁতকে উঠলাম। বেখটেল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকৌশলী সংস্থা। বহু প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেখটেল ও মেইন এক সাথে কাজ করেছে। তবে পানামার মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেখটেল মেইনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

আমি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমরা নতুন একটি যোজক প্রণালী খননের কথা চিন্তা করছি। এটি সাগরের সাথে একই সমতলে অবস্থিত হবে। ফলে, এতে কোন লক ব্যবহার করতে হবে না। বিশালাকার জাহাজগুলো এই প্রণালী দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারবে। খুব সম্ভবত জাপান এতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হবে।"

আমি নিজের মনে বললাম, "জাপানীরা তো পানামা প্রণালীর সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন "ঠিক ধরেছেন। যদি জাপান সরকার এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাবে একটি জাপানী সংস্থা।"

সাথে সাথে আমি পুরো ব্যাপারটি বুঝে ফেললাম, "তাহলে তো বেখটেলের ভাগে কিছুই পড়বে না।"

তিনি হেসে বললেন, "আধুনিক যুগে এটাই হবে সবচেয়ে বড় নির্মাণ প্রকল্প।" এরপর একটু থেমে বললেন, "বেখটেলের গভর্নিং কমিটি বোঝাই হয়ে রয়েছে নিক্সন, ফোর্ড ও বুশের সহচরদের দ্বারা।" রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ সেই সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি। আর জেরাল্ড ফোর্ড তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু রিপাবলিকান পার্টির নেতা। এরা তিনজন জোটবদ্ধভাবে সেই সময় রিপাবলিকান পার্টিকে পরিচালনা করতেন। ওমর তোরিজো এ ব্যাপারটি খুব ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি বললেন, "এ জন্যই তো বেখটেলের মালিক পরিবারটি রিপাবলিকান পার্টিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।"

তার এসব কথায় আমি তীব্রভাবে অস্বস্তি অনুভব করলাম। যে পদ্ধতিকে তিনি চরমভাবে ঘৃণা করছেন আমি সেই পদ্ধতিরই একজন সক্রিয় ধারক ও বাহক। আমি নিশ্চিত যে, তিনি এ ব্যাপারটি জানেন। আমি পানামায় এসেছি তাকে আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণে রাজি

করাতে। তিনি এসব ঋণ গ্রহণ করলে ঋণগুলোর শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলী ও নির্মাণকারী সংস্থাগুলো। কিন্তু তিনি এখন আমার দায়িত্ব পালনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাকে সরাসরিভাবে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "জেনারেল, আপনি আমাকে কেন ডেকে এনেছেন?"

তিনি ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হেসে বললেন, "ঠিক, এখন তাহলে আসল কথা বলি। পানামা আপনার সহযোগিতা চায়। সেই সাথে আমিও।"

আমি অবাক হলাম, "আমার সাহায্য চান! আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?"

তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে বললেন, "আমরা যোজক প্রণালী ফিরিয়ে নেব। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমরা আর সবার জন্যই আদর্শ হতে চাই। আমরা গরীবদের বন্ধু এটা বোঝাতে চাই। সন্দেহাতীতভাবে গোটা বিশ্বকে জানাতে চাই যে, সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রচেষ্টায় আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন বা কিউবার তাবেদারি করছি না। আমরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে, পানামা যুক্তিপূর্ণ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন একটি দেশ। আমরা নিরর্থকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করছি না। আমরা আমাদের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছি।"

পায়ের উপরে পা তুলে তিনি বললেন, "এ জন্য আমরা এমন একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে চাই যা এই অঞ্চলে হবে অনন্য। বিদ্যুৎ তো অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা পৌঁছাতে হবে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিটির জীর্ণ কুটিরেও। এ জন্য সরকার যত প্রয়োজন তত ভর্তুকি দেবে। একই কথা প্রযোজ্য হবে পরিবহন, যোগাযোগ ও কৃষির ক্ষেত্রেও। আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করব কৃষি শিল্পখাতে। নতুবা, এ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটান সম্ভব হবে না। এসব কাজ করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থ আমরা ইউএসএইড, বিশ্বব্যাংক ও আন্তঃ আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করব।"

আবারও তিনি আমার দিকে ঝুঁকলেন। এরপর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানি যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কাজ বাগানোর জন্য প্রকল্পের আয়তনকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলে। গোটা বিশ্বে আপনারা বিশাল রাজপথ, বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দর, বিরাট সেতু ও বিপুল বিমানবন্দর নির্মাণ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এখানে আপনাদের কাজ হবে ভিন্ন প্রকৃতির। আমার জনগণের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই ধরনের প্রকল্পগুলোকে উপস্থাপন করুন। এগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনারাই পাবেন।

তিনি যে প্রস্তাব দিলেন তা সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত। এই প্রস্তাব আমাকে প্রথমে হতবাক ও পরে উত্তেজিত করল। মেইন আমাকে এতদিন যা শিখিয়েছে তাকে চুরমার করে ফেলল ওমর তোরিজোর প্রস্তাবটি। বৈদেশিক ঋণ প্রদানের আসল উদ্দেশ্য কী তা তার মতো মননশীল রাষ্ট্রনায়ক অবশ্যই জানেন ও বোঝেন। নইলে তিনি এহেন প্রস্তাব দিতে পারতেন না। যদি তিনি সোজা রাস্তায় হাঁটতে রাজি হন তাহলে তিনি অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের

মালিকে পরিণত হবেন। কিন্তু তার দেশ ঋণের মহাসাগরে তলিয়ে যাবে।

তখন পানামা চিরদিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কর্পোরেটোক্রেসির কাছে বাঁধা পড়বে। ল্যাটিন আমেরিকাকে চিরদিনের জন্য বিধি নির্দিষ্ট নিয়তির কারাগারে আবদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়ালস্ট্রীটের নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখার জন্য সব রকম পন্থাই অবলম্বন করা হচ্ছে। "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রতিটি ব্যক্তিই দুর্নীতিপরায়ণ।" এই ধারণার উপরে ভিত্তি করেই কর্পোরেটোক্রেসি বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ওমর তোরিজো এই ধারণাকে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের কাজে লাগাতে চাইছেন না। এতে কর্পোরেটোক্রেসি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ওমর তোরিজোর আদর্শ অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

আমি টেবিলের উল্টো দিকে বসা লোকটিকে ভালভাবে দেখে নিলাম। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, যোজক প্রণালীর কারণে তিনি এক অনন্য ও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। আবার ঠিক একই কারণে তিনি এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীনও হয়েছেন। তাকে সতর্ক হতেই হবে। তিনি এরই মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়কদের অঘোষিত নেতায় পরিণত হয়েছেন। যদি তিনি তার হিরো আর্বেঞ্জের মতো দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে চান তাহলে গোটা বিশ্ব তাকে সুনিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। সে ক্ষেত্রে কর্পোরেটোক্রেসির প্রতিক্রিয়া কী হবে? কী হবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা? ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসের পাতায় পাতায় মৃত নায়কদের কাহিনীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমি জানি যে, আমি এমন এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছি যিনি আমার কাজের যৌক্তিক ভিত্তিকে কঠিন আঘাত হেনেছেন। তার চিন্তা-ভাবনায়, কাজে-কর্মে অনেক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তিনি দস্যু নন। হেনরি মর্গান বা ফ্রান্সিস ড্রেকের মতো লুটেরাও নন। এসব দস্যু ও লুটেরা ইংল্যান্ডের রাজা-রানীর কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে বাণিজ্যের নামে লুটতরাজ চালিয়েছে অবাধে। পানামার রাস্তাগুলোর বিলবোর্ডগুলোতে যে সব শ্লোগান লেখা হয়েছে সেগুলো সস্তা রাজনৈতিক চমক নয়। "ওমরের আদর্শ হচ্ছে স্বাধীনতা। কোন মিসাইল এই আদর্শকে হত্যা করতে পারবে না।" টম পেইন কি প্রায় একই ধরনের কথা লেখেন নি?

আমি বুঝতে পারলাম, আদর্শের কখনই মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু আদর্শ প্রচারকারীদের ভাগ্যে কী ঘটে? আর্নেস্তো চে গুয়েভারা, হাকোবো আর্বেঞ্জ, সালভাদর আলেন্দে- এদের মধ্যে শুধুমাত্র শেষ জনই বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু আলেন্দেকে আর কতদিন টিকে থাকতে দেওয়া হবে? এই চিন্তা থেকে আরেকটি প্রশ্নের জন্ম নিল। ওমর তোরিজো যদি শহীদ হন তাহলে আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে?

দুপুরের খাবার শেষ করে আমি বিদায় নিলাম। ততক্ষণে মেইনকে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিতে ওমর তোরিজো রাজি হয়েছেন। তবে তা হতে হবে তার নির্দেশ মোতাবেক।

এ ক্ষেত্রে মেইনকে রাজি করানোর দায়িত্ব চাপল আমার কাঁধে।

অধ্যায়-১৪
অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন ও অশুভ যুগে প্রবেশ

প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি মেইনের একটি বিভাগের প্রধান ছিলাম। গোটা বিশ্ব জুড়ে সংস্থাটি যেসব প্রকল্পকে বাস্তবায়নের কাজ করছিল সেগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার দায়িত্ব পালন করতে হতো আমার বিভাগকে। সেই সাথে আমাকে সমসাময়িক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহালও থাকতে হতো। কেননা, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও রপ্তানীকারী দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওপেক গঠন করেছিল। সংস্থাটির পুরো নাম হচ্ছে অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ। মূলত পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, পরিশোধন ও বিপণনকারী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর ক্ষমতাকে খর্ব করার লক্ষ্যেই ওপেক গঠন করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ইরানের শাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মোসাদ্দেককে সরিয়ে তাকে ক্ষমতায় বসানোর কারণে শাহ্ নিজ জীবন ও সিংহাসন রক্ষার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু শাহ্ ভালভাবেই জানতেন যে, যে কোন মুহূর্তে পাশা উল্টে যেতে পারে। শাহের এই উদ্বেগ ও ভীতি মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ দেশগুলোর শাসকদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছিল। সেই সাথে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্ব বাজারে পেট্রোলিয়ামের দামকে কমিয়ে রাখছে। এতে করে পেট্রোলিয়াম সম্পদের মালিক দেশগুলো ন্যায্য রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ওপেক গঠন করা হয়েছিল।

সত্তরের দশকের শুরুতেই ওপেক ও সেভেন সিস্টার্স গ্রুপ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ওপেকভুক্ত দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন কমিয়ে এবং দাম বাড়িয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নতজানু করে ফেলল। এই সঙ্কট তুঙ্গে উঠল ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইলকে সমর্থনকারী দেশগুলোতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম রপ্তানী বন্ধ করে দিলো ওপেকভুক্ত দেশগুলো। গোটা পশ্চিমা বিশ্বে শুরু হলো পেট্রোলিয়াম রেশনিং। পেট্রোল পাম্পগুলোর সামনে মাইলকে মাইল দীর্ঘ

গাড়ি লাইন দাঁড়াল। দেখা দিলো এমন এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দাকেও হার মানালো। উন্নত বিশ্ব এক অকল্পনীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি এর আগেই শোচনীয় হয়েছিল। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করার পর দেশটি লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া থেকে নিজের বিপর্যস্ত সৈন্যদের প্রত্যাহার করতে শুরু করেছিল। ওই বছরের শেষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন দ্বিতীয় বারের মত বিজয়ী হলেন। কিন্তু ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি শপথ গ্রহণ করার পর পরই ফাঁস হতে লাগল ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির অবিশ্বাস্য বিবরণগুলো। যখন জ্বালানী সংকট যুক্তরাষ্ট্রকে ভয়াবহভাবে আঘাত হানল তখন মার্কিন কংগ্রেস নিক্সনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে তদন্ত করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্তকারী নিয়োগ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক ব্যর্থতা ও ওয়াটারগেট কেলেংকারি থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের সাথে যুক্ত হলো ভয়াবহ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা। আসলে নিক্সন এমন এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে সময়ে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নয়া যুগের সূচনা ঘটেছিল। সে সময়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলো নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। ওপেকভুক্ত দেশগুলো একই নীতি অনুসরণ করে গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো আমাকে বিমোহিত করেছিল। আমার রুজির একমাত্র উৎস ছিল কর্পোরেটোক্রেসির হুকুম বিনা বাক্য ব্যয়ে তামিল করা। কিন্তু আমার প্রভুগণ নিজেদের তৈরি করা ফাঁদে আটকা পড়ে খাবি-খাচ্ছেন দেখে আমার ভেতরের ছেলেমানুষটি মহা আনন্দে নাচতে শুরু করল। সেই সাথে আমার ভেতরে জমে থাকা অপরাধবোধটিও হালকা হতে লাগল। আমি তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখতে পেলাম যে, টমাস পেইন ওপেককে উৎসাহিত করছেন।

যখন ওপেক জ্বালানী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল তখন কেউই এর প্রকৃত ফলাফলের স্বরূপকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। সঙ্কট কেটে যাওয়ার পর এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে নানা রকম তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হয়েছিল। কিন্তু আশির দশক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সংকটের ফলাফলগুলোকে ঠিক মত বুঝতে পারা যায়নি। জ্বালানী সঙ্কট শেষ হওয়ার পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছিল ঠিকই। কিন্তু এই উন্নয়ন হার ছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উন্নয়ন হারের মাত্র অর্ধেক। সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটার পাশাপাশি এতে দেখা দিলো ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবাদে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে পুরোনো কর্মীদের ছাঁটাই করার উল্টো ঘটনাটি ঘটল। ফলে, গোটা বিশ্বজুড়ে বেকারত্ব তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পেল। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রা বিনিময়ের যে স্থায়ী পদ্ধতিকে গড়ে তোলা হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ল। এতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে অচলাবস্থার উদ্ভব ঘটল।

সেই সময় মধ্যাহ্ন ভোজের অবকাশে বা কাজ শেষে বিয়ার পান করার ফাঁকে আমি প্রায়শই বন্ধুদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম। এদের কেউ কেউ আমার সহকর্মী ছিলেন। আমার বিভাগে যেসব নির্বাহী কাজ করতেন তাদের বেশীর ভাগেই ছিলেন বয়সে নবীন, আচরণে সপ্রতিভ ও চিন্তাধারায় যথেষ্ট উদার। অবশ্য এই উদারতাকে সে যুগের রীতিনীতি অনুযায়ীই পরিমাপ করতে হবে। আমার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন বোস্টনে অবস্থিত তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপকবৃন্দ ও স্টেট সিনেটের সদস্যদের উপদেষ্টাগণ। এসব বৈঠক ছিল অনানুষ্ঠানিক। বেশীর ভাগ সময়ই আমি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেছি। মাঝে মধ্যে ঘরোয়া পরিবেশে বহুজন একত্রিত হয়েছি। তবে সব আলোচনাই ছিল প্রাণবন্ত ও খোলামেলা।

এখন যখন আমি সেসব আলোচনার কথা মনে করি তখন সে সময় আমি মনে মনে নিজেকে অনেক বড় ভাবতাম সেজন্য অপরাধ বোধে আক্রান্ত হই। আমি এমন সব ঘটনার কথা জানতাম যা নিজের সহকর্মী এবং বন্ধুদেরও খুলে বলতে পারতাম না। আমার বন্ধুরা মাঝে মধ্যে তাদের উচ্চ শিক্ষা বা রাজনৈতিক সংযোগ সম্পর্কে হামবড়া ভাব দেখাতেন। আমি এর জবাব দিতাম নিজের উচ্চপদের দাপট দেখিয়ে। একটি আন্তর্জাতিক কনসালটিং ফার্মের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার সুবাদে আমি প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গোটা বিশ্বে ভ্রমণ করেছি। আলোচনা করছি রাষ্ট্রনায়কদের সাথে। এ ব্যাপারটিই আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদের সাথে আমার আলোচনার বিবরণ আমি কাউকেই বলতে পারতাম না। এমনকি বিভিন্ন দেশে আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিত প্রদান করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন এসব ব্যাপার আমাকে অহঙ্কারী করে তুলত। এখন এগুলোর কারণে আমি তীব্র অপরাধবোধে আক্রান্ত হই।

যখন বন্ধুরা ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন আমাকে খুব সাবধানে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে হতো। তখন অন্যরা ঘটনার অন্তরালের ঘটনাকে বুঝতে পারেননি। অথচ আমি জানতাম যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ঘাতক ও শৃগাল বাহিনী ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোকে বেশি দূর যেতে দেবে না। পঞ্চাশের দশকে মোসাদ্দেক ও ষাটের দশকে আর্বেঞ্জের পরিণতি এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে জ্বালানী সঙ্কট গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলল। এরই সুযোগ নিয়ে ওই বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর চিলির সামরিক বাহিনী দেশটির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করল। চিলিয়ান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল অগাস্তো পিনোশে উগার্তে চিলির নতুন প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করলেন। গোটা ঘটনার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল সিআইএ। আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছিলাম যে, ওপেকের উত্থানের পরেও কর্পোরেটোক্রেসি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছিল। এমনকি ওপেক যে গোপনে কর্পোরেটোক্রেসিকে সহযোগিতা করছিল তাও আমি মনে মনে সন্দেহ করছিলাম। আশির দশকের ঘটনাবলী আমার সন্দেহকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে।

আমাদের আলোচনাগুলোতে প্রায়শই ত্রিশের দশক ও সত্তরের দশকের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করা হতো। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ইতিহাসে ত্রিশের দশক ছিল এক যুগ পরিবর্তনকারী ক্রান্তিকাল। তাই একে বহুভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর উৎস ও প্রভাব সম্পর্কে বহু তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। ওই দশকেই জন কিন্স তার "রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা" তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তার মতে, বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। সেই সাথে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, কর্মসংস্থানের মত সমাজকল্যাণমূলক খাতগুলোর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই রাখতে হবে। অথচ বিশের দশক পর্যন্ত জন অ্যাডাম স্মিথের "মুক্তবাজার অর্থনীতি" তত্ত্বকে অনুসরণ করা হয়েছির স্মিথের মতে, বাজার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট। আর এ কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা মোটেও উচিত নয়।

ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দাভাব থেকে উদ্ভব ঘটল নিউ ডিলের। এর ভিত্তি ছিল জন কিন্সের "রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা" তত্ত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট নিউ ডিলের নামে মার্কিন অর্থনীতিতে পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন। তার মধ্যে ছিল বাজারদর, মুদ্রা সরবরাহ ও রাজস্ব আয়-ব্যয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মতো বিষয়গুলো। এছাড়াও অর্থনৈতিক মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবাদে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও গ্যাটের মত সংস্থাগুলোর উদ্ভব ঘটল। পঞ্চাশের দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবল গতি মার্কিন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করল। ষাটের দশকের সুবিপুল অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবারো ফিরিয়ে আনল মুক্তবাজার অর্থনীতিকে। এ ঘটনা ঘটল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকেটে, নির্বাচিত কেনেডি-জনসন প্রশাসনের শাসনামলে (১৯৬১-১৯৬৮)। এজন্য সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এই দুই প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারা।

রবার্ট ম্যাকনামারা দৈহিকভাবে অনুপস্থিত থেকেও আমাদের আলোচনাগুলোর প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তার ধূমকেতু সদৃশ উত্থানের কাহিনী জানতাম। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ছিলেন ফোর্ড মোটর কোম্পানীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা বিভাগের ম্যানেজার। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ওই কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট পদে পদোন্নতি লাভ করলেন। ওই বছরের শেষে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সনকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট পরিণত হলেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ নেওয়ার পর জন এফ কেনেডি রবার্ট ম্যাকনামারাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন।

রবার্ট ম্যাকনামারা কেনেডিকে বোঝালেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতির যে উন্নয়ন ঘটেছে একে ধরে রাখতে হলে মুক্তবাজার তত্ত্ব অনুসরণ করতে হবে। এতে সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের মতো বিরক্তিকর দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। অন্যদিকে মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। সেই সাথে মার্কিন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়ার পথকে খুঁজে পাবে।

সরকারকে এজন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিনিময়ে মার্কিন সরকার মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোর উপরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এক কথায়, রবার্ট ম্যাকনামারা হচ্ছেন কর্পোরেটোক্রেসির মূল উদ্ভাবক।

তিনি পরিসংখ্যান ও গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করে ইন্দোচীনে মার্কিন সৈন্যদের সংখ্যা, এদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের পরিমাণ ও পুরো অপারেশনে অর্থ ব্যয়ের অংক নির্ধারণ করেছিলেন। তার এই ক্ষমতা দেখে প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি, ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। রবার্ট ম্যাকনামারার "আগ্রাসী নেতৃত্ব" তত্ত্ব এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের কর্মকাণ্ড নিরঙ্কুশ গতি লাভ করেছে।

আমাদের আলোচনাগুলোর মূল বিষয় ছিল বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রূপে রবার্ট ম্যাকনামারার কর্মকাণ্ড। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬তম প্রেসিডেন্ট লিন্ডন ব্রেন্ডন জনসন সে বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে নিজ পদ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট জনসন তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারাকে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করলেন। আমার বন্ধুদের মতে, ম্যাকনামারা ছিলেন কেনেডি-জনসন প্রশাসনে সামরিক বাহিনী ও বাণিজ্যিক শিল্পখাতের যোগসূত্রের মূল অনুঘটক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর টানা আট বছর দু'টি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। তারপর বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। তার এই উত্থান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাঝে বিদ্যমান সীমারেখাগুলোকে মুছে ফেলেছে। এ ঘটনা আমার বন্ধুদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। কিন্তু আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারে নি।

আমি এখন বুঝি যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে রবার্ট ম্যাকনামারার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংককে গোটা বিশ্ব জুড়ে ব্যবহার করা। এছাড়াও তিনি তার উত্তরসূরীদের জন্য এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সনের মন্ত্রিসভায় জর্জ শুলজ ছিলেন অর্থমন্ত্রী ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদের চেয়ারম্যান। তার এই দায়িত্ব ৩৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের আমলেও অব্যাহত ছিল। এরপর জর্জ শুলজ বেখটেলের প্রেসিডেন্ট পদটি লাভ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের আমলে শুলজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অর্জন করলেন।

এ রকম উদাহরণ আরো রয়েছে। ক্যাসপার ওয়েনবার্গার ছিলেন বেখটেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের আমলে ওয়েনবার্গার ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। রিচার্ড হেমস ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬তম প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে

সিআইএ'র পরিচালক। ৩৭তম প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমলে হেমস ছিলেন ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। রিচার্ড চেনি ছিলেন ৪১তম প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এরপর চেনি পেলেন হ্যালিবার্টন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট পদটি। তারপর ৪৩তম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের আমলে চেনি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি অর্জন করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র ছিলেন জাপাটা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা। এরপর তিনি ৩৭তম প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমলে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন। ৩৮তম প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের আমলে বুশ সিনিয়র সিআইএ'র পরিচালকরূপে কাজ করেছেন। ৪০তম প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে বুশ সিনিয়র ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট। অবশেষে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্টে পরিণত হলেন।

এখন অতীতের দিকে তাকালে আমি সেদিনগুলোর সহজ সরলতায় বিস্মিত হই। বহু ক্ষেত্রেই আমরা বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের প্রাচীন পন্থাগুলোকেই ব্যবহার করছিলাম। কারমিট রুজভেল্ট মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত ও শাহকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে শ্রেয়তর পন্থাকে উদ্ভাবন করলেন। এরপর এলো অর্থনৈতিক ঘাতকদের যুগ। আমরা বিশ্বের বহু দেশে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যকে অর্জন করেছি। কিন্তু ইন্দোচীনে প্রাচীন পন্থাকে অনুসরণ করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। এজন্য তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের নেতিবাচক মনোভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী দায়ী।

ওপেকের প্রধান সদস্য সৌদি আরব এরপর বিশ্ব রাজনীতির ধারাকে পাল্টে দিলো।

অধ্যায়-১৫
সৌদি আরবের অর্থ পাচারের কাহিনী

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সৌদি আরবের এক কূটনীতিবিদ আমাকে দেশটির রাজধানী রিয়াদের কয়েকটি ফটো দেখিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটিতে ছিল এক সরকারী ভবনের বাইরের ডাস্টবিনে এক পাল ছাগলের আবর্জনা চিবানোর দৃশ্য। যখন আমি তাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম, তখন তার জবাব আমাকে রীতিমত হতবাক করল।

তিনি জবাব দিলেন, "এই ছাগলগুলোই হচ্ছে রিয়াদ মহানগরীর প্রধান আবর্জনা পরিষ্কারকারী। কেননা, কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সৌদি নাগরিকই জঞ্জাল পরিষ্কার করবে না। তাই আমরা এ কাজে ছাগলগুলোকে ব্যবহার করি।"

বিশ্বের বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের অধিকারী দেশটির রাজধানীর আবর্জনা পরিষ্কার করে এক পাল ছাগল! এতো এক কথায় অবিশ্বাস্য।

সে সময় জ্বালানী সঙ্কটের সমাধান করার জন্য যে কনসালট্যান্টদের নিয়োগ করা হয়েছিল, আমি ছিলাম তাদেরই একজন। ছাগলগুলোর ছবি দেখে আমি গত তিন শতাব্দীতে সৌদি আরবের উন্নয়নের ধারাটিকে বুঝতে পারলাম। সেই সাথে জ্বালানী সঙ্কটের সমাধান কী হতে পারে তাও আমার মাথায় ঢুকলো।

সৌদি আরবের ইতিহাস হচ্ছে সহিংসতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কাহিনী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতা মুহাম্মদ বিন সউদ উগ্র ডানপন্থী ওয়াহাবী গোষ্ঠীগুলোর গোঁড়া নেতাদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। এই ঐক্য ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এক জোট। পরবর্তী দুশ' বছরে সউদের পরিবার ও এর ওয়াহাবী মিত্রগণ আরব উপদ্বীপের সিংহভাগ অংশকে জয় করল। বিজিত স্থানগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্মের দুটি পবিত্রতম কেন্দ্র মক্কা ও মদিনা।

সৌদি আরবের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশটির প্রতিষ্ঠাতাদের গোঁড়া আদর্শের উপরে ভিত্তি করে। শুরু থেকেই দেশটির নাগরিকদের উপরে কোরআনের গোঁড়াপন্থী ব্যাখ্যাগুলোকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ধর্মীয় বিশুদ্ধতা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো প্রতিটি সৌদি নাগরিক যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে সেদিকে তীব্র দৃষ্টি বজায় রাখে। সৌদি নারীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত হয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে হয়। যে কোন অপরাধের শাস্তিই নির্মম। প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ ও পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার মতো ব্যাপারগুলো ঘটে।

রিয়াদে আমার প্রথম সফরের সময় গাড়ি চালকের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। সে আমাকে বলেছিল, "আমি বাজারের বাইরে গাড়ি পার্কিং করছি। আপনি অনায়াসে আপনার ক্যামেরা, ব্রিফকেস ও মানিব্যাগ গাড়িতে রেখে যেতে পারেন। গাড়ির দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু কেউ এগুলোকে চুরি করার কথা চিন্তা করবে না। কেননা, এখানে চোরদের ডান হাত কেটে ফেলা হয়।"

ওইদিন বিকেলে সে আমাকে জানালো, "একটু পর শহরের বধ্যভূমিতে একজন দাগী আসামীর মাথা কাটা হবে। আপনি কি তা দেখতে চান?" ওয়াহাবীদের গোঁড়া আদর্শগুলোকে সৌদি সরকার কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে। যারা আইনকে লঙ্ঘন করে তাদেরকে লঘু পাপে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়। তাই দেশটিতে অপরাধের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। একজন জ্যান্ত মানুষের মাথা প্রকাশ্য দিবালোকে কেটে ফেলার দৃশ্য দেখতে হলে মনের জোর প্রচণ্ড হওয়া চাই। আমার মনের জোর অতটা শক্ত ছিল না বলে আমি সবিনয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলাম।

সৌদিরা ধর্মকে রাজনীতি ও অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে মনে করে। এই মনোভাবই ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের জ্বালানী সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবরে ইহুদীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ইয়োম কিপুর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিনই মিশর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ও সিরিয়া উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একযোগে ইসরায়েলকে আক্রমণ করেছিল। এ থেকেই শুরু হলো চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। দ্বিপাক্ষিক ধ্বংসলীলার থেকে বিচার করলে এটিই ছিল ভয়াবহতম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। সেই সাথে এই যুদ্ধই গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে অচল করে তুলেছিল।

প্রথমে দু'দিক থেকে দু'তরফা আঘাত হজম করার পরেও ইসরায়েল পাল্টা আঘাত হেনে মিশর ও সিরিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল। এ কাজে ইসরায়েলকে পুরোপুরিভাবে সহায়তা করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-সামরিক সহযোগিতা। যুদ্ধের ময়দানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের উপরে চাপ দিলেন তৈলাস্ত্র প্রয়োগের জন্য। ১৬ই অক্টোবরে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত ও বাহরাইন একযোগে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের মূল্য ৭০% বৃদ্ধি করল।

কুয়েত শহরে বসল ওই ৭টি দেশের জ্বালানী মন্ত্রীদের বৈঠক। তারা পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ইরাকের জ্বালানী মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের উপরে কঠোর চাপ প্রয়োগের পক্ষে তীব্রভাবে মত ব্যক্ত করলেন। তিনি প্রত্যেক আরব দেশে মার্কিন ব্যবসাগুলোকে জাতীয়করণ করতে বললেন। যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম রপ্তানী বন্ধ করে দিতে বললেন। প্রতিটি আমেরিকান ব্যাংক থেকে আরবদের অর্থ উত্তোলন করতে বললেন। তার মতে, আমেরিকান ব্যাংকগুলোতে বিপুল অংকের আরবী অর্থ জমা রয়েছে। এই অর্থ উত্তোলন করা হলে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের মতো মার্কিন অর্থনীতিতে ধস নামবে।

অন্যান্য আরব দেশের জ্বালানী মন্ত্রীরা ইরাকের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। ১৭ই অক্টোবর তারা সীমিত আকারের জ্বালানী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে ৫% কম অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা হবে। এরপর তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে আগের মাসের তুলনায় পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের পরিমাণ ৫% করে কমানো হবে। ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে জ্বালানী নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার জন্য তারা একমত হলেন। বৈঠক শেষে ইরাক জানাল যে, সে প্রতি মাসে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ১০% করে কমাবে। সেই সাথে ইরাক যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম রপ্তানী করবে না।

১৯শে অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইসরায়েলকে ২২০ কোটি ডলারের সাহায্য প্রদানের বিল মার্কিন কংগ্রেসে প্রেরণ করলেন। ২০ শে অক্টোবর আরব রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম রপ্তানী পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিলো।

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮-ই মার্চ পেট্রোলিয়াম নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাহার করা হলো। মাত্র পাঁচ মাস এটি টিকে ছিল। কিন্তু এর প্রভাব হলো সুদূর প্রসারী। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী বিশ্ব বাজারে এক ব্যারেল সৌদি পেট্রোলিয়ামের মূল্য ছিল ১.৩৯ ডলার। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি বিশ্ব বাজারে এক ব্যারেল সৌদি পেট্রোলিয়ামের মূল্য দাঁড়ালো ৮.৩৪ ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ ও ভবিষ্যৎ প্রশাসকগণ জ্বালানী নিষেধাজ্ঞার ফলাফলকে কোনদিনও ভুলতে পারেননি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই বন্ধন এখনও অটুট রয়েছে।

জ্বালানী নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহলের মানসিকতা ও নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো। ওয়াশিংটন ও ওয়াল স্ট্রীট আর কোন জ্বালানী নিষেধাজ্ঞাকে না মানার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজ জ্বালানী সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টি সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের পর তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে পরিণত হলো। নিষেধাজ্ঞার সুবাদে সৌদি আরব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশাল মর্যাদা অর্জন করল। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্র নিজ অর্থনীতিতে সৌদি আরবের গুরুত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হলো। এছাড়াও কর্পোরেটোক্রেসির নেতাগণ কিভাবে পেট্রো ডলারকে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনা যায় সেই পরিকল্পনা উদ্ভাবনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য এজন্য তাদেরকে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। কেননা, নিজ ঐশ্বর্যকে ঠিক মতো কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো সৌদি আরবের নেই। এটাই যুক্তরাষ্ট্রের কাজকে সহজ করে তুলল।

সৌদি আরবের জন্য পেট্রোলিয়ামের মূল্য বৃদ্ধি থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থ মিশ্র ফল বয়ে নিয়ে এলো। দেশটির জাতীয় তহবিলে কোটি কোটি ডলার জমা হতে লাগল। সেই সাথে ওয়াহাবীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কঠোরতা ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকল। সৌদি

ধনকুবেরগণ গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করতে শুরু করলেন। তাদের সন্তানেরা পশ্চিমা বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করল। সৌদি উচ্চবিত্তগণ বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে লাগলেন। গোঁড়া ধর্মীয় আদর্শের স্থান বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদ দখল করতে থাকল। আর এটাই ভবিষ্যতে নতুন জ্বালানী সঙ্কট তৈরি হওয়ার পথকে রুদ্ধ করল।

পেট্রোলিয়াম নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের সাথে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করল। ওয়াশিংটন রিয়াদকে কারিগরি সহায়তা, সামরিক উপকরণ ও প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যুগে প্রবেশের সুযোগ দিতে চাইল। বিনিময়ে আমেরিকা পুনরায় তৈলাস্ত্র প্রয়োগ না করার নিশ্চয়তা পেতে চাইল। আমেরিকা অবশ্যই সৌদি আরবকে উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করবে পেট্রো ডলারের বিনিময়ে। এসব আলোচনা থেকে উদ্ভব ঘটল এক ব্যতিক্রমী সংগঠনের। এর পোশাকী নাম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র – সৌদি আরব যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন। সংক্ষেপে এটি জেকর নামে পরিচিত। বৈদেশিক ঋণ প্রদান ও গ্রহণের প্রচলিত নীতির ব্যতিক্রম ঘটল এক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের অর্থেই সৌদি আরবকে আধুনিক দেশ রূপে গড়ে তুলবে।

জেকরের পুরো প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে। তারপরেও কমিশনটির মার্কিন কর্মকর্তারা পুরোপুরি স্বাধীনভাবেই কাজ করতেন। এক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেস কোনরকম তদারকি করতে পারত না। কেননা, জেকরের কোন কর্মকাণ্ডেই মার্কিন সরকারকে কোনদিনও অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। তাই টানা ২৫ বছর জেকর সৌদি আরবকে আধুনিকায়নের কাজে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে পেরেছে। সংগঠনটির কার্যক্রমকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষার পর ডেভিড হোল্ডেন ও রিচার্ড জোন্স মন্তব্য করেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোন উন্নয়নশীল দেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে এই চুক্তিটি হচ্ছে, পুরোপুরিভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল হয়েছে। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে সৌদি আরবে নিজ প্রভাবকে বিস্তার করতে পেরেছে।"

একেবারে শুরু দিকেই মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় মেইনকে উপদেষ্টারূপে নিয়োগ করেছিল। মেইনের কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালেন যে, আমার দায়িত্ব হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্ব পালনের সময় আমি যা জানবো ও করব তা অবশ্যই অন্যদের কাছে গোপন রাখতে হবে। আমার পর্যায় থেকে এটিকে একটি গোপন মিশন বলে মনে হয়েছিল তখন। শুরুতে আমি ধারণা করেছিলাম যে, এক্ষেত্রে মেইনকে প্রধান কনসালট্যান্ট রূপে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গোড়া থেকেই পুরো কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। তাই মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য সংস্থার আলোচনা সম্পর্কে আমি এখন পর্যন্ত কিছুই জানি না। তাই আমি এই ব্যতিক্রমী চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। তবে আমি এতটুকু জানি যে, জেকর অর্থনৈতিক ঘাতকদের ভূমিকায় এক নতুন মাত্রাকে যোগ করেছিল। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন কলাকৌশলও যুক্ত হয়েছিল। আমি এটাও জানি যে, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই আমার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছিল। মেইন সৌদি আরবের কয়েকটি লাভজনক প্রকল্পকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছিল। সে বছর আমি আমার কর্ম জীবনের সবচেয়ে বড় বোনাসটি পেয়েছিলাম।

আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল সৌদি আরবের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বিপুল অংকের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাব্য ফলাফল নির্ধারণ করা। সেই সাথে কোন কোন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্বও আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক কথায়, আমাকে সৌদি আরবের অর্থনীতিতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। এই অর্থের সিংহভাগই যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলী ও নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর তহবিলে জমা হয়েছে। এই দায়িত্ব আমাকে একাকি পালন করতে হয়েছে। কোন অধীনস্থ কর্মচারীর সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মেইনের সদর দপ্তর ভবনের যে তলায় আমার বিভাগটি ছিল এর কয়েক তলা উপরের একটি ঘরে বসে আমি এই কাজটি করেছি। কেননা, আমি জানতাম যে, এই কাজটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে তা মেইনের জন্য অত্যন্ত লাভজনক।

আমার অন্যান্য মিশনের চেয়ে সৌদি মিশনটি সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল। এর আগে আমার দায়িত্ব ছিল একটি দেশকে এমনভাবে ঋণের জালে আবদ্ধ করা যাতে করে দেশটি এই জাল কেটে বেরিয়ে না আসতে পারে। কিন্তু সৌদি মিশনে আমার দায়িত্ব ছিল সৌদি আরবের পেট্রো ডলারকে যুক্তরাষ্ট্রের তহবিলে পৌঁছে দেওয়া। এতে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। সৌদি অর্থনীতি মার্কিন অর্থনীতির উপরে নির্ভরশীল হবে। সৌদি নাগরিকগণ পশ্চিমা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। সৌদি আরবের পররাষ্ট্র নীতি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে অনুকরণ করবে।

কাজ শুরু করে বুঝতে পারলাম যে, রিয়াদের রাজপথে ছাগল দলের চরে বেড়ানো হচ্ছে সৌদি আরবের পিছিয়ে থাকার প্রতীক। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ানো সৌদি ধনকুবেরদের জন্য এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপারও বটে। আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক এই মরুভূমিময় রাজতান্ত্রিক দেশটিতে আবর্জনা পরিষ্কারের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় হয়েছে। আমি জানতাম যে, ওপেকভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিবিদগণ জ্বালানী সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোকে পেট্রোলিয়াম শিল্প শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার ব্যক্ত করছিলেন। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের চেয়ে পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের মূল্য বেশী। আবার পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের চেয়ে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যগুলোর মূল্য বেশী।

তাই জ্বালানী সম্পদের অধিকারী আরব দেশগুলোর অর্থনীতিবিদগণ এসব দেশকে নিজস্ব পেট্রোলিয়াম শিল্প গড়ে তোলার জন্য বার বার আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

এই দ্বৈত উপলব্ধি এমন এক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে উদ্ভাবন করল, যা সকল পক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল। শুরু হলো রিয়াদের রাজপথ থেকে ছাগলগুলোকে হটানো দিয়ে। সৌদি আরবের পেট্রো ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আবর্জনা পরিষ্কারকারী সংস্থাগুলোকে ভাড়া করা হলো। এসব সংস্থা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিয়াদের আবর্জনার স্তূপগুলোকে একেবারে নির্মূল করল। দ্রুত এই ব্যবস্থা সৌদি আরবের অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। দেশটির সকল পর্যায়ের নাগরিকদের বুক একেবারে গর্বে ফুলে উঠল।

আমি রিয়াদের রাজপথে চরে বেড়ানো ছাগলগুলোকে সমীকরণের এক দিক হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। এই সমীকরণটি সৌদি আরবের অর্থনীতির বেশীর ভাগ খাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সমীকরণটির সঠিক সমাধানের উপরেই দেশটির রাজ পরিবার, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় ও মেইন কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি নির্ভর করছিল। আবার সমাধানটি নির্ভর করছিল অপরিশোধিত পেট্রোরিয়াম থেকে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করার শিল্প স্থাপনের উপরে। এসব শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস ছিল সৌদি সরকার। নির্জন মরুভূমিতে গড়ে উঠবে বিশালাকার সব পেট্রোলিয়াম শিল্পকেন্দ্র। আর এসব কেন্দ্রের চারপাশে গড়ে উঠবে বিশালাকার সব পেট্রোলিয়াম শিল্পকেন্দ্র। আর এসব কেন্দ্রের চারপাশে গড়ে উঠবে বিপুলাকার শিল্পাঞ্চল। এ ধরনের পরিকল্পনাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলোকে আগে নির্মাণ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং সরবরাহ লাইন ও বিতরণকেন্দ্র স্থাপন। এছাড়াও রাজপথ, পাইপলাইন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে। সেই সাথে ব্যাংক, বীমা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনকেন্দ্র ও পুলিশ স্টেশনের মত সেবামূলক খাতগুলোকেও চালু করতে হবে। এর পাশাপাশি এগুলোকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলোকেও স্থাপন করতে হবে।

এই সুবিপুল পরিকল্পনার ছক আঁকার সময় ছাগলগুলোর কথা আমি চিন্তা করতাম। সেই সাথে সৌদি কূটনীতিবিদের উক্তি "কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সৌদি নাগরিকই জঞ্জাল পরিষ্কার করবে না" আমার কানে বাজতো। এ ধরনের বহু মন্তব্য আমি সৌদি নাগরিকদের মুখে বহুবার শুনেছি। এ থেকে আমি একটি কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। সৌদি সরকার নিজ নাগরিকদের কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করতে দিতে রাজি নয়। এমনকি সৌদি নাগরিকগণও দৈহিক শ্রম নির্ভর কোন কাজ করতে রাজি নয়। এই মনোভাবের প্রধান কারণ দু'টি। এক. সৌদি আরবের জনসংখ্যা নিতান্তই কম। দুই. সৌদি রাজ পরিবার নিজ প্রজাদের উচ্চ শিক্ষালাভ ও বিলাসী জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সৌদি নাগরিকগণ ব্যবস্থাপক হবে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের মতো কাজ করবে না। তাই অন্যান্য দেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানীর পদক্ষেপ নেওয়া হলো। এজন্য এমন সব দেশকে বেছে নেওয়া হলো যেসব দেশে বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশী ও শ্রমিকের মজুরী অত্যন্ত সস্তা। তাই সৌদি সরকার বেছে নিল মধ্যপ্রাচ্যের দরিদ্র

রাষ্ট্র ও গরীব মুসলিম দেশগুলোকে। মিশর, পাকিস্তান, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিন ছিল শুরুর দিকের শ্রমশক্তির প্রধানতম উৎস।

বাইরে থেকে শ্রমশক্তি আমদানির নীতি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধিকে আরো বড় করে তুলল। বিদেশী শ্রমিকদের জন্য বিশালাকার আবাসন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এসব কেন্দ্রে শ্রমিকদের কলোনী, সুপার মার্কেট, হাসপাতাল, পুলিশের থানা, দমকল স্টেশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র, পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যাট, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিনোদনকেন্দ্র থাকবে। এসব কর্মকাণ্ডের সুবাদে মরুভূমিতে গড়ে উঠবে চোখ ধাঁধানো আধুনিক শহরগুলো। এসব শহরে চালু করা হবে নোনা পানিকে মিঠা পানিতে রূপান্তরের কেন্দ্র, মাইক্রোয়েভ সিস্টেম ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মত ব্যয়বহুল স্থাপনাগুলোকে। সেই সাথে থাকবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো।

সেই সময়ের সৌদি আরব ছিল একজন পরিকল্পনাবিদের জন্য স্বপ্নপুরী। সেই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণ ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল অকল্পনীয় রকমের লাভজনক এক দেশ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আর কখনও দেখা যায়নি। গোটা বিশ্বজুড়ে পেট্রোলিয়াম বিক্রির সুবাদে অবিশ্বাস্য রকমের ধনী একটি দেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজের পশ্চাদপদতাকে ঝেড়ে ফেলে আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে চাইছে।

এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আমাদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। উন্নত ও আধুনিক সৌদি আরব বাকি বিশ্বের কাছে উন্নয়নের আদর্শ হয়ে থাকবে। তখন বিশ্ব ভ্রমণকারী সৌদি ধনকুবেরগণ অন্যান্য দেশে আমাদের প্রশংসা করে বেড়াবেন। তাদের প্রশংসায় প্রলুব্ধ হয়ে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ সৌদি আরব সফর করে নিজেদের চোখে সবকিছু দেখে বিমোহিত হবেন, তখন তারা আমাদেরকে ডেকে পাঠাবেন নিজেদের দেশকে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে। এতে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো মূলত সৌদী মডেলকে অনুসরণ করেই আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে।

এই কাজটিকে আমি যে উপভোগ করেছি তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। ইকনোমেট্রিক মডেল ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভরশীল তথ্য সৌদি আরব, বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরী ও অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় নি। একটি ধনী অথচ আদিমযুগের দেশকে আধুনিক যুগে উত্তরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। এ ধরনের কাজের জন্য চাই সাম্প্রতিককালের তথ্য। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিবরণ এক্ষেত্রে মূল্যহীন। তাই আমাকে বাধ্য হয়েই পরিকল্পনার পরীকে নিয়ে কল্পনার ফানুস উড়াতে হয়েছে।

আসলে পরিকল্পনা প্রণয়নের আদি পর্বে কেউই তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণকে আশা করেননি। তাই আমি নিজের কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে সৌদি আরবের উন্নয়ন পরীর তিলোত্তমা ছবিগুলোকে মনের সুখে এঁকেছি। অবশ্য সেজন্য আমাকে কতকগুলো প্রামাণ্য তথ্য ব্যবহার করতে হয়েছে। একেবারে কিছু নেই এমন একটি দেশে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, এক মাইল সড়ক নির্মাণ এবং একজন শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান,

পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী, খাদ্য ও অন্যান্য সেবামূলক ব্যবস্থা করার জন্য প্রযোজ্য প্রারম্ভিক তথ্যগুলোকে অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে হয়েছে। আমি এসব প্রাক্কলনকে চূড়ান্তরূপে কখনই গণ্য করিনি। কোন সময়েই এসব প্রাক্কলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানি নি। আমার কাজ ছিল, যা করা সম্ভব তার রূপরেখা প্রণয়ন করা। এসব রূপরেখাকে অনেকটা দূরদর্শনও বলা যেতে পারে। সেই সাথে এসব দূরদর্শনকে বাস্তবায়নকে ব্যয়গুলোকেও রূপরেখায় অন্তর্ভূক্ত করাও ছিল আমার কর্তব্য।

রূপরেখা প্রণয়নের মূল লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে আমি সবসময়ই সচেতন ছিলাম। এক. মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে প্রচুর পরিমাণে লাভবান করা। দুই. সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখা। এই দু'টি লক্ষ্যের মধ্যকার সম্পর্ককে আবিষ্কার করার জন্য আমাকে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। প্রতি প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পর একে ক্রমাগত ভাবে কার্যকর ও উন্নয়ন মূলক পর্যায়ে ধরে রাখতে হবে। এসব প্রকল্প কারিগরী দিক থেকে অতি উঁচু পর্যায়ের ছিল। তাই এগুলো থেকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সুফল পেতে হলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কর্মকাণ্ড বজায় রাখতে হবে। তাই আমার কাজ যত এগুতে থাকল তত আমি প্রতিটি সম্ভাব্য প্রকল্পকে দু'ভাগে ভাগ করতে লাগলাম। প্রথম ভাগে থাকল প্রকল্পগুলোর নকশা প্রণয়ন ও এগুলোকে বাস্তবায়নের সম্ভাব্য চুক্তিগুলো। দ্বিতীয় ভাগে থাকল প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের পর দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এগুলোকে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা করার সম্ভাব্য চুক্তিগুলো। দুই ধরনের চুক্তি থেকেই লাভবান হবে মেইন, বেখটেল, ব্রাউন অ্যান্ড রুট, হ্যালিবার্টন, স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার-এর মতো মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো। তাও আবার যুগ-যুগান্তরের জন্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাইরে আরও একটি কারণ ছিল, যা সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশটির আধুনিকায়ন এর ভেতরের ও বাইরের গোঁড়া মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ করে তুলবে। অন্যদিকে ইসরায়েলসহ প্রতিবেশী দেশগুলো সৌদি আরবের আধুনিকায়নে ভীত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সৌদি আরবের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরব উপদ্বীপকে সকল প্রকার ভীতি থেকে রক্ষা করার কার্যক্রমকে জোরদার করে তুলবে। এতে লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ও মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত সরকারী-বেসরকারী গোয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। এ ক্ষেত্রেও প্রথম কাজ হবে প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করা। এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ এসব স্থাপনার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কর্মকাণ্ড বজায় রাখতে হবে। সেই সাথে এসব স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো যেমন আবাসন, শমিংমল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী, বিনোদনকেন্দ্র, আদালত, ডাকঘর, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়ক, সেতু, বিমান ও সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে হবে। এরপর দীর্ঘমেয়াদী এসব অবকাঠামোকে সংরক্ষণ করতে হবে। কেননা, এসব স্থাপনায় কর্মরত মার্কিন নাগরিকগণ কোন সৌদি অবকাঠামোকে ব্যবহার করবেন না। এমনকি তাদের ক্ষেত্রে সৌদি আইন-কানুনও প্রযোজ্য হবে না। এক কথায়, এসব স্থাপনা হবে সৌদি আরবের ভেতরে আলাদা কয়েকটি ক্ষুদে যুক্তরাষ্ট্র।

আমি আমার প্রতিবেদনগুলোকে সীলমোহর করা খামে ভরে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক ডাকের মাধ্যমে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠালাম। খামগুলোর উপরে প্রাপকের ঘরে লেখা থাকত "অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপক" কথাটি। মাঝে মধ্যে আমি রূপরেখা যাচাইকারী দলের সাথে আলোচনা করতাম। এই দলের বেশীর ভাগ সদস্যই ছিলেন আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ মেইনের কয়েকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার কাজটি তখনও গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়ভুক্ত ছিল। তখনও তা জেকরের কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক নামও ছিল না। এজন্য আমরা এর নাম দিয়েছিলাম "সৌদি অ্যারাবিয়ান মানি লন্ডারিং অ্যাফেয়ার" বা "সৌদি আরবের অর্থ পাচার। সংক্ষেপে একে "সামা" বলে ডাকা হতো। মজার ব্যাপার এই যে, সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ছিল "সৌদি অ্যারাবিয়ান মনেটারি এজেন্সি।" সৌদি ব্যাংকাররা এটিকে সংক্ষেপে 'সামা' বলে ডাকতেন। এজন্য আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডকে 'সামা' নামে ডাকতাম একেবারে গোপনীয়ভাবে।

কখনও কখনও আমাদের বৈঠকে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি যোগ দিতেন। আমি এ সমস্ত আলোচনার সময়ে কখনও কখনও প্রশ্ন করে বিভিন্ন পর্যায়ের লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতাম। প্রধানত আমার দায়িত্ব ছিল নিজের প্রতিবেদনগুলোকে উপস্থাপন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মাফিক এগুলোকে সংস্কার করা। তবে আমার রূপরেখার মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ সৌদি আরবে লাভজনক প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোকে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা করা। মেইনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের পরমভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। একটি বৈঠকে মেইনের এক ভাইস প্রেসিডেন্ট চোখ বুঁজে স্বপ্নীল ভঙ্গিতে বলেই ফেললেন, "তবে, বুড়ো বয়সেও আমরা এই গরুকে দোহন করতে পারব।" কথাটা শোনা মাত্রই আমার মনে পড়ল রিয়াদের রাস্তাগুলোতে চরে বেড়ানো ছাগলগুলোর কথা। আমার মুখে অবশ্য ফুটে উঠল মৃদু নির্বাক তোষামুদে হাসি। এরপর থেকে পরবর্তী বৈঠকগুলোতে সৌদি আরবের নতুন উপাধিটি পুরোদমে চালু হয়ে গেল।

এসব বৈঠকের সময়ই আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, মেইনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলোও একই ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। শেষ অবধি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সৌদি আরবে লাভজনক প্রকল্পগুলোতে বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে। এজন্যই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদগণ ঠিক আমার মতই সৌদি উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন করছেন। এই পর্যায়ে মেইন ও সহধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব প্রারম্ভিক কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার বহন করছে। এই সীমিত ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদী ভাবে লাভবান হওয়ার পথকে প্রশস্ত করছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হলো একটি কারণে। আমার এই কাজ ছিল দৈনন্দিন দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব। তাই এই কাজের হিসাব ব্যক্তিগত হিসাবের পাতায় সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্বের অতিরিক্ত কলামে লিখতে হতো। বেশীর ভাগ প্রকল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়ভুক্ত কাজের হিসাব এভাবেই রেকর্ড করা হতো। কিন্তু সৌদি উন্নয়ন প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন করার জন্য আমাকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছিল তা অতীতের তুলনায় অনেক বেশী। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিপুল অংকের লাভ অর্জনের ক্ষেত্রে মেইন ছিল পুরোপুরিভাবে সুনিশ্চিত।

একই ধরনের কাজ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে করছে। তারপরও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র ছিল পুরোপুরি ভাবে আলাদা। এই কাজে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কাজের কতটুকু মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে তা বোঝা যাবে আমরা যে পুরস্কার পাব তার পরিমাণ থেকে। যে প্রতিষ্ঠানের রূপরেখার যতবেশী অংশ গ্রহণ করা হবে সেই প্রতিষ্ঠান ততবেশী লাভজনক প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে। তাই আমি এই কাজকে আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। মেইনে আমার খ্যাতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সাথে মেইন আমার এক বৃহৎ অংশীদারে পরিণত হচ্ছিল।

বৈঠকগুলোতে "সামা" ও "জেকর" যে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে সে বিষয়ে আমরা খোলামেলাভাবে আলোচনা করতাম। যে সব দেশের প্রচুর সম্পদ ও ঐশ্বর্য রয়েছে, যাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর ঋণের প্রয়োজন নেই, সেসব দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সামা-জেকর মডেল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বজায় রাখার এক সৃজনশীল পদ্ধতি। এছাড়াও মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমকালীন সফল পদ্ধতিকে যতটা সম্ভব অনুকরণ করা। তাই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ধনী ও অনুন্নত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ যে সৌদি আরবকে অনুসরণের জন্য অনুপ্রাণিত হবে তা বলাবাহুল্য মাত্র। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের জ্বালানী নিষেধাজ্ঞাকে প্রথমে নেতিবাচক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এ থেকেই উদ্ভব ঘটল মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের। সেই সাথে বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের কর্মকাণ্ডও আরও ব্যাপক হলো।

টানা আট মাস আমি সৌদি উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নের কাজ করেছি। তবে এক সাথে কয়েকদিনের জন্য একেবারে মাথা খাটিয়েছি। এজন্য মেইনের সদর দপ্তরে আমাকে একটি বিশেষ কক্ষ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি নিজ অ্যাপার্টমেন্টেও যখনই এই কাজের ভূত মাথায় চেপেছে তখনই আমি কাজ করেছি। আমার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগের কর্মচারীগণ তাদের দৈনন্দিন দায়িত্বগুলোকে সুচারুরূপে পালন করেছে। আমি মাঝে মধ্যে নিজ বিভাগের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নিয়েছি। ধীরে ধীরে আমার কাজের গোপনীয়তা শিথিল হতে লাগল। আস্তে আস্তে মেইনের বেশির ভাগ কর্মীই জানতে পারল যে, সৌদি আরব সম্পর্কে বড় একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। উত্তেজনা বাড়ল, গুজব ছড়াল। মেইনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ কথাবার্তা খোলামেলাভাবে বলতে লাগলেন। কেননা, সৌদি উন্নয়নের রূপরেখার বিস্তারিত চিত্র তাদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুঃসাহসী করে তুলেছিল।

এই রূপরেখা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ছিল দু'টি। এক. যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব থেকে পেট্রোলিয়াম সরবরাহের নিশ্চয়তা পেতে চেয়েছিল। এর মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে কোন অসুবিধা নেই। তবে তা সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যদি ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, ভেনিজুয়েলা বা অন্যান্য দেশ জ্বালানী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে বিশ্বের বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারক দেশ সৌদি আরব সেই নিষেধাজ্ঞাকে নস্যাৎ করে দেবে। আর এটাই অন্যান্য পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারক দেশকে

জ্বালানী নিষেধাজ্ঞা আরোপের নীতি গ্রহণ থেকে বিরত রাখবে। দুই, এর বিনিময়ে সৌদি আরব পাবে নিজের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা। আর এই সহযোগিতাই সৌদি আরবে সউদ পরিবারের শাসনের দীর্ঘস্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করবে।

সৌদি আরবের ভৌগলিক অবস্থান, এর সামরিক শক্তিহীনতা ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোর মানসিকতার কারণেই সউদ পরিবার মার্কিন পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। সৌদি আরবের প্রতিবেশীরা হচ্ছে ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও ইসরায়েলের মত আগ্রাসী দেশগুলো। সৌদি আরবের সীমান্ত বরাবর কোন প্রাকৃতিক বাধার প্রাচীর নেই। দেশটির সামরিক বাহিনীর অস্তিত্ব রয়েছে শুধু মাত্র সৌদি সরকারের খাতাপত্রে। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের উপরে এমন একটি শর্ত আরোপ করল, যা গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক ঘাতকদের কর্মকাণ্ডকে পাল্টে দিলো। পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বের ধনী অথচ অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রেও একই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। তবে ইরাক এক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সেই কাহিনী পরে বলা হবে।

সেই সময় সৌদি আরব কেন এই শর্তকে মেনে নিয়েছিল তা এখনও বুঝতে আমার কষ্ট হয়। মুসলিম বিশ্বের ধনাঢ্য দেশগুলো, বিশেষ করে ওপেকভুক্ত মুসলিম দেশগুলো, আরও বিশেষ করে আরব জাহানের পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ দেশগুলো এই শর্তের কথা শুনে ও যেভাবে সৌদি আরব এই শর্তকে মেনে নিয়েছে তা জানতে পেরে ঘৃণায় নিথর হয়ে গিয়েছিল। তাই ইরাক ও লিবিয়া এর টোপ গিলতে রাজি হয়নি। এর খেসারত দু'টি দেশকেই কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করতে হয়েছে পরবর্তীকালে।

"এবার শর্তটির কথা বলা যাক। সৌদি আরব নিজের পেট্রো ডলার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণপত্রগুলোকে কিনবে। এসব ঋণপত্রের সুদকে ব্যয় করে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় সৌদি আরবকে মধ্যযুগীয় দেশ থেকে একটি আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে। অর্থাৎ মার্কিন বাজারে সৌদি পেট্রোলিয়ামকে বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা মার্কিন ব্যাংকগুলোতে জমা রাখা হবে। মার্কিন ব্যাংকগুলো সৌদি আরবের পক্ষে এই অর্থ দিয়ে মার্কিন সরকারের ঋণপত্রগুলোকে কিনবে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের পক্ষে এসব ঋণপত্রের সুদ দিয়ে মার্কিন কনসালট্যান্সি ফার্মগুলোকে ভাড়া করবে। আর এসব প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখাকে প্রণয়ন করবে। এক কথায়, ইলিশ মাছের তেল দিয়ে ইলিশ মাছকে ভাজার এক চমৎকার ফন্দি।"

কূটনৈতিক ভব্যতা অনুযায়ী সৌদি আরব নিজ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর চরিত্রকে নির্ধারণ করার ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, এক দল বিদেশী বিশেষজ্ঞ আরব উপদ্বীপের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করবেন। মুসলমানদের কাছে এসব বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বেশীর ভাগেই হচ্ছে ইহুদী ও নাসারা। অথচ এসব ইহুদী ও নাসারাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন ঘটবে এমন একটি দেশের, যে দেশটিতে গত তিন শতাব্দী ধরে রক্ষণশীল ওয়াহাবী মতবাদ নিরঙ্কুশ ভাবে কর্তৃত্ব

করেছে। তারপরও গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি সৌদি আরবকে বাধ্য করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে। অথচ এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিশ্বাসে আঘাত লাগারই কথা।

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ থেকে বিপুল অংকের লাভ অর্জনের সম্ভাবনা ছিল সীমাহীন। এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি ছিল এক বিপুল সম্ভাবনা। সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল এই যে, এক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর সব ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মতোই মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোও কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা করতে মোটেও রাজি নয়। বিশেষ করে মেইন, বেখটেল, রুটস অ্যান্ড ব্রাউন, হ্যালিবার্টন ও স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার-এর মত বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো সরকারী নজরদারীকে মোটেও পছন্দ করে না। মিডল ইস্ট ইন্সটিটিউটের একজন গবেষক ও প্রাক্তন সাংবাদিক টমাস ডব্লিউ লিপম্যান চমৎকার ভাবে এই চুক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেনঃ

"সীমাহীন অর্থের সাগরে ভাসমান সৌদি আরব মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে কোটি কোটি ডলার পাঠাবে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজন মাফিক সৌদি অর্থকে অবমুক্ত করবে। আর এই অর্থ যাবে মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর তহবিলে। এক কথায় সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে যা আয় করবে তা মার্কিন অর্থনীতিতেই ফিরে যাবে। এতে জেকরের ব্যবস্থাপকগণ সৌদি আরবের অনুমোদন মোতাবেক যে কোন প্রকল্পকে বাস্তবায়নের কাজে হাত দিতে পারবেন। অথচ এজন্য মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হবে না।"

অকল্পনীয় রকমের কম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে এই সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর আমাদের কাজ ছিল এই সমঝোতাকে বাস্তবায়নের পথকে খুঁজে বের করা। সৌদি আরবের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার জন্য নিক্সন প্রশাসনের এমন এক শক্তিশালী সদস্যকে রিয়াদে পাঠানো হয়েছিল। এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই। তবে খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার।

তার প্রথম কাজ ছিল প্রতিবেশী ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক দেশটি থেকে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে উৎখাত করতে চাওয়ায় কী ঘটেছিল তা সহজভাবে সৌদি আরবের রাজ পরিবারকে বোঝানো। এরপর মার্কিন মন্ত্রী এমন এক পরিকল্পনা পেশ করলেন যা প্রত্যাখান করা সৌদ পরিবারের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না। কেননা, সউদ পরিবারের হাতে আর কোন বিকল্প পন্থাও ছিল না। এক্ষেত্রে আমার একটি নিজস্ব ধারণা রয়েছে। খুব সম্ভবত মার্কিন মন্ত্রী সে সময়কার সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলকে বলেছিলেন যে, মার্কিন প্রস্তাবকে মেনে নিলে দেশটিতে সউদ পরিবারের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে। নতুবা তাদেরকে মোসাদ্দেকের পরিণতি ভোগ করতে হবে। মার্কিন মন্ত্রী ওয়াশিংটনে ফিরে গেলেন অত্যন্ত খুশি মনে। কেননা, সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছে।

এরপরেও ছোট্ট একটি বাধা থাকল। সউদ পরিবারের সদস্যদের রাজি করানোর দায়িত্ব চাপল মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর উপরে। আর সংস্থাগুলো তাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধিদের উপরে এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিলো। এই প্রথম বারের মতো আমরা জানতে পারলাম যে, সৌদি বাদশাহ হচ্ছেন সউদ পরিবারের স্বীকৃত প্রধান। কিন্তু তাকে পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মতামত অনুযায়ী সরকার ও দেশকে পরিচালনা করতে হয়। সৌদি আরব গণতান্ত্রিক দেশ নয়। কিন্তু সউদ পরিবারে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্বসম্মতভাবে।

১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে সউদ পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে। প্রথম পরিচয়ের সময় তার নাম রাজপুত্র ডব্লিউ বলে জানান হলো। তবে তিনি শুধু রাজপুত্র, না যুবরাজ-তা আমি কখনই জানতে পারি নি। আমার কাজ ছিল 'সামা' থেকে সৌদি আরব সামগ্রিকভাবে ও তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন তা তাকে বোঝানো।

"কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। রাজপুত্র ডব্লিউ শুরুতেই নিজেকে এক কট্টর ওয়াহাবী বলে ঘোষণা করলেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, ইসলামের পবিত্র জন্মভূমিতে পশ্চিমা মতবাদকে তিনি শেকড় গেঁড়ে বসতে দেবেন না। তিনি সজোরে দাবি করলেন যে, আমাদের প্রস্তাবের মূল অর্থ যে কি তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। প্রায় এক হাজার বছর আগের খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের মতোই আমরাও আরব জাহানে খ্রীস্টান ধর্মকে প্রচার করতে চাইছি। তার বক্তব্যের সাথে আমি মনে মনে একমত হলাম। আসলেও দ্বাদশ শতাব্দীর খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সাথে বিংশ শতাব্দীর মার্কিন ব্যবসায়ীদের তেমন একটা পার্থক্য নেই। মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রীস্টান বাহিনীগুলো মুসলমানদের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। আর এখন আমরা চাইছি সৌদি আরবকে আধুনিক যুগে নিয়ে যেতে। আসলে মধ্যযুগের খ্রীস্টান ইউরোপ চেয়েছিল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে। এ যুগের মার্কিন কর্পোরেটোক্রেসিও চাইছে গোটা বিশ্বকে নিজের সাম্রাজ্যে পরিণত করতে।

রাজপুত্র ডব্লিউয়ের কথাবার্তা শুনে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে গেলাম আমি প্রথম দিনে। এরপর এক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তার দুর্বলতার খবর পেলাম। সোনালী চুলের শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী নারীদের প্রতি তিনি চরমভাবে আসক্ত। সে সময় সউদ পরিবারের অনেক সদস্যেরই এই আসক্তি ছিল। তবে তখন একমাত্র রাজপুত্র ডব্লিউই দু'পক্ষের কাছে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে খবরটি জানতে দিয়েছিলেন। তার এই দুর্বলতাই সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যকে হাসিলের দরজাকে খুলে দিলো। সেই সাথে মিশন সফল করতে হলে কতটা নিচে নামতে হবে তাও আমাকে বুঝিয়ে দিলো। //

অধ্যায়-১৬
ব্যভিচারের দালালী ও ওসামা বিন লাদেনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

শুরুতেই রাজপুত্র ডব্লিউ আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, যখনই তিনি বোস্টনে বেড়াতে আসবেন তখনই তাকে তার পছন্দসই নারী দিয়ে আপ্যায়ন করাতে হবে। আর এই নারীকে শুধুমাত্র তার ভ্রমণ সঙ্গিনীর দায়িত্ব পালন করলেই চলবে না। বরঞ্চ অনেক রকম অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করতে হবে। তার ভ্রমণ সঙ্গিনী যেন পেশাদার বেশ্যা না হয়। তাহলে যে কোন মুহূর্তে তিনি ও তার পরিবার বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। রাজপুত্র ডব্লিউ ও আমার আলোচনাগুলো ঘটতো একান্ত গোপনীয়ভাবে। তাই তিনি খোলামেলাভাবে তার চাহিদাগুলোর কথা আমাকে জানাতে পারতেন।

"স্যালি" ছিল নীল চোখ ও সোনালী চুলের এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। সে থাকত বোস্টন শহরে। তার স্বামী ছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একজন পাইলট। পেশাগত কারণে স্যালির স্বামীকে প্রায়শই ভ্রমণ করতে হতো। সুন্দরী বিমানবালা, হোটেল পরিচারিকা ও কলগার্লদের সাথে ক্ষণিকের সম্পর্ক গড়ে তুলতে স্যালির স্বামী সাংঘাতিক রকমের পটু ছিল। স্যালি এ ব্যাপারটি টের পেতো। তারপরও স্বামীর মোটা অংকের বেতন, বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি ও একজন পাইলটের স্ত্রীর মর্যাদা স্যালিকে সন্তুষ্ট করে রেখেছিল। বিয়ের আগে কিছুদিন স্যালি হিপ্পীদের একটি. দলে ভিড়েছিল। সেখানেই সে বহুজনের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এছাড়াও গোপনে মোটা অংকের অর্থ রোজগার করার প্রতিও তার আকর্ষণ ছিল। তাই স্যালি রাজপুত্র ডব্লিউকে গোপনে আপ্যায়ন করতে রাজি হলো। তবে এক্ষেত্রে সে একটি শর্ত জুড়ে দিলো। যদি রাজপুত্র ডব্লিউ স্যালির সাথে অমায়িক ও চমৎকার ব্যবহার করেন তবেই এই সম্পর্ক টিকে থাকবে।

প্রথমবারই রাজপুত্র ডব্লিউ ও স্যালি একেবারে চুম্বক ও লোহার মতো জমে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এ ঘটনার পরে সৌদি আরবের অর্থ পাচারের অধ্যায় শুরু হলো দ্রুতগতিতে। কিন্তু

সমস্যায় পড়লাম আমি। মেইন তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে দিত না। আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এক্ষেত্রে ব্যভিচারের দালালী করেছিলাম। এটি ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের আইন অনুযায়ী একটি দণ্ডনীয় অপরাধ অর্থাৎ স্যালির পারিশ্রমিক মেটানোই আমার জন্য কঠিন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পথ বাতলে দিলেন মেইনের হিসাবরক্ষণ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি আমাকে বুদ্ধি দিলেন দামি বার ও রেস্তোরাঁগুলোর পরিচারকদের মোটা অংকের বখশিস দিয়ে ফাঁকা ক্যাশ মেমো যোগাড় করতে। এরপর এসব ক্যাশ মেমোয় রাজপুত্র ডব্লিউয়ের আপ্যায়ন ব্যয়গুলো লিখে সেই অর্থ মেইনের হিসাবরক্ষণ বিভাগ থেকে আদায় করতে। এভাবেই স্যালির পারিশ্রমিক ও আমার খরচ করা অর্থ উঠে আসবে। সে যুগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়াররা ক্যাশ মেমো পূরণ করত। তখনও এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার চালু হয় নি। তাই এই পদ্ধতিতেই আমার সমস্যার সমাধান হলো চমৎকার ভাবে।

সম্পর্ক যত পুরোনো হলো রাজপুত্র ডব্লিউ তত দুঃসাহসী হলেন। তিনি স্যালিকে তার সৌদি প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেই সময় এটা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এভাবেই শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী নারীদের নিয়ে যাওয়া হতো। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সুন্দরী যুবতীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতাবান পুরুষদের প্রাসাদে বাস করত। এরপর মেয়াদ শেষে এসব নারী নিজ দেশে ফিরে যেত মোটা অংকের পারিশ্রমিক নিয়ে। সিআই'এর অপারেশন্স বিভাগের ক্যাশ অফিসার ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ রবার্ট বায়ার বলেছেন, "গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো বিপুল অংকের পেট্রো ডলার রোজগার করতে লাগল। তখন লেবাননের একদল ব্যবসায়ী পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারী দেশগুলোর ক্ষমতাবান পুরুষদের চাহিদা মাফিক সুন্দরী যুবতীদের সরবরাহ করতে থাকল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলোর কর্ণধারগণ অর্থ ব্যয়ের হিসাব কিভাবে করতে হয় তা জানতেন না। তাই তাদের লেবাননী রক্ষিতারা মোটা অংকের অর্থ রোজগার করতে পেরেছিল।

আমি এ ব্যাপারটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। সেই সাথে এমন কয়েকজনকে চিনতাম যারা এ ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি বাধা ছিল। এক. স্যালি মধ্যপ্রাচ্যে যেতে রাজি হবে কিনা। দুই. যদি সে রাজি হয় তাহলে তার পারিশ্রমিক কিভাবে মেটানো হবে। স্যালি বোস্টন ছেড়ে যেতে যে রাজি হবে না, সে ক্ষেত্রে আমি প্রায় সুনিশ্চিত ছিলাম। যদি তাকে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে অবস্থিত একটি প্রাসাদে কয়েকদিন থাকার জন্য রাজি করানো যায়, তাহলেও তার পারিশ্রমিক মেটানোর ঝামেলা থেকেই যাবে। ফাঁকা ক্যাশ মেমো পূরণ করে এই ব্যয় মেটানো যাবে না।

পুরো সমস্যাটির ফয়সালা করলেন রাজপুত্র ডব্লিউ নিজে। তার রক্ষিতাকে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যাওয়ার, তাকে সেখানে পুরো আরাম-আয়েশে রাখার ও মেয়াদ শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনার ব্যয়ভার রাজপুত্র ডব্লিউ নিজে বহন করবেন। এ ক্ষেত্রে আমার কাজ হবে

তার চাহিদা মাফিক নারী সরবরাহ করা। যদি আসল স্যালি মধ্যপ্রাচ্যে যেতে রাজি না হয় তাহলে নকল স্যালিতেও তার আপত্তি নেই। আসল স্যালি রাজি না হওয়ায় আমি লন্ডন ও আমস্টারডামে আমার কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বললাম। তারা তাদের পরিচিত লেবাননী দালালদের সাথে যোগাযোগ করল। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বসবাসকারী আরেক আমেরিকান স্যালির খোঁজ পাওয়া গেল। যথাসময়ে দ্বিতীয় স্যালি চুক্তিতে স্বাক্ষর করল।

রাজপুত্র ডব্লিউ ছিলেন এক জটিল চরিত্র। আসল স্যালি তার জৈবিক চাহিদাকে পরমভাবে পরিতৃপ্ত করেছিল। আর এজন্য আমি রাজপুত্রের ঘনিষ্ঠতম আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে তিনি তখনও সৌদি আরবের জন্য 'সামা' যে সবচেয়ে উপযোগ্য পদ্ধতি তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাকে রাজি করাতে আমাকে রীতিমত মাথার ঘাম মাটিতে ফেলতে হয়েছে। আমি তাকে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ও পূর্বাভাস বুঝাতে বহু সময় ব্যয় করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ধনী অথচ অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা যেসব কাজ করছি সেগুলোও তাকে দেখিয়েছি। ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার আগে ক্লডিনের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় কুয়েতের জন্য যে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করেছিলাম তা তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়েছি। অবশেষে তিনি রাজি হলেন।

অন্যান্য মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ঘাতকদের সাথে সৌদি রাজ পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের কী ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে, সৌদি রাজপরিবার মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের পুরো পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেছিল। মেইন পেল পরিকল্পনার প্রথম পর্ব, অর্থাৎ সৌদি আরবকে বিদ্যুতায়নের দায়িত্ব। যথারীতি মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় এই কাজকে তদারকি করবে। মেইনের প্রথম কাজ হবে সৌদি আরবে ব্যবহৃত মান্ধাতার আমলের বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতিকে জরিপ করা। এরপর এর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির আদলে সৌদি আরবে নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

যথারীতি আমি আমার বিভাগের তিনজন কর্মচারীকে বাছাই করলাম সৌদি আরবের জাতীয় ও আঞ্চলিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পদ্ধতিকে সরেজমিনে যাচাই ও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এরা সকলেই আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জরিপ পর্বে কাজ করেছে সাফল্যের সাথে। দলটি যখন রিয়াদে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন মেইনের আইন বিভাগ থেকে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে বলা হয়েছে যে, চুক্তি মোতাবেক সৌদি আরবে কাজ শুরু করার আগে রিয়াদে মেইনের একটি অফিস খোলার কথা। এক মাস আগে অফিসটি চালু করার কথা থাকলেও তা তখনও করা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী এই অফিসের প্রতিটি উপকরণ হয় যুক্তরাষ্ট্র, না হয় সৌদি আরব থেকে সংগ্রহ করতে হবে। যেহেতু সৌদি আরবে এসব উপকরণ পাওয়া যায় না সেহেতু যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসব উপকরণ নিয়ে যেতে হবে। চিঠিটা পাওয়া মাত্র আমি মার্কিন সামুদ্রিক

পরিবহন সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করলাম। সংস্থাগুলো জানালো যে, এখন সৌদি আরবের সমুদ্র বন্দরগুলোতে পুরোদমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাহাজে বোঝাই করার কাজ চলছে। তাই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কোন সৌদি বন্দরে মার্কিন পণ্য খালাস করা সম্ভব হবে না। শুনে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

মেইন কয়েকটা অফিস উপকরণের জন্য এতো মূল্যবান চুক্তিকে হাতছাড়া করতে মোটেও রাজি ছিল না। তাই প্রতিষ্ঠানটির কার্যনির্বাহী পরিষদ এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করল। অবশেষে একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমান ভাড়া করে এতে বোস্টন থেকে কেনা অফিস উপকরণগুলোকে ভরে প্রতিনিধি দলসহ রিয়াদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সের একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমানকে পুরোপুরিভাবে ভাড়া করা হলো। যথাসময়ে প্লেনটি প্রতিনিধি দল, অফিস উপকরণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রু নিয়ে রিয়াদের উদ্দেশ্যে বোস্টন ত্যাগ করল।

প্লেনের পাইলট ছিল আসল স্যালির স্বামী। এভাবে আমি এক্ষেত্রে স্যালির অবদানকে স্বীকার করে নিলাম।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যেকার চুক্তি মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই সৌদি আরবকে আমূলভাবে পাল্টে দিল। রিয়াদের রাস্তাগুলো থেকে ছাগলের দল উধাও হলো। এগুলোর স্থান দখল করল বর্জ্য পদার্থ নিস্কাশনকারী মার্কিন সংস্থা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের ২শ'টি উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ট্রাশ কম্প্যাক্টর ট্রাক। এজন্য সংস্থাটি বছরে ২০ কোটি ডলার আয় করতে সক্ষম হলো। এইভাবে সৌদি আরবের প্রতিটি আর্থ সামাজিক খাতকে আধুনিকায়ন করা হলো। কৃষি থেকে শিল্প, জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ থেকে সামরিক – সকল খাতই আলাদিনের চেরাগের যাদুস্পর্শে রাতারাতি আধুনিক চেহারা পেল।

তাই ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে টমাস শিপম্যান লিখলেন, "সৌদি আরবের বিশাল ফাঁকা মরুভূমি, মরুদ্যানগুলোতে কৃষকদের জীর্ণ কুটির ও হাতে গোনা ক'টা প্রাচীন শহরের আদিম ভবন আমেরিকানদের স্পর্শে পাল্টে গেল। এখন সৌদি মরুভূমি ভরে উঠেছে বিশাল সব শিল্পাঞ্চলে। মরুদ্যানগুলো রূপান্তরিত হয়েছে বিপুল খামারে। শহরগুলো পরিণত হয়েছে অত্যাধুনিক মহানগরীতে। যে কোন আধুনিক সৌদি ভবনে বিশাল গাড়ি থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় হুইল চেয়ার পর্যন্ত সবকিছুই অনায়াসে ঢুকতে পারে। আজ সৌদি আরব হচ্ছে বিশাল রাজপথ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপার মার্কেট, সাইবার ক্যাফের দেশ। বিলাসবহুল হোটেল, দামি রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড চেইন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, আকাশ ছোঁয়া অফিস ভবন, বিশাল বিনোদনকেন্দ্র সবই রয়েছে দেশটিতে। এখন সৌদি জীবনযাত্রার সাথে মার্কিন জীবনযাত্রার তেমন একটা পার্থক্য নেই।"

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সৌদি আরবের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী অথচ অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশই এই

পরিকল্পনাকে গ্রহণ করল। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে কারমিট রুজভেল্ট ইরানে যা করেছিলেন তারই পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সৌদি আরবের সামা-জেকর পদ্ধতি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ঘাতকদের কর্মকাণ্ড সূক্ষ্ম ও সৃজনশীল হতে পারল। সেই সাথে বিনা রক্তপাতে অন্য দেশ জয়ের দৃষ্টান্তও স্থাপিত হলো।

সৌদি আরবের সামা-জেকর পদ্ধতি আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থায় এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা ঘটাল। আর এটি শুরু হলো উগান্ডার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনকে কেন্দ্র করে। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি সৌদি আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন। যে স্বৈরশাসক নিজ দেশে কমপক্ষে ১-৩ লাখ লোকের রক্ত ঝরিয়ে ছিলেন তিনি শেষ জীবন কাটালেন সউদ পরিবারের দেওয়া বিলাসবহুল প্রাসাদে। ওই প্রাসাদে চাকর-বাকর ও গাড়ি-ঘোড়ার কোন অভাব ছিল না। লোহিত সাগরের সৈকতে বেড়িয়ে ও মাছ ধরে ইদি আমিনের দিনগুলো কেটেছে। রাতগুলো কেটেছে সুন্দরীদের উষ্ণ সাহচর্যে। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কিডনির জটিলতার কারণে জেদ্দায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৮০ বছর বয়সে।

১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবে ইদি আমিনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে গোপনে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ইস্যুটি নিয়ে আর কোন কথা বলেনি। বরঞ্চ পরবর্তীকালে ওয়াশিংটন নিজ প্রয়োজনে এই দৃষ্টান্তকে কাজে লাগিয়েছে বেশ কয়েকবার।

যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের গোপন পৃষ্ঠপোষকরূপে বহুবার ব্যবহার করেছে। এই পদ্ধতিটি ছিল যেমন সূক্ষ্ম তেমন ক্ষতিকর। গত শতাব্দীর আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের আফগান যুদ্ধের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই সৌদি আরবকে ব্যবহার করেছে। রিয়াদ ও ওয়াশিংটন যৌথভাবে আফগান মুজাহিদ তহবিলে ৩৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগ এখানেই শেষ হয়নি।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট সাময়িকীতে "সৌদি সংযোগ" নামে একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নিবন্ধটির লেখকগণ আদালতগুলোর ডিক্লাসিফায়েড প্রতিবেদনগুলোকে পর্যালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। আন্তর্জাতি সন্ত্রাস ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

নিবন্ধটির শেষাংশে বলা হয়েছে, "সকল সাক্ষ্য প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে একটি কথাকে প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বের বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারী দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদি আরব মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার মতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে মদদদানের উপকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষভাগে ইরানে

আয়াতুল্লাহদের ক্ষমতা দখল ও আশির দশকের শুরু আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রকে আতঙ্কিত করেছিল। তাই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি সরকারের মাধ্যমে সৌদি আরবের আধা সরকারী ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত বেড়ে উঠা জিহাদী আন্দোলনের অর্থ প্রাপ্তির প্রাথমিক উৎস রূপে ব্যবহার করেছিল। এই অর্থে কমপক্ষে ২০টি মুসলমান দেশে গেরিলা বাহিনীগুলোর প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপিত হয়েছিল। গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য বিশ্বব্যাপী কালোবাজার থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কেনা হয়েছিল। পুরো মুসলিম জাহান থেকে গেরিলা যোদ্ধাদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। কয়েকজন প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, সেই সময় সৌদি আরবের অতি বদান্যতাকে যুক্তরাষ্ট্র দেখেও না দেখার ভান করেছে। বিনিময়ে যেসব মার্কিন কর্মকর্তা সেই সময় সৌদি রাজপরিবারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন, যেমন রাষ্ট্রদূত, সিআইএ'র স্টেশন চীফ, এমনকি মার্কিন মন্ত্রীগণ সৌদি সরকারের কাছ থেকে বিপুল অংকের উপঢৌকন পেয়েছেন। সেই সাথে মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো কোটি কোটি ডলারের কাজ পেয়েছে সৌদি আরবে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায় যে, সে সময় সৌদি আরব শুধুমাত্র আল-কায়েদাকে সাহায্য করেনি। বরঞ্চ সকল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী দলকেই মদদ দিয়েছিল। আর এ কাজে সউদ পরিবারের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার দু'টি ধ্বংস হওয়ার পর ওয়াশিংটন ও রিয়াদের মধ্যকার গোপন যোগসূত্র সম্পর্কে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে ভ্যানিটি ফেয়ার সাময়িকীতে এমন সব তথ্য মুদ্রিত হয়েছে যা এর আগে অন্য কোথাও মুদ্রিত হয়নি। ভ্যানিটি ফেয়ারে প্রকাশিত নিবন্ধের শিরোনাম ছিল "সৌদিদের রক্ষা করা"। নিবন্ধটিতে বুশ, সউদ ও লাদেন পরিবারগুলোর মধ্যেকার গুপ্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাকে অবাক করে নি। কেননা ওই সম্পর্ক যে সামা-জেকর যুগের সূচনা পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল তা আমি জানি। ১৯৭১-১৯৭৩ সময় জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ ছিলেন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি। অন্যদিকে ১৯৭৪-১৯৭৭ সময় তিনি ছিলেন সিআইএ'র পরিচালক। তবে এ সম্পর্কের কথা যে কোন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেটাই আমাকে অবাক করেছে।

ভ্যানিটি ফেয়ারে প্রকাশিত নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, "বুশ ও সাউদ পরিবার দু'টি এখন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাসক পরিবার। গত ২০ বছর যাবৎ এই দু'টি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে সউদ পরিবার হার্কেন এনার্জি নামের একটি উঠতি জ্বালানী প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করেছিল। জর্জ বুশ প্রতিষ্ঠানটিতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও তার

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার কার্লাইল গ্রুপের জন্য চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যে সৌদি রাজ পরিবারের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন। কার্লাইল গ্রুপ হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগকারী সংস্থা। জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ ও জেমস বেকার এই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। ৯/১১ এর ক'দিন পর লাদেন পরিবারের যেসব সদস্য যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন তাদেরকে ব্যক্তিগত বিমানে চড়িয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখন এই ফ্লাইট ছাড়ার অনুমতি দেওয়ার কথা কেউই স্বীকার করছেন না। এমনকি যাত্রীদের কোন প্রশ্নও করা হয়নি। বুশ পরিবারের সাথে সৌদিদের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের কারণেই কি এই ঘটনা ঘটেছে?"

প্রশ্নটির একমাত্র জবাব হচ্ছে হ্যাঁ।

তৃতীয় পর্ব

১৯৭৫-১৯৮১

অধ্যায়-১৭
পানামা যোজক নিয়ে আলোচনা ও গ্রাহাম গ্রীন

সৌদি আরব অনেকের ক্যারিয়ারকে গড়ে তুলল। আমার ক্যারিয়ার তো এর অনেক আগে থেকেই দ্রুতগতিতে উপরের দিকে উঠছিল। কিন্তু সৌদি আরবের সাফল্য আমার ক্যারিয়ারের নতুন দরজাগুলোকে খুলে দিলো। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মেইনের সদর দপ্তরে আমার নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। এর মধ্যে ছিল আমার নিজ বিভাগের ২০ জন কর্মী। সেই সাথে মেইনের সদর দপ্তরের অন্যান্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে বাছাই করা কয়েকজন কর্মীও এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। মেইনের একশ' বছরের ইতিহাসের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে কম বয়সী অংশীদার। প্রধান অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমি অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি হার্ভার্ডসহ বিভিন্ন নামকরা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। বহু নামকরা সংবাদপত্র আমাকে দিয়ে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে নিবন্ধ লিখিয়ে নিচ্ছিল। আমি একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরীর মালিক হলাম। এটি বোস্টন বন্দরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ জাহাজ কনস্টিটিউশনের পাশে নোঙর করা থাকতো। কনস্টিটিউশন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই বারবারি জলদস্যুদের দমন করেছিল। তাই একে ওল্ড আয়রনসাইড নামে ডাকা হতো। মেইন থেকে আমি মোটা অংকের বেতন পাচ্ছিলাম। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটিতে আমার শেয়ার থেকে যা লভ্যাংশ পাচ্ছিলাম তাতে মাত্র ৪০ বছর বয়সের মধ্যেই আমি কোটিপতিতে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার কোন পারিবারিক জীবন ছিল না। কিন্তু কয়েকটি মহাদেশের সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া নারীদের উষ্ণ সম্পর্ককে উপভোগ করতে পারছিলাম।

ব্রুনো অর্থনৈতিক পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন পন্থাকে উদ্ভাবনের ধারণাকে উপস্থাপন করলেন একদিন। তার এই ধারণার ভিত্তি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর এক রাশিয়ান গণিতবিদের একটি গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রে কিভাবে বিষয়গত সম্ভাবনা নির্ধারণের মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক খাতগুলোর উন্নয়ন হারকে হিসাব করা যায় এর গাণিতিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমার কাজ ছিল আন্তর্জাতিক ঋণ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমানকে বৃদ্ধি করে এর যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করা। ব্রুনো

আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার কাজে রাশিয়ান গণিতবিদের তত্ত্বটিকে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। আমি বুঝতে পারলাম যে, এজন্য একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাগবে।

আমি আমার বিভাগে এমআইটির একজন নবীন গণিতবিদ ড. নদীপুরম প্রসাদকে নিয়ে এলাম। তাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দিলাম। ৬ মাসের মধ্যে তিনি অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদানের মার্কভ সূত্রকে উদ্ভাবন করলেন। আমরা দু'জনে মিলে একগাদা গবেষণাপত্র তৈরি করলাম। এগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে মার্কভ সূত্রকে এক বৈপ্লবিক পন্থা বলে প্রচার করা হলো। এই প্রচারণা বিভিন্ন ফোরামে ব্যাপক সাড়া জাগালো।

আমরা এ ধরনের সাড়া জাগাতেই চেয়েছিলাম। মার্কভ সূত্র এমন একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা আমাদের কাজকে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা প্রদান করেছিল। আমাদের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশকে এমন এক ঋণের জালে আবদ্ধ করা, যা থেকে এরা জীবনেও মুক্ত হতে পারবে না। শুধুমাত্র দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ যাদের হাতে অঢেল সময় ও অর্থ রয়েছে, তারাই পারতেন মার্কভ সূত্রের ফাঁকিগুলোকে ধরে ফেলতে। এমনকি তারা এই সূত্রের সিদ্ধান্তগুলোকেও নস্যাৎ করে দিতে পারতেন। কিন্তু এ কাজে কেউই এগিয়ে আসেননি। তাই আমরা প্রাণ ভরে নিজেদের জয়ঢাক নিজেরাই পেটানোর সুযোগ পেলাম। আমাদের আত্ম প্রচারণায় বিমুগ্ধ হয়ে অনেকগুলো বিশ্বখ্যাত গাণিতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা তাদের সাময়িকীগুলোতে আমাদের গবেষণাপত্রগুলোকে ছাপালো। এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সম্মেলনে ও আলোচনা সভায় আমাদের গবেষণাপত্রগুলোকে উপস্থাপন করলাম। এসব সম্মেলন ও আলোচনা সভার বেশীর ভাগই অনুষ্ঠিত হয়েছিল নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এসব গবেষণাপত্র ও আমরা রাতারাতি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করলাম।

ওমর তোরিজো ও আমি রাতারাতি গোপন চুক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। পানামা সম্পর্কে আমি যেসব অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করছিলাম সেগুলোতে কোন রকম অতিরঞ্জন ছিল না। তাই মেইনের সদর দপ্তরে গুঞ্জন উঠল যে, এই পূর্বাভাস আসলে পানামার দারিদ্র্য বিমোচনের কমিউনিস্ট কর্মসূচী। তারপরও মেইন একচেটিয়াভাবে পানামার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাচ্ছিল। এসব দায়িত্বের মধ্যে প্রধান ছিল দেশটির সামগ্রিক উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এই প্রথমবারের মতো কোন মাস্টার প্ল্যানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের তালিকায় কৃষিখাতকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট জেমস আল কার্টার ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোর মধ্যে শুরু হলো পানামা প্রণালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের।

পানামা যোজক প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা গোটা বিশ্বে উত্তেজনা ও আবেগের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। গোটা বিশ্ব অধীর আগ্রহে এই আলোচনার পরিণতি সম্পর্কে নানা রকম

জল্পনা-কল্পনায় মেতে উঠেছিল। একদল চাইছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র পানামাকে পানামা যোজক প্রণালীর মালিকানা ফিরিয়ে দিক। কেননা, এই প্রণালী পানামারই বৈধ সম্পত্তি। আরেকদল বলছিল যে, পানামার কাছে প্রণালী ফিরিয়ে দেওয়া মানেই একটি দুর্বল দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের নতি স্বীকার করা। ভিয়েতনামের কাছে পরাজিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আর কোন পরাজয়কে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয় দল বলছিল যে, এই প্রথমবারের মতো একজন ন্যায়পরায়ণ ও সহমর্মিতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাই তিনি নিশ্চয়ই দু'দেশের জন্য যা ন্যায়সঙ্গত সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র ডানপন্থী মহল ও গোঁড়া খ্রীস্টান ধর্মীয় সংগঠনগুলো কোন যৌক্তিক সমাধানের পথে প্রবল বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল যে, কেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি প্রধান দুর্গকে ভেঙে ফেলা হবে? কেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীককে হাতছাড়া করা হবে? কেন দক্ষিণ আমেরিকার সাথে সংযোগকে ছিন্ন করা হবে? কেন দু'টি মহাসাগরে অবাধে বিচরণের সুযোগ পরিত্যাগ করা হবে?

আমি পানামা সফরগুলোর সময় হোটেল কন্টিনেন্টালে থাকতাম। এর বিলাসবহুল পরিবেশে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পঞ্চমবারের মতো পানামা সফরের সময় হোটেল কন্টিনেন্টালের উল্টোদিকে অবস্থিত হোটেল পানামাতে উঠতে বাধ্য হলাম। কেননা, তখন হোটেল কন্টিনেন্টালে নতুন সাজসজ্জা স্থাপনের কাজ পুরোদমে চলছিল। নির্মাণকর্মের বিকট শব্দে হোটেলে টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই হোটেল পানামাতে কক্ষ ভাড়া করলাম।

শুরুতে আমি এই অসুবিধাকে মেনে নিতে পারি নি। কেননা, হোটেল কন্টিনেন্টাল আমার কাছে দ্বিতীয় বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে হোটেল পানামার পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করল। এর সুপ্রশস্ত প্রবেশকক্ষ, কক্ষটির বিশাল সব কাঠের চেয়ার, ছাদে ঝোলানো বিশালকার ফ্যান আমার মনে প্রশান্তি জাগিয়ে তুলত। অবসর সময় এই কক্ষে ফ্যানের সুশীতল বাতাসের মধ্যে বসে আমি খবরের কাগজ বা বই পড়তাম।

একদিন আমি সবেমাত্র নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস সাময়িকীতে পানামা সম্পর্কে গ্রাহাম গ্রীনের লেখা একটি নিবন্ধ পড়া শেষ করেছি। তখন আমার মনে পড়ল যে, হোটেল পানামার প্রবেশ কক্ষের পরিবেশ ক্যাসাব্ল্যাংকা ছায়াছবির সেটেরই অনুরূপ। যে কোন মুহূর্তে ছায়াছবির নায়ক হামফ্রে বোগার্ট দৃশ্যপটে প্রবেশ করবেন। হঠাৎ করে আমার নজর পড়ল মাথার উপরে ঘুরতে থাকা ফ্যানটির দিকে। ঠিক তখনই দু'বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে। পানামা ক্লাবের একটি সভায় ওমর তোরিজো বক্তৃতা করছিলেন। শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলেন পানামার প্রভাবশালী নাগরিকগণ। হাতে গোনা ক'জন বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। সেদিনও মাথার উপরে ঘুরছিল বিশালাকার ফ্যানগুলো। সেদিন তোরিজো বলেছিলেন, "ফোর্ড হচ্ছেন একজন

দুর্বল প্রেসিডেন্ট। তিনি আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারবেন না। এ কারণেই আমি যোজক প্রণালীর মালিকানা নির্ধারণের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি। একে ফিরে পাওয়ার জন্য এটাই হচ্ছে সেরা সময়।"

তার এই বক্তৃতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি হোটেল কক্ষে ফিরে ঝটপট একটি চিঠি লিখে বোস্টন গ্লোব হামের পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। এই দৈনিক সংবাদপত্রটি বোস্টন শহর থেকে প্রকাশিত হতো। ক'দিন পর আমি যখন মেইনের সদর দপ্তরে নিজ কক্ষে বসে কাজ করছি তখন বোস্টন গ্লোব পত্রিকার একজন বিভাগীয় সম্পাদক আমাকে টেলিফোনে কল করলেন। তিনি আমাকে নিজ নামে একটি নিবন্ধ লিখতে বললেন। নিবন্ধটির শিরোনাম হবে "এ যুগের পানামায় সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই।" এটি পত্রিকাটির উপ-সম্পাদকীয় বিভাগের পাতায় ছাপা হবে। আমি নিবন্ধটি লিখে পাঠালাম, আর তা বোস্টন গ্লোবের ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংস্করণে ছাপা হলো।

নিবন্ধটিতে আমি যোজক প্রণালীর মালিকানা পানামার কাছে ফিরে দেওয়ার তিনটি কারণকে উল্লেখ করলাম। এক. বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। দুই. বর্তমান চুক্তি পানামার কাছে যোজক প্রণালীকে হস্তান্তরের চেয়েও বৃহত্তর ঝুঁকি বহন করছে। কেননা, ইন্টারশেনিক ক্যানাল কমিশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের মতে, গাতুন বাঁধের পাশে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হলে কমপক্ষে দু'বছরের জন্য পানামা প্রণালী বন্ধ হয়ে যাবে। আর এ কাজের জন্য একজন লোকই যথেষ্ট। পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোও বিভিন্ন জনসভায় এই আশংকার কথা কয়েকবার উচ্চারণ করেছেন। তিন. বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ল্যাটিন আমেরিকার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে অতি দ্রুতগতিতে।

আমার নিবন্ধের শেষে বলা হয়েছিল, "যোজক প্রণালীর কর্মকাণ্ডকে সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখতে হলে এর মালিকানা পানামার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এতে দেশটির জাতীয় ক্ষোভ প্রশমিত হবে। সেই সাথে এর দায়িত্ববোধ বাড়বে। সেই সাথে আমরা এমন একটি কাজ করার জন্য গর্ববোধ করব যা দুশ' বছর আগে গৃহীত সকলের জন্য স্বাধিকার নীতির প্রতি আমাদের একনিষ্ঠতাকে প্রমাণ করবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের যুগ। তাই সে সময়ের মানসিকতার প্রেক্ষাপটে পানামা চুক্তির যৌক্তিকতাকে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ের বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী নীতির কোন স্থান নেই। আগামী বছরে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপিত হবে। তাই আমাদের উচিত পানামার কাছে যোজক প্রণালীর মালিকানা ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলা।"

এই নিবন্ধটি লেখা আমার জন্য দুঃসাহসের কাজই ছিল। কেননা, এর মাত্র ক'দিন আগে আমি মেইনের অংশীদার হয়েছি। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম ছিল অত্যন্ত কড়া। এর অংশীদাররা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন না। তাই যুক্তরাষ্ট্রের

ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের নিউ ইংল্যান্ড কাউন্টির সবচেয়ে নামকরা সংবাদপত্রের উপ-সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত আমার রাজনৈতিক নিবন্ধটি মেইনের নিয়মকে ভঙ্গ করেছে। ক'দিন বাদেই আন্তঃঅফিস ডাকের মাধ্যমে আমার নিবন্ধটি একটি ফটো কপি এলো। এর সাথে গাঁথা ছিল একগাদা হাতে লেখা নামহীন ক্রুদ্ধ মন্তব্য। তবে একটি নোটের লেখা দেখে এটিকে চার্লি ইলিংওয়ার্থের লেখা বলে মনে হলো। চার্লি ছিলেন আমার প্রথম প্রজেক্ট ম্যানেজার। মাত্র দশ বছরেই আমি তাকে টপকে মেইনের প্রধান অর্থনীতিবিদ, অর্থনীতি ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের ম্যানেজার এবং অংশীদার হয়েছি। অথচ তখনও চার্লি মেইনের একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারই রয়ে গেছেন। তার নোটে আঁকা ছিল একটি লাল রংয়ের খুলি ও দু'টি লাল রংয়ের আড়াআড়ি হাড়। এর নিচে লেখা ছিল, "এই কমিউনিস্টটি কি প্রকৃতভাবেই মেইনের অংশীদার?"

সেদিন বিকেলে ব্রুনো আমাকে তার কক্ষে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "এই যন্ত্রণা আপনাকে ক'দিন ভোগ করতে হবে। মেইন মূলত একটি গোঁড়া ডানপন্থী সংস্থা। তবে একটি কথা আজ জেনে রাখুন। আমি আপনাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে করি। ওমর তোরিজো এটিকে পছন্দ করবেন। আপনি কি তাকে এর একটি কপি পাঠাবেন?" জবাবে আমি শুধু মাথা ঝাঁকালাম। তখন ব্রুনো হেসে বললেন, "খুব ভাল। অফিসের এসব ভাঁড়দের বেহুদা প্যাঁচালে কান দেবেন না। এরা ওমর তোরিজোকে কমিউনিস্ট বলে মনে করে। কিন্তু তার কাছ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এরা খুশি থাকবে।"

বরাবরের মতোই ব্রুনোর কথা সেবারেও সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। ক'দিন বাদেই আমার সহকর্মীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আগুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এলো ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্ট পদের শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করলেন। এর পরপরই পানামা যোজক প্রণালীর মালিকানা নির্ধারণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার মধ্যকার আলোচনার গতি জোরদার হলো। মেইনের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলো এই আলোচনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় ওমর তোরিজো এদেরকে পানামা থেকে বহিষ্কার করলেন। এতে পানামাতে মেইন একচেটিয়া ভাবে কাজ পেল। আর এই সূত্রেই আমি আবারও পানামায় এসেছি। হোটেল পানামার প্রবেশকক্ষে বসে নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস সাময়িকীতে প্রকাশিত গ্রাহাম গ্রীনের লেখা নিবন্ধ পড়ে শেষ করেছি।

নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল "পাঁচটির সীমান্তের একটি দেশ"। এতে অত্যন্ত খোলামেলা ভাষায় পানামার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও দেশটি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। এমনকি নিবন্ধটিতে পানামার ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছিল। গ্রীন আরও লিখেছিলেন যে, ওমর তোরিজো তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিলাবহুল বাড়ি ও গাড়ি। তিনি একবার গ্রাহাম গ্রীনকে বলেছিলেন, "আমি

যদি তাদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না দিই তবে সিআইএ এদেরকে ক্রয় করবে।" এ থেকেই আমি দু'টি বিষয় পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলাম। এক. সিআইএ প্রেসিডেন্ট কার্টারের সদিচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য আদা-নুন খেয়ে মাঠে নেমেছে। দুই. সিআইএ পানামার সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্রয় করছে। খুব সম্ভবত সিআইএ'র শৃগাল বাহিনী ওমর তোরিজোকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

আমি টাইম অথবা নিউজ উইক সাময়িকীর "পিপল" বিভাগে ওমর তোরিজো ও গ্রাহাম গ্রীনের একসাথে বসার ছবি দেখেছিলাম। ছবিটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছিল যে, সাহিত্যিক গ্রাহাম গ্রীন ওমর তোরিজোর বিশেষ অতিথি থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। আমি ভাবলাম যে, ওমর তোরিজো গ্রীনকে বিশ্বাস করেছিলেন। অথচ গ্রীন ওমর তোরিজোর নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তাহলে ওমর তোরিজো কি আর কোনদিন গ্রীনকে বিশ্বাস করবেন?

গ্রাহাম গ্রীনের নিবন্ধে আরেকটি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে আমি ওমর তোরিজোর সাথে যে আলোচনা করেছিলাম তার সাথে প্রশ্নটির সম্পর্ক রয়েছে। সে সময় আমি মনে করেছিলাম যে, বৈদেশিক ঋণ তাকে ধনী বানালেও পানামাকে চিরদিনের জন্য ঋণের কারাগারে আটকে রাখবে তা ওমর তোরিজো ভালভাবেই জানেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, ক্ষমতাসীনরা সচরাচর দুর্নীতিপরায়ণ হন, এই ধারণার উপরে ভিত্তি করেই বৈদেশিক ঋণের আওতাধীন প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়ন করা হয় - এই কথাটি তার অজানা নয়। তাই তিনি যে বৈদেশিক ঋণকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে না লাগিয়ে পানামার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করছেন তাতে কর্পোরেটোক্রেসির ক্ষুদ্ধ হওয়ারই কথা। কেননা, এতে কর্পোরেটোক্রেসির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বিশ্ব নিশ্চয়ই গভীর আবেগের সাথে পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোর কর্মকাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করছে। তাতে নীতিমালার পরিণতি তৃতীয় বিশ্বকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। তাই কর্পোরেটোক্রেসির ওমর তোরিজোকে অবশ্যই পুরো গুরুত্বের সাথে মোকাবিলা করবে।

ওমর তোরিজোর নীতির কারণে পানামাকে দেওয়া বৈদেশিক ঋণগুলো দেশটির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের উপনিবেশে রূপান্তরের কাজে লাগানোর কথা। এই ব্যাপারটি কর্পোরেটোক্রেসির অলিখিত আইনের পরিপন্থী। তাই ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ওমর তোরিজো আমার সাথে যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে তার তেমন একটা অনুশোচনা হওয়ার কথা নয়। আমিও যে খুব একটা অনুতপ্ত হয়েছিলাম তাও নয়। তবে ওই আলোচনার সময় আমি যে একজন অর্থনৈতিক ঘাতক সে কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম। বরঞ্চ তখন আমি ওমর তোরিজোর ভূমিকাই পালন করেছিলাম। প্রথাবিরুদ্ধ সততাকে অবলম্বন করেছিলাম বাড়তি ব্যবসা পাওয়ার আশায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে মেইনের সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। কেননা, ওমর তোরিজোর নীতিকে সমর্থনের বিনিময়ে মেইন পানামার অবকাঠামোগুলোকে আধুনিকায়নের প্রকল্পগুলোকে একচেটিয়াভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ক্লডিন আমাকে যা শিখিয়েছিল পুরো ব্যাপারটিই

ছিল এর পরিপন্থী । এটা কর্পোরেটোক্রেসির বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করছিল। তাহলে এতদিনে কি শৃগালের দল সক্রিয় হয়ে উঠেছে?

সেদিন যখন ওমর তোরিজোর বাংলো থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম তখন গাড়িতে উঠার সময় আমার মনে হয়েছিল যে, ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসে মৃত নায়কদের কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে পদ্ধতি ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই পদ্ধতি যে রাষ্ট্রনায়ক দুর্নীতিবাজ হতে চান না তাকে ক্ষমা করে না। সৎ ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনায়কের পতন অবশ্যই অনিবার্য।

হঠাৎ করে আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আমি ভাবলাম যে, আনমনা থাকার কারণে আমার চোখ দু'টো হয়তোবা ভুল দেখেছে। তারপর ভাল করে দেখে বুঝতে পারলাম যে, একজন অতি পরিচিত লোক ধীরে ধীরে হোটেলের প্রবেশ কক্ষে ঢুকে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। প্রথমে আমি ব্যক্তিটিকে হামফ্রে বোগার্ট বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু বোগার্ট বহুদিন আগেই মারা গেছেন। এ কথাটি চট করে আমার মনে পড়ল। এর পর পরই বুঝতে পারলাম যে, আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তিটি আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম বিশ্বখ্যাত লেখক। তিনি *গর্ব ও গৌরব*, *ভাঁড়ের দল*, *হাভানাতে আমাদের লোক*-এর মত জনপ্রিয় বইগুলো লিখেছেন। এ ছাড়াও তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ পাঁচটি সীমান্তের একটি দেশের কথা তো একটু আগেই বলেছি। গ্রাহাম গ্রীন একটু থমকে দাঁড়ালেন। চারদিকে নজর বুলালেন। এরপর কফির দোকানে ঢুকলেন।

আমার একবার মনে হয়েছিল যে, তার নাম ধরে ডাকি বা তার পেছনে ছুটে যাই। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করলাম। আমার বিবেক আমাকে জানাল যে, তার ব্যক্তিগত ভুবনে ঢোকার অধিকার আমার নেই। এতে তিনি আমার উপরে চরমভাবে বিরক্ত হতে পারেন। তখন চুপ করে চেয়ারে বসে নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস সাময়িকীটি হাতে তুলে নিলাম। একটু পরে দেখলাম যে, আমার পা দু'টো আমাকে কফি শপের দরজায় টেনে এনেছে।

আমি সেদিন খুব ভোরে হাল্কা নাস্তা খেয়েছিলাম। তাই প্রধান পরিচালক আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। আমি চারদিকে নজর বুলালাম। দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছের টেবিলের গ্রাহাম গ্রীন একলা বসে রয়েছেন। আমি পাশের টেবিলটির দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি ওই টেবিলে বসে নাস্তা খেতে পারি?"

আমি সব সময়ই প্রচুর বখশিস দেই। তাই প্রধান পরিচালক প্রশ্রয়ের হাসি হেসে আমাকে পাশের টেবিলে নিয়ে গেল।

সাহিত্যিক তখন সংবাদপত্র পড়ায় মগ্ন। আমি এক টুকরো মধু মাখানো ক্রোয়ার্স ও এক কাপ গরম কালো কফির অর্ডার দিলাম। আমি পানামা, ওমর তোরিজো ও যোজক প্রণালী সম্পর্কে গ্রাহাম গ্রীনের চিন্তাভাবনা জানতে চাইছিলাম। কিন্তু কিভাবে কথাবার্তা শুরু করব সে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় তিনি খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন। হাত

বাড়িয়ে ফলের রসের গ্লাসের দিকে।

আমি কোমল স্বরে বললাম, "এক্সকিউজ মি।"

তিনি গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন?"

আমি বললাম, "আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু আপনি তো গ্রাহাম গ্রীন, তাই নয় কি?"

তিনি আন্তরিক হাসি হেসে বললেন, "অবশ্যই। তবে পানামার বেশীর ভাগ লোকই আমাকে চেনে না।"

আমি উচ্ছ্বসিত ভাবে তাকে জানালাম যে, তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাসিক। এরপর তাকে আমার জীবন কাহিনীর সারমর্ম শোনালাম। মেইনে কী ধরনের কাজ করি তা জানালাম। সেই সাথে ওমর তোরিজোর সাথে আমার আলোচনার সারসংক্ষেপ বললাম।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনিই কি সেই কনসালট্যান্ট যিনি পানামা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে নিবন্ধ লিখেছেন? আমার যতদূর মনে পড়ে যে, এটা খুব সম্ভবত বোস্টন গ্লোবে ছাপা হয়েছিল।"

আমি তো তখন মহা খুশিতে আত্মহারা। কী বলব তা মাথাতেই আসছে না।

গ্রীন বললেন, "আপনার মতো লোকের জন্য এটা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। আপনি কি এই টেবিলে বসবেন দয়া করে?"

আমি তার টেবিলে বসলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আমরা কথা বলেছিলাম। গ্রীনের কথা শুনে বুঝতে যে, তিনি ওমর তোরিজোর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। কখনও কখনও গ্রীন ওমর তোরিজো সম্পর্কে, বাবা যেমন ছেলের সম্পর্কে কথা বলেন, ঠিক সেভাবেই কথা বলছিলেন।

গ্রীন জানালেন, "জেনারেল আমাকে পানামা সম্পর্কে একটি বই লিখতে বলেছেন। তবে বইটিকে লিখতে হবে দেশটির অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে। এ ধরনের বই এর আগে আমি কখনও লিখিনি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেন বাস্তবধর্মী বই না লিখে উপন্যাস লেখেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "উপন্যাস লেখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা। কারণ আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তুগুলো অত্যন্ত বিতর্কিত। ভিয়েতনাম, হাইতি, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো ঘটনাগুলো হচ্ছে আমার উপন্যাসগুলোর প্লট। এসব প্লটকে কেন্দ্র করে বাস্তবধর্মী বই লিখলে কোন প্রকাশকই এই বই ছাপাতে রাজি হবে না। অনেক প্রকাশক এ ধরনের বইয়ের কথা শুনলে ভয়ে হার্টফেল করবে।"

তিনি পাশের টেবিলে পড়ে থাকা নিউইয়র্ক রিভিউ অবস বুকস সাময়িকীটিকে দেখিয়ে

বললেন, "ওই রকম একটি নিবন্ধ অনেক ক্ষতি করতে পারে।" এরপর হেসে বললেন, "এ ছাড়া আমি উপন্যাস লিখতে পছন্দ করি। কল্পনা আমাকে পুরো স্বাধীনতা দেয়। আর বাস্তব আমাকে বন্দী করে ফেলে।"

তারপর আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললেন, "গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লেখাটাই হচ্ছে আসল কথা। আপনি যেমন বোস্টন গ্লোব পত্রিকায় যোজক প্রণালী সম্পর্কে লিখেছেন।"

ওমর তোরিজো সম্পর্কে গ্রীনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গ্রীনের কথাতেই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। এ থেকেই বুঝতে পারলাম যে, পানামার প্রেসিডেন্ট অতি গরীব থেকে বিশ্বখ্যাত উপন্যাসিক পর্যন্ত সব ধরনের লোককেই সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারেন। গ্রীন যে ওমর তোরিজোর নিরাপত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তাও বুঝতে পারলাম।

গ্রীন হঠাৎ আবেগ ভরা গলায় বললেন, "উত্তরের দানবের সাথে টক্কর দেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।" এরপর সখেদে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন।"

এর পর তার বিদায় নেওয়ার সময় এলো।

তিনি ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে হাত মেলালেন। বললেন, "আমাকে ফ্রান্সে যাওয়ার বিমান ধরতে হবে।" এরপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বই লেখেন না কেন?" তার চাহনি আমাকে উৎসাহিত করল। তারপর আবার বললেন, "আপনার সেই ক্ষমতা রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখতে হবে। এই কথাটি সব সময়েই মনে রাখবেন।" বলেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

কয়েক পা এগিয়েই তিনি থামলেন। এরপর ফিরে আমাকে বললেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। জেনারেলই জয়ী হবেন। তিনি যোজক প্রণালী পানামার হাতে ফিরিয়ে আনবেনই।"

ওমর তোরিজো এ কাজটি করতে পেরেছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে সফলভাবে আলোচনা করে পানামা যোজক প্রণালী ও এর দু'পাশের অঞ্চলগুলো পানামার নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারলেন। এরপর কার্টার মার্কিন কংগ্রেসে বহু দেন-দরবার চালালেন চুক্তিটিকে পাশ করানোর জন্য। দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ের পর মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে চুক্তিটি মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হলো। যুক্তরাষ্ট্রের গোঁড়া ডানপন্থী মহল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

কয়েক বছর পর গ্রাহাম গ্রীনের বাস্তবধর্মী বই *জেনারেলের সাথে পরিচয়* প্রকাশিত হলো। বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল, "পানামা, এল সালভাদর ও নিকারাগুয়ায় আমার বন্ধু ওমর তোরিজোর যে সব বন্ধু রয়েছেন তাদের জন্য এই বইটি উৎসর্গ করলাম।"

বইটিতে আমার সাথে ওমর তোরিজোর প্রথম আলোচনার পুরো বিবরণ লেখা হয়েছে।

অধ্যায়-১৮
ইরানের শাহেন শাহ্

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত আমি বহুবার ইরান সফর করেছি। কখনও কখনও ল্যাটিন আমেরিকান বা ইন্দোনেশিয়া থেকে ইরানে আসা-যাওয়া করেছি। ইরানের বাদশাহের আনুষ্ঠানিক খেতাব হচ্ছে শাহেন শাহ্ বা সম্রাট। আমরা যে সব দেশে কাজ করেছি সেসব দেশ থেকে ইরান সম্পূর্ণভাবে আলাদা।

ইরান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারী দেশ। তাই সৌদি আরবের মতো ইরানকেও নিজ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। এখানেই ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যকার মিলের ইতি ঘটেছে। বরঞ্চ দু'দেশের মধ্যকার অমিলগুলোই বেশী। সৌদি আরব সুন্নী প্রধান মুসলিম দেশ। ইরান শিয়াপ্রধান মুসলিম দেশ। সৌদি আরবের ইতিহাস মাত্র দুশ' বছরের। অন্যদিকে ইরান মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি। সৌদি আরবের সংস্কৃতি পুরোপুরিভাবে আরব উপদ্বীপের সংস্কৃতি। কিন্তু ইরানের সংস্কৃতি ব্যবিলনীয়, ককেশিয়ান ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকার সংস্কৃতিগুলোর সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। সৌদি আরব কখনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলে নি। কিন্তু ইরান বহুবার বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিল। সৌদি আরব কখনই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শিকার হয়নি। অথচ ইরানের ইতিহাস যুগ প্রাচীন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের রক্তঝরা কাহিনী।

তাই ইরানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল সৌদি আরব থেকে ভিন্ন। সৌদি আরবে সউদ পরিবারের শাসনকে টিকিয়ে রেখে ওয়াশিংটন দেশটিতে নিজের নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের শাহেনশাহ্ রেজা শাহ্ পাহলভীকে উন্নয়নের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইরানের সম্রাটের অতিরিক্ত ক্ষমতান্ধতা গোটা প্রক্রিয়াকে শেষাবধি বানচাল করে দিয়েছে।

সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের একজন শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক মিত্র কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারেন তা গোটা বিশ্বকে দেখানোর জন্য আমরা বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা এই পদক্ষেপকে সফল করার জন্য তার অগণতান্ত্রিক খেতাবকে অগ্রাহ্য করেছিলাম। এমনকি এজন্য তার গণতান্ত্রিকভাবে

নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করতেও দ্বিধাবোধ করিনি। তখনও ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোচীনসহ বহু দেশে মার্কিন বিরোধী জনমত জোরদার হয়ে উঠছিল। তাই আমরা ইরানের মতো ধনী দেশকে পশ্চিমা বিশ্বের ঘনিষ্ঠতম মিত্রে পরিণত করার জন্য আদা-নুন খেয়ে মাঠে নেমেছিলাম।

দৃশ্যত ইরানের সম্রাট ছিলেন অনগ্রসরদের প্রগতিশীল মিত্র। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইরানের বিশাল জমিদারীকে বিলুপ্ত করে সব জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্বেত বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। এই বিপ্লব ইরানে যুগান্তকারী আর্থ-সামাজিক সংস্কারের যুগকে শুরু করেছিল। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ওপেকের শক্তি বৃদ্ধি পেল। সেই সাথে ইরানের শাহেনশাহ্ বিশ্বরাজনীতির এক প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হলেন। একই সময় ইরান মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে গড়ে তুলল।

মেইন ইরানের বেশীর ভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়িত করেছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল উত্তরের কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র থেকে দক্ষিণের হরমুজ প্রণালীর উপকূলে অবস্থিত গোপন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। বরাবরের মতই আমরা প্রথমে ইরানের জাতীয় ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাসগুলোকে তৈরি করেছি। এরপর এসব পূর্বাভাসকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গোটা ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পদ্ধতিকে নির্মাণ করেছি। এভাবেই সেই সময়ের ইরানের শিল্প ও বাণিজ্য খাতগুলোর উন্নয়নের ধারা গড়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন সময়ে আমি ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছি। আমি কারাভান চলার প্রাচীন পথ ধরে দাশৎ-ই-লুৎ, বিশাল পর্বতসঙ্কুল নোনা মরুভূমি সফর করেছি। এই পাহাড়ি মরু এলাকায় অসংখ্য গ্রাম ও শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হয়েছি। দীর্ঘ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় নির্জন প্রান্তরে হঠাৎ করে চোখে পড়েছে যাযাবর বেলুচদের বাদুরের ডানার মতো ছড়ানো কাল পশমের তাঁবু। এমনি কোন তাঁবুতে রাত কাটানোর সময় বৃদ্ধ গৃহকর্তার মুখে দাশৎ-ই-লুৎ অঞ্চলের প্রাচীন গাঁথাগুলো শুনেছি। জানতে পেরেছি এর অতীত সমৃদ্ধির কথা। বুঝতে পেরেছি এর গ্রাম ও শহরগুলোর ধ্বংস হওয়ার কারণগুলোকে। কেননা, এই প্রান্তর দিয়ে ছুটে গেছে মহাবীর আলেকজান্ডার, দুনিয়া কাঁপানো চেঙ্গিজ খান, বাবর, তৈমুর লঙ ও নাদির শাহের ভয়ঙ্কর লুটেরা বাহিনীগুলো। জমি প্রচুর রক্ত শুষেছে। তারপর শোকে-আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে, শুকিয়ে চৌচির হয়েছে। বিধবা ও শিশুদের চোখের জলে জমিতে নোনা ধরেছে। তাই দশৎ-ই-লুৎ মরুভূমি এক নির্জন নিষ্ফলা নোনা জমিতে পরিণত হয়েছে।

আমি দশৎ-ই-কাভির মরুভূমির ভেতর দিয়ে কারাভান চলার প্রাচীন পথগুলো বেয়ে দক্ষিণের বন্দর আব্বাস থেকে উত্তরের কেরমান শাহ পর্যন্ত বহু অঞ্চল সফর করেছি। ইরানের প্রথম সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সেপোলিসের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখে প্রাচীনতম পারস্য সম্রাটদের শক্তিমত্তা ও বিলাস বাহুল্যের বর্ণাঢ্য ছবি মনে মনে এঁকেছি।

ইরানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর শিরাজ, ইস্ফাহান, তাব্রিজ, কাজভিন দেখে বিমুগ্ধ হয়েছি। পৃথিবীর একমাত্র তাঁবু নির্মিত শহর তখৎ-ই-সুলায়মানের বিপুল সৌন্দর্য্য দেখে নিজেকে ভুলে গেছি। নিশাপুর শহরের অলিতে-গলিতে কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ ওমর খৈয়ামের অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলোর নেশায় বুঁদ হয়েছি। ধীরে ধীরে ইরান ও এর বিপুল জনবৈচিত্র্যের প্রেমে মজেছি।

সেই সময় বাইরে থেকে দেখলে ইরানকে মুসলিম-খ্রীস্টান সহযোগিতার আদর্শ বলে মনে হতো। কিন্তু একটু ভালভাবে তলিয়ে দেখলেই প্রশান্তির আবরণের নিচে চাপা পড়া অসন্তোষের আগুনকে চোখে পড়তো।

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে নিজ কক্ষের দরজা খুলতেই মেঝেতে পড়ে থাকা একটি চিরকুট চোখে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম যে, এটি ইয়ামিন নামের এক ব্যক্তি লিখেছেন। তার সাথে এর আগে আমার দেখা হয়নি। তবে একটি সরকারি আলোচনা সভায় তাকে একজন কুখ্যাত দেশদ্রোহীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। চমৎকার ইংরেজিতে লেখা চিরকুটটিতে আমাকে সে রাতে একটি রেস্তোরায় আমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেই সাথে আমাকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি আমি যে ইরানকে এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি সেই ইরানকে দেখতে আগ্রহী হই তাহলেই যেন এই আমন্ত্রণকে গ্রহণ করি। আমি ভাবলাম, "ইয়ামিন কি আমার প্রকৃত পরিচয়টির জানেন?" সেই সাথে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি তাও বুঝতে পারলাম। তারপরও এই দুর্বোধ্য লোকটির সাথে পরিচিত হওয়ার দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে টেনে নামাল তেহরানের নিশুতি রাজপথে।

আমার ট্যাক্সি এসে থামল এক বিশাল প্রাচীরের এক ক্ষুদে ফটকের সামনে। প্রাচীরের কারণে এর ভেতরের ভবনটিকে চোখেই পড়ে না। একটি লম্বা কালো গাউন পরিহিতা এক ইরানী সুন্দরী আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নিচু ছাদ থেকে ঝোলানো প্রাচীন তৈল প্রদীপগুলোর আলোয় আলোকিত করিডোর দিয়ে আমরা এর শেষ প্রান্তের একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঢোকা মাত্র কক্ষটির হীরক সদৃশ্য উজ্জ্বল প্রভা আমার চোখ দুটিকে প্রায় অন্ধ করে ফেলল। যখন চোখ দু'টি কক্ষের উজ্জ্বলতায় অভ্যস্ত হলো তখন কক্ষের দেওয়ালে গাঁথা দামি পাথর ও মুক্তাগুলোকে দেখতে পেলাম। ব্রোঞ্জের তৈরি ঝাড়বাতিগুলোতে বসানো সাদা দীর্ঘ মোমবাতিগুলোর উজ্জ্বল আভা গোটা কক্ষটিকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

নেভি ব্লু রংয়ের কমপ্লিট স্যুট পরিহিত লম্বা কালো চুলের অধিকারী এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ এসে নিজের পরিচয় দিলেন ইয়ামিন রূপে। তার ইংরেজী উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলাম যে, কিশোর থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত তিনি অভিজাত ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করেছেন। সকৌতুকে মনে মনে ভাবলাম, "এই যদি হয় ইরানের এক কুখ্যাত দেশদ্রোহীর চেহারা তাহলে এর পরিচালিত বিপ্লবের কী পরিণতি হতে পারে তা ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে।" তিনি আমাকে কয়েকটি টেবিলের পাশ দিয়ে নিয়ে এলেন

কক্ষের নির্জনতম প্রান্তে। চারদিকে নজর বুলিয়ে বেশীর ভাগ টেবিলেই যুবক-যুবতীদের পানভোজনে মগ্ন দেখলাম। বুঝতে পারলাম যে, এই রেস্তোরাঁয় এ ধরনের ঘটনা সচরাচর ঘটে। সে রাতে একই টেবিলে দু'জন পুরুষের বসার দ্বিতীয় দৃশ্যটি আমার নজরে পড়ল না।

কক্ষের যে অংশের টেবিলে আমরা বসলাম সে অংশটি পর্দায় ঘেরা বাকি কক্ষ থেকে আলাদা করা। ইয়ামিন কথাবার্তায় অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তার কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে, তার কাছে আমি স্রেফ একটি মার্কিন কোম্পানীর কনসালট্যান্ট বৈ আর কিছুই নই। তিনি জানালেন যে, পীস কোরে আমার চাকরি ও ইরানে আমার সফর করার তথ্যের কারণেই তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিশেষ করে ইরানের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জনবৈচিত্র সম্পর্কে আমার আগ্রহ তাকে খুশি করেছে।

তিনি বললেন, "আপনার পেশার অন্য ব্যক্তিদের তুলনায় আপনি যথেষ্ট নবীন। আমাদের অতীত ইতিহাস ও বর্তমানের সমস্যাগুলো সম্পর্কে আপনি প্রকৃতভাবেই আগ্রহী। তাই আপনার সম্পর্কে আমরা আশাবাদী।"

ইয়ামিনের ভদ্র আচরণ, আন্তরিক কথাবার্তা, সৌম্য চেহারা ও রেস্তোরাঁর নিরিবিলি পরিবেশ আমাকে আশ্বস্ত করল। ইন্দোনেশিয়ার রাসি ও পানামার ফিদেলের মতো ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এটি আমার জন্য বিশেষ প্রশংসা ও সুযোগ। আমি যেখানেই যাই সেখানকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষ আমাকে আকর্ষণ করে। এদিক থেকে আমি আর সব আমেরিকানদের চেয়ে আলাদা। কোন বিদেশী যদি স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায় তাহলে সেই স্থানের লোকেরা বিদেশীটিকে আপন করে নেবেই।

ইয়ামিন প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর প্রকল্প সম্পর্কে কিছু জানেন?" এরপর একটি বিরতি নিয়ে বললেন, "অতীতে আমাদের মরুভূমিগুলো যে উর্বর ও সবুজ ছিল এ কথাটি আমাদের শাহেনশাহ বিশ্বাস করেন। তিনি বহুবার প্রকাশ্যে এই বিশ্বাসটিকে উচ্চারণও করেছেন। তার মতে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অপরাজেয় বাহিনী পারস্য অভিযানের সময় অসংখ্য ছাগল ও ভেড়া সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এসব প্রাণী সব ঘাস ও উদ্ভিত খেয়ে ইরানের এক বিশাল অংশকে একেবারে সবুজহীন করে ফেলেছে। এ থেকে যে তীব্রতম খরার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই এদেশের মরুভূমিগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। এখন এসব মরুভূমিগুলোতে ঘাস ও গাছ লাগালেই নেমে আসবে অঝোরধারায় বৃষ্টি। এরপর আগের মতই এসব অঞ্চল উর্বর ও সবুজ হবে। অবশ্য এই কাজে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে হবে। আর এ থেকে লাভবান হবে আপনার কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো", বলেই তিনি মৃদু হাসি হাসলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি বোধহয় এই তত্ত্বকে বিশ্বাস করেন না?"

তিনি জবাব দিলেন, "মরুভূমি একটি প্রতীক। একে সবুজ বানানোর প্রকল্পকে কৃষির আধুনিকায়নের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।"

কয়েকজন পরিচারক রূপার ট্রে হাতে নিয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। প্রতিটি ট্রেতে রয়েছে সুদৃশ্য ও সুগন্ধী ইরানী খাদ্যসম্ভার। ইয়ামিন আমার অনুমতি নিয়ে খাবার পছন্দ করলেন। পরিচারকরা টেবিলের উপরে খাবার ও পানীয় সাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের পানাহার পর্ব শুরু হলো।

খেতে খেতে ইয়ামিন বললেন, "যদি অনুমতি দেন তো আপনাকে একটা প্রশ্ন করি।" আমি মাথা ঝাঁকাতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ধ্বংস হলো কি করে?"

আমি জবাব দিলাম, "এর অনেক কারণই রয়েছে। তবে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের লোভ ও উন্নতর অস্ত্র হচ্ছে এর প্রধানতম কারণ।"

তিনি খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন, তবে সবচেয়ে আগে ধ্বংস করা হয়েছিল আদিবাসীদের পরিবেশকে।" এরপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে শ্বেতাঙ্গরা আদিবাসীদের বন কেটে আবাদী জমি তৈরি করেছিল। কিভাবে বুনো মোষগুলোকে হত্যা করে গরু-ছাগলের খামার বানিয়েছিল। প্রথমে আদিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এরপর বহু লোকক্ষয়ের পর শ্বেতাঙ্গদের তৈরি করা সংরক্ষিত আদিবাসী পল্লীগুলোতে বাস করতে বাধ্য হলো।

ইয়ামিন জানালেন, "এখানেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মরুভূমি হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর প্রকল্পটি আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে চাইছে। সেই সাথে আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ধ্বংস হবে। আমরা কি তা মেনে নিতে পারি?"

আমি জবাব দিলাম, "এই আইডিয়া তো আপনাদের মাথা থেকেই গজিয়েছে বলে আমার মনে হয়।"

ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে তিনি বললেন, "মার্কিন সরকার ইরানের শাহের মাথায় এই আইডিয়াটা ঢুকিয়েছে। তিনি তো স্রেফ মার্কিন সরকারের হাতের পুতুল। কিন্তু কোন প্রকৃত ইরানী এ ধরনের আজগুবী প্রকল্প মেনে নেবে না।"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। খাওয়ার রুচি তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেই চললেন, "আমরা বেদুইন। আমরাই মরুভূমিতে বাস করি। মরুভূমি আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। শহরের সাহেবরা মাঝে মধ্যে ছুটি কাটাতে মরুভূমিতে যান পরিবার-পরিজনদের সাথে নিয়ে। একটি ভাল মরুদ্যানকে বেছে নিয়ে বিশাল তাঁবুগৃহ খাটিয়ে বসেন। ওই সব বিশালাকার তাঁবুতে একটি গোটা পরিবারের জন্য সব রকম ব্যবস্থাই থাকে। মহা আরামে তারা ক'টা দিন মরুভূমিতে কাটান টিনজাত খাবার খেয়ে ও পানীয় পান করে। তারা মরুভূমির ব্যাপার স্যাপার কতটুকু বুঝবেন?"

সক্রোধে তিনি বললেন, "আমরা বেদুইনরা মরুভূমির অংশ। শাহ্ যে ইরানকে নির্মমভাবে শাসন করছেন সেই ইরানের লোকেরা মরুভূমির কেউই নয়। আমরা বেদুইনরাই মরুভূমি।"

বলতে বলতে তার ক্রোধ নিভে গেল। এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে মরুভূমিতে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কাহিনী শুনালেন। এগুলোতে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই ছিল। আমি বেদুইনদের জীবনকে বুঝতে পারলাম ভালভাবে।

এক সময় আমাদের আলোচনার পর্ব শেষ হলো। তিনি আমাকে ফটকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমার ট্যাক্সি তখনও বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইয়ামিন আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললেন, "চমৎকার একটি সন্ধ্যার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি বয়সে নবীন হলেও মনের দিক থেকে অত্যন্ত উদার। আপনার মতো লোকেরাই আমাদের আশা-ভরসা।"

একটু থেমে তিনি বললেন, "যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে আরেকটা অনুরোধ করতে চাই। এটাকে হাল্কাভাবে নেবেন না। বরঞ্চ এটা আপনার অভিজ্ঞতাকে আরেকটু পরিপুষ্ট করবে মাত্র। আপনি ইরানের আরেকটি দিককে নিজের চোখে দেখতে পাবেন।"

আমি জানতে চাইলাম, "বলুন তাহলে কী করতে পারি আপনার জন্য?"

তিনি জবাব দিলেন, "ইরানের শাহেনশাহকে চেনেন এমন একজনের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমার এই বন্ধু আপনাকে আমাদের সম্রাট সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারবেন। তাকে দেখলে আপনি মনে আঘাত পেতে পারেন। কিন্তু আপনার মূল্যবান সময়ের যে অপচয় ঘটবে না এই নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারি।"

অধ্যায়-১৯
এক অত্যাচারিতের কাহিনী

কয়েকদিন পর ইয়ামিন আমাকে তেহরান থেকে নিয়ে গেলেন মরুভূমির দিকে। তার গাড়ি একটি ধূলায় ভরা দরিদ্র বস্তি শহরের মধ্য দিয়ে চলল। কতক্ষণ পর একটি উট চলা পথ ধরে পৌছল দাশৎ-ই-কাভির মরুভূমির একটি প্রাচীন মরুদ্যানে। অস্তগামী সূর্যের আলোর মাঝ দিয়ে গাড়ি থামল একসার খেজুর গাছের নিচের ক্ষুদে কুটিরগুলোর কাছে। সবক'টি কুটিরই কাঁদা দিয়ে তৈরি।

ইয়ামিন বললেন, "এই মরুদ্যানের বয়স অনেক। মার্কো পোলোর কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই এখানে বসতি গড়ে উঠেছে।" বলতে বলতে তিনি একটি কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, "এখানে যিনি থাকেন তিনি আপনাদের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তার আসল নাম এখন বলা যাবে না। এর কারণ একটু পরে বুঝতে পারবেন। আপনি তাকে ডক বলে ডাকবেন।"

তিনি কুটিরের কাঠের দরজায় টোকা দিলেন। ভেতর থেকে চাপা গোঙানীর মত শব্দ শোনা গেল। ইয়ামিন দরজা ধাক্কা দিয়ে খুললেন। এরপর আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কুটিরে কোন জানালা নেই। শুধুমাত্র এক কোণায় একটি ছোট টেবিলের উপরে রাখা একটি তেলের প্রদীপ থেকে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে।

ঢোকা মাত্রই মনে হলো যে, ঘরে একটুও আলো নেই। এরপর চোখ সয়ে এলে দেখলাম যে, ঘরের ধূলা ভরা মেঝের উপরে একটি ছেঁড়াখোঁড়া ইরানী কার্পেট বিছানো। আর আলোর পাশে বসা এক ব্যক্তির আবছা অবয়বও চোখে পড়ল। প্রথম নজরে তা বোঝা যায় না। তবে খুব ভালভাবে তাকানোর পর তাকে দেখা যায়। তার শরীরে একটি বালাপোশ জড়ানো। মাথা কিছু একটা দিয়ে ঢাকা।

ঘরের বাসিন্দাটি একটি হুইল চেয়ারে বসা। টেবিলের পর এটিই হচ্ছে ঘরের দ্বিতীয় আসবাবপত্র। ইয়ামিন আমাকে কার্পেটের উপরে বসতে বললেন। এরপর নিজে লোকটির কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তার কানে ক'টি কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে আমার পাশের কার্পেটের উপরে বসলেন।

ইয়ামিন বললেন, "আগেই আপনাকে মি. পার্কিন্স সম্পর্কে বলেছি। আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়ে আমরা সম্মানিত হয়েছি।"

নিচু ও ভাঙা গলায় জবাব এলো, "আপনাকে স্বাগত জানাই মি. পার্কিন্স। আমি তখন সামনের দিকে ঝুঁকে দূরত্ব কিছুটা কমিয়েছি। কেননা, তার কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি বললেন, "আপনার সামনে একজন বিধ্বস্ত লোক বসে রয়েছে। অথচ আমি সব সময় এ রকম অথর্ব ছিলাম না। বরঞ্চ এক সময় আমি আপনার মতই প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর ছিলাম। আমি ছিলাম ইরানের শাহেন শাহের একজন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা।" দীর্ঘ বিরতির পর তার কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "ইরানের শাহেনশাহ ইরানের সম্রাট।" তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের চেয়ে কষ্টের পরশ বেশী ছিল।

তিনি বলে চললেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনায়ককেই চিনতাম। ডুইট আইজেন আওয়ার, রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন, শার্ল দ্য গল, সবার সাথেই আমার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ইরানকে পুঁজিবাদী শিবিরে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য তারা আমার উপরে নির্ভর করেছিলেন। ইরানের শাহেন শাহও এক্ষেত্রে আমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিলেন।" একটু মৃদু কাশির শব্দ শুনতে পেলাম। তবে তা চাপা হাসির শব্দ বলে আমার মনে হলো। আবার কথা শোনা গেল। "আমিও শাহেন শাহকে বিশ্বাস করেছিলাম। তার বক্তৃতায় মোহিত হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে, শাহেন শাহ তার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। ইরান মুসলিম বিশ্বকে নতুন যুগে নিয়ে যাবে। আমরা যে লক্ষ্যপূরণ করার জন্য জন্মেছি সেই লক্ষ্যপূরণের মাধ্যমেই আমাদের জন্ম সার্থক হবে - এটাই ছিল আমার একমাত্র ধ্যানধারণা।"

বালাপোশের আবরণ সরে গেল। মৃদু শব্দ করে হুইল চেয়ারটি একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আমি এখন ডকের চেহারা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারছি। তার আবছা মুখ ও চাপদাঁড়ি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। কী একটা যেন নেই। হঠাৎ করেই আমি কী নেই তা বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোকের মুখ থেকে তার নাক বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলাম। বহু কষ্টে গলা দিয়ে আসা চিৎকারটির টুঁটি চেপে ধরলাম।

মৃদু শব্দ করে হুইল চেয়ারটি আগের স্থানে ফিরে গেল। আবারো বালাপোশের আবরণ ঘিরে ধরল আবছা অবয়বটিকে। আমার আতঙ্ক উবে গেল। অত্যাচারের চিহ্ন ঢাকাপড়া মাত্র আমি স্বাভাবিক হতে পারলাম।

অন্ধকারের ভেতর থেকে ডকের গলা ভেসে এলো, "দৃশ্যটি বীভৎস, তাই নয় কি মি. পার্কিন্স? আপনাকে দৃশ্যটি দিনের আলোয় দেখাতে পারলাম না এটাই আফসোস। তাহলে বুঝতেন যে, এটা কতখানি বীভৎস।" চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল আবার। "আমি কেন আমার প্রকৃত পরিচয় আড়াল করছি তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনি চেষ্টা করলে আমার পরিচয় জানতে পারবেন। সেই সাথে আপনি এটাও জানতে পারবেন যে, বহুদিন আগেই আমার মৃত্যু ঘটেছে। ইরানের সহকারি নথিপথে আমার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আমার বিশ্বাস যে, আপনি এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেবেন না। এতে আপনার ও আপনার পরিবারের উপকারই হবে। ইরানের শাহেন শাহ ও তার সাভাকের হাত অনেক দূর পৌছায়।"

কথাগুলো শোনার পর হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে পড়ল। সৌদি আরব সফর করার আগে আমি বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে দেশটি সম্পর্কে পড়াশুনা করেছিলাম। তখন হঠাৎ করে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির উপরে লেখা একটি বই হাতে পড়েছিল। তাতে পড়েছিলাম, মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে শাস্তি দেওয়ার জন্য নাক কেটে নেওয়ার প্রথা চালু রয়েছে। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তির কাজে পুরো গোষ্ঠী বা এককভাবে গোষ্ঠী প্রধান অপমানিত হয় তখন সেসব ব্যক্তির নাক কেটে নেওয়া হয়। এতে নাককাটা ব্যক্তিকে বাকি জীবনের জন্য শাস্তির চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হয়।

হুইল চেয়ারে বসা ব্যক্তি বললেন, "আপনাকে আমরা কেন এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তা নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন মি. পার্কিন্স। দেখুন, যিনি নিজেকে ইরানের শাহেন শাহ বলছেন তিনি আসলে খোদ শয়তান। আমি জানাতে এখন ঘৃণা বোধ করছি যে, আপনাদের সিআইএ আমার সহযোগিতার কারণেই ইরানের বর্তমান শাহেনশাহের বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পেরেছিল। তখন তাকে নাৎসী বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এমনকি মোসাদ্দেকের পতনের জন্যও আমি বহুলাংশে দায়ী। এখন আমাদের শাহেন শাহ অপকর্মের দিক থেকে হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আর তাকে এক্ষেত্রে আপনাদের সরকার পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা করছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "খুবই সহজ। মধ্যপ্রাচ্যে তিনিই আপনাদের একমাত্র প্রকৃত মিত্র। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানীর কারণেই শিল্পোন্নত বিশ্বের চাকা ঘুরছে। অবশ্য এই অঞ্চলে ইরানের চেয়েও আপনাদের ঘনিষ্ঠতর মিত্র হচ্ছে ইসরায়েল। কিন্তু ইসরায়েল আপনাদের সম্পদ নয়, দায়। দেশটিতে কোন জ্বালানী ভাণ্ডার নেই। তারপরও আপনাদের রাজনীতিবিদগণ সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী লবিকে তোষণ করতে ব্যস্ত। কেননা ইহুদী লবির চাঁদা ছাড়া মার্কিন রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারেন না। তাই আপনারা বাধ্য হচ্ছেন ইসরায়েলকে সমর্থন দিতে। এক্ষেত্রে আপনারা নিরুপায়। তাই ইরান হচ্ছে আপনাদের একমাত্র ভরসা। আপনাদের জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাদের ইহুদী লবির চেয়েও শতগুণে বেশী শক্তিশালী। এরা ইরানের জ্বালানী ভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল। তাই আপনারা আমাদের শাহেন শাহকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনায়ক বলে মনে করছেন। একইভাবে আপনারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রনায়কদেরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন এক সময়। কিন্তু তারপরও ইন্দোচীনে আপনাদের মুখ রক্ষা হয়নি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ইরানকে ভিয়েতনামের সাথে তুলনা করছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "ইরানের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ভিয়েতনামের চেয়েও খারাপ হতে পারে। দেখুন আমাদের শাহেন শাহ বেশী দিন টিকবেন না। গোটা মুসলিম জাহান তাকে ঘৃণা করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আরব জাহান নয়, বরঞ্চ ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, এমনকি ইরানের জনগণও তাকে চরমভাবে অপছন্দ করে।" একটি কঠিন শব্দ শুনতে

পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি তার হুইল চেয়ারের হাতলে আঘাত করেছেন। তারপর তিনি সক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, "তিনি খোদ ইবলিশ। আমরা তাকে ঘৃণা করি।" এরপর নীরবতা নেমে এলো কুটিরে। শুধুমাত্র জোরে জোরে ভারী নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ইয়ামিন নিচু শান্ত স্বরে বললেন, "ডক মোল্লাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছেন। এখানে নিঃশব্দে ধর্মীয় সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সাধারণ ইরানী জনগণ এসব সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শুধুমাত্র হাতে গোণা কয়েকজন ইরানী ব্যবসায়ী শাহের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে লাভবান হচ্ছেন। এরাই এখন পর্যন্ত শাহকে সমর্থন করছেন।"

আমি বললাম, "আমি আপনার ধারণাকে সন্দেহ করছি না। এ পর্যন্ত আমি চারবার ইরান সফর করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার নজরে এ রকম কোন কিছু ধরা পড়েনি। যাদের সাথে আমি এ পর্যন্ত কথা বলেছি তারা শাহেন শাহকে সমর্থন করার কথা বলেছেন। তারা ইরানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন।"

ইয়ামিন জানালেন, "আপনি ফার্সী ভাষায় কথা বলতে পারেন না। সবচেয়ে লাভবান ব্যক্তিরা আপনাকে যা বলেছেন আপনি তাই শুনেছেন। যারা বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করেছেন তারা সবাই শাহেন শাহের পক্ষে কাজ করছেন। একমাত্র ডকই হচ্ছেন ব্যতিক্রম। তাও তিনি শাহেন শাহের 'সাভাক' বাহিনীর হাতে অত্যাচার ভোগের পর শাহেন শাহের পক্ষ ত্যাগ করেছেন।"

তিনি একটু থেমে বোধহয় এরপর কী বলবেন তা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন। এরপর বললেন, "একই কথা আপনাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। তারা শুধুমাত্র শাহেন শাহের আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠতম সহচরদের সাথে কথা বলে। এভাবেই শাহেন শাহ পরোক্ষভাবে আপনাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে শাহেন শাহ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের মর্জিমাফিক সংবাদই প্রচারিত হচ্ছে।"

ডকের ভাঙা নিচু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমরা কেন এসব কথা বলছি মি. পার্কিন্স?" তার কথা শুনে মনে হলো যে, কথা বলার প্রচেষ্টা ও আবেগ প্রকাশের তীব্রতা তার ক্ষীণ শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এরপর তিনি বললেন, "আমরা চাইছি যাতে আপনারা ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশ ছেড়ে চলে যান। আপনারা যে এদেশ থেকে বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করবেন বলে ভাবছেন তা কিন্তু ঠিক নয়। আমি আপনাদের এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনারা মরীচিকার পেছনে ছুটছেন। এই সরকার আর বেশীদিন টিকবে না।" আবারও আমি ধাতব শব্দ শুনলাম। আবারও তিনি বললেন, "এই সরকারের পতন ঘটার পর এমন এক সরকার আসবে যা হবে কট্টর পশ্চিমা বিরোধী। পরের সরকার আপনাদেরকে ইরান ছাড়তে বাধ্য করবে।"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "একেবারে খালি হাতে?"

ডক সজোরে কাশতে শুরু করলেন। ইয়ামিন তার কাছে গিয়ে পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। যখন ডকের কাশি থামল তখন ইয়ামিন নিচু গলায় ফার্সী ভাষায় ক'টি কথা বলে ফিরে এসে আমার পাশে এসে বসলেন।

ইয়ামিন আমাকে বললেন, "আমরা এই আলোচনা করতে চাই। আপনার প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, একেবারে খালি হাতেই আপনাদেরকে ইরান ত্যাগ করতে হবে। শাহেন শাহ আপনাদেরকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেবেন। কিন্তু যখন আপনাদের পারিশ্রমিক নেওয়ার সময় আসবে তখন শাহেন শাহ আর ক্ষমতায় থাকবেন না।"

আমরা যখন তেহরানে ফিরে আসছি তখন আমি ইয়ামিনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কেন মেইনকে আর্থিক লোকসান থেকে বাঁচাতে চাইছেন?"

ইয়ামিন জবাব দিলেন, "আপনার প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে আমরা খুবই খুশি হব। তবুও আমরা চাই যে আপনারা ইরান ছেড়ে চলে যান। মেইনের মতো প্রতিষ্ঠান ইরান ছেড়ে চলে গেলে তা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাহলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই ধারাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। এটাই আমরা আশা করছি। দেখুন আমরা এখানে রক্তপাত ঘটুক তা চাই না। কিন্তু শাহেন শাহকে সপরিবারে ইরান ত্যাগ করতেই হবে। এ ঘটনা যাতে ঘটে সেজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। তাই সময় থাকতে আপনি মি. জামবোত্তিকে ইরান ত্যাগ করার ব্যাপারে রাজি করাতে পারবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আপনারা আমাকে কেন বেছে নিয়েছেন?"

ইয়ামিন জবাব দিলেন, "রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার সময় আমরা মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন বুঝলাম যে, অপ্রিয় সত্য কথা শুনতে ও বলতে আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। আপনার সম্পর্কে আমরা যে খবর পেয়েছি তা যে সঠিক তাও বুঝতে পারলাম। আপনি হচ্ছেন দুই ভুবনের মধ্যকার লোক। আপনাকে এই দুই ভুবনের একটিতেও ঠিকমত মানায় না।"

আমি ভাবলাম যে, এরা আমার সম্পর্কে কতটুকু জানে!

অধ্যায়-২০
সম্রাটের পতন

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের এক সন্ধ্যাবেলার কথা। আমি তেহরানের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লবির পেছনের বিলাসবহুল বারে একা বসে ছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে কেউ আমার কাঁধে টোকা দিলো। মাথা ঘুরিয়ে পেছনে কমপ্লিট স্যুট পরিহিত এক ইরানীকে দেখতে পেলাম।

ইরানী হেসে জিজ্ঞেস করল, "জন পার্কিন্স! আমাকে চিনতে পার নি?"

প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়টি মোটা হয়েছে অনেক। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সজীবতা আগের মতই রয়ে গেছে। এ হচ্ছে মিডলবারিতে পড়াশুনা করার সময়ে আমার সেরা বন্ধু ফরহাদ। এর সাথে গত এক দশকে আমার দেখা হয়নি। আমরা দু'জনে দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এরপর দু'জন মুখোমুখি বসলাম। কথাবার্তা বলার সময় বুঝলাম যে, ও আমার সব কথাই জানে। এমনকি আমি কোন ধরনের কাজ করি, কেন ইরান সফর করছি, তাও তার অজানা নয়। তবে সে তার কাজকর্ম সম্পর্কে কোন কথাই বলল না।

আমরা দ্বিতীয় রাউন্ড বিয়ারের অর্ডার দিলাম। তখন ফরহাদ বলল, "এবার সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। আমি কাল রোমে যাব। আমার মা-বাবা এখানেই থাকেন। আমি একই ফ্লাইটে তোমার জন্যেও টিকিট কেটেছি। এখানে সবকিছু ভেঙে পড়ছে। তোমার খুব শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।" বলেই আমার হাতে একটি বিমান টিকিট ধরিয়ে দিলো। আমি তাকে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারলাম না।

পরদিন রাতে আমরা ফরহাদের মা-বাবার সাথে ডিনার করলাম। তার বাবা ইরানী সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। তিনি ইরানের শাহেন শাহের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। একবার তিনি এক ঘাতকের বুলেট থেকে শাহেন শাহকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই লোকটিই ইরানের শাহেন শাহ সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন যে, গত কয়েক বছরে শাহেন শাহ তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তিনি এখন ক্ষমতান্ধ ও লোভী এক শাসক। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের আরব জনগোষ্ঠীগুলো এখন যুক্তরাষ্ট্রকে চরমভাবে ঘৃণা করছে। এজন্য দু'টি কারণ দায়ী। এক.

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে পুরোপুরি ভাবে সহযোগিতা করছে। দুই. ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। ফরহাদের বাবার মতে, ইরানের শাহেন শাহ আর বেশীদিন ক্ষমতায় টিকবেন না।

ফরহাদের বাবা বললেন, "পঞ্চাশের দশকে আপনারা মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন আপনাদেরই প্রয়োজনে। ওই ঘটনাতেই এবারের বিদ্রোহের বীজ লুকিয়ে ছিল। সেই সময়ে আপনারা ও আমরা এই ঘটনাকে একটি চমৎকার কৌশল বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়া এখন আপনাদের ও আমাদের তাড়া করছে।"

তার কথায় আমি রীতিমত হতবাক হলাম। ইয়ামিন ও ডকের কাছ থেকে আমি এ ধরনের কথা শুনেছি। কিন্তু তারা শাহেন শাহের বিরোধী পক্ষের লোক। অন্যদিকে ফরহাদের বাবা হচ্ছে ইরানের সরকার পক্ষের অন্দর মহলের লোক। তার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমি ঠিক মতো বুঝতে পারলাম। ততদিনে ইরানে গোপন ইসলামী সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা বহু তথ্য যোগাড় করতে পেরেছি। তারপরও আমরা ভাবছি যে, ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এখনও শাহেন শাহকে সমর্থন করছে। তাই তিনি এখনও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। কিন্তু ইরানী জেনারেলের মন্তব্যের দৃঢ়তা আমার চিন্তা-ভাবনাকে টলিয়ে দিলো।

তিনি বললেন, "আমার কথা মনে রাখুন। শাহেন শাহের পতন হবে এক সুদূরপ্রসারী ঘটনা প্রবাহের সূচনা মাত্র। পুরো মুসলিম বিশ্বই চাপা ক্রোধে টগবগ করে ফুটছে। দীর্ঘদিন ধরে এই ক্রোধ তিলে তিলে জমা হয়েছে। বহুদিন এই ক্রোধকে ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। খুব শিগগির এই পুঞ্জীভূত ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটবে।"

সেদিন রাতেই আমি আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। ফরহাদ ও তার বাবা খোমেনীর উগ্র ডানপন্থী মতবাদকে সমর্থন করেন না। কিন্তু খোমেনী যেভাবে শাহেন শাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছেন তা দেখে তারা রীতিমত অভিভূত হয়েছেন। রুহুল্লাহ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট।" খোমেনী ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তেহরানের কাছাকাছি একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে যখন ইরানের শাহেন শাহ ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ঘটেছিল তখন খোমেনী কোন পক্ষকেই সমর্থন করেন নি। কিন্তু ষাটের দশকে খোমেনী শাহেন শাহের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলতে শুরু করলেন। শাহেন শাহ খোমেনীকে প্রথমে তুরস্কে নির্বাসিত করলেন। পরে ইরাকের শিয়া প্রধান আন নাজাফ শহরে তাকে নির্বাসিত করা হলো। এখানেই তিনি শাহেন শাহ বিরোধী আন্দোলনের অঘোষিত নেতায় পরিণত হলেন। আন নাজাফ শহর থেকেই পরবর্তী প্রায় দু'দশক সময়ে তিনি অসংখ্য চিঠি, প্রবন্ধ ও রেকর্ড করা বাণী ইরানে পাঠিয়েছিলেন। এগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শাহের পতন ঘটিয়ে ইরানে আয়াতুল্লাহদের শাসন কায়েম করা।

রোমে ফরহাদের সাথে ডিনার করার দু'দিন পর ইরানে দাঙা ঘটার ও পুলিশের গুলিবর্ষণ করার খবর পাওয়া গেল। খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানের আয়াতুল্লাহগণ শাহেন শাহের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করেছেন। দ্রুতগতিতে ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করল। ফরহাদের বাবা যে চাপা গণরোষের কথা বলেছিলেন গোটা ইরান জুড়ে সেই গণরোষের ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে শাহেন শাহ সপরিবারে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এরপর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ভর্তি হলেন নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে।

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর অনুসারীরা ইরানে তার প্রত্যাবর্তন দাবি করলেন। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে দেশটির একটি ধর্মীয় ছাত্র সংগঠন তেহরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে এর ৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিম্মি করল টানা ৪৪৪ দিনের জন্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার জিম্মিদের মুক্ত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর কমান্ডো ইউনিটগুলো দূতাবাসে হামলা চালালো। এই হামলা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। সেই সাথে প্রেসিডেন্ট কার্টারের জনপ্রিয়তা সূচকে বিপুল ধস নামালো।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংগঠন ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর প্রচণ্ড চাপের কারণে ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহ যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ইরান ত্যাগ করার পর কোন দেশই তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চাইছিল না। অথচ তিনি ক্ষমতায় থাকার সময় বহু দেশ ইরান থেকে কমিশন রেটে জ্বালানী আমদানী করার আশায় তাকে তোয়াজ করেছে। কিন্তু তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কোন দেশই তাকে গ্রহণ করতে চায়নি। অবশেষে সহানুভূতি দেখালেন পানামার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওমর তোরিজো। তোরিজো ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহের নীতিগুলোকে কোনদিনও পছন্দ করেননি। তারপরও ওমর তোরিজো প্রাক্তন শাহেন শাহকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিলেন। যে প্রাসাদে নতুন পানামা যোজক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই প্রাসাদেই ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহ সপরিবারে আশ্রয় নিলেন।

ইরানের আয়াতুল্লাহ মার্কিন জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে প্রাক্তন শাহেন শাহের প্রত্যাবর্তন দাবি করলেন। নতুন পানামা যোজক চুক্তির বিরোধিতাকারী মার্কিন লবিটি ওমর তোরিজোর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রাক্তন শাহেন শাহকে মদদ দানের ও মার্কিন নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগ উত্থাপন করল। এই লবিটিও ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহকে ইরানে ফেরৎ পাঠানোর দাবিকে সমর্থন করল। অথচ মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই লবিটি ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহের কট্টর সমর্থক ছিল। ইরানের এককালের অতি পরাক্রান্ত অধিপতি নিঃশব্দে মিশরে ফিরে এসে নীরবে মৃত্যু বরণ করলেন।

এদিকে ডকের পূর্বাভাস বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। মেইন ও এর প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে একেবারে খালি হাতে ইরান থেকে বিদায় নিতে হলো। জিমি কার্টার ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। রোনাল্ড রেগান

যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করলেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি মার্কিন জিম্মিদের মুক্তি, ইরানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম ও নতুন পানামা যোজক চুক্তিকে সংশোধন করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। সেদিন পুরো যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আমার জন্য এই শিক্ষাটি ছিল অখণ্ডনীয়। ইরানের ঘটনাবলী একটি সত্যকে প্রমাণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাকি বিশ্বে নিজের প্রকৃত ভূমিকাকে অস্বীকার করার জন্য সব সময়ই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইরানের শাহেন শাহের বিরুদ্ধে যে গণরোষ গড়ে উঠছে ও তা যে এতো ভয়াবহভাবে বিস্ফোরিত হবে, এই ব্যাপারটি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে মোটেও আঁচ করতে পারে নি এ কথাটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এমনকি মেইনের মতো যে সব মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ ইরানের বিভিন্ন স্থানের শাখা অফিস চালিয়ে ব্যবসা করেছে সেগুলো যে কোন কিছু বুঝতে পারেনি তাও গ্রহণযোগ্য নয়। আসল ঘটনা অন্যরকম। পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোর মতো সকলেই ইরানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার খবর রাখতো। কিন্তু কখনই তা প্রকাশ্যে প্রচার করা হয়নি। বিশেষত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই এক্ষেত্রে আমাদের অন্ধ সাজতে উৎসাহিত করেছে।

অন্ধ হলেই যে প্রলয় বন্ধ থাকে না সে কথাটি ইরানে আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

অধ্যায়-২১
কলম্বিয়া ঃ লাতিন আমেকিার চাবিকাটি

সৌদি আরব, ইরান ও পানামা ছিল চিত্তাকর্ষক অথচ বিশৃঙ্খলা কাহিনী। এসব কাহিনী ছিল মেইনের সাধারণ কর্মকাণ্ডের ধারার ব্যতিক্রম। প্রথম দু'টি দেশ সুবিপুল জ্বালানী সম্পদের অধিকারী। তৃতীয় দেশের হাতের রয়েছে পানামা যোজক প্রণালী। তাই এসব দেশে মেইন ভিন্ন ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কলম্বিয়ার পরিস্থিতি ছিল মেইনের সিংহভাগ কর্মক্ষেত্রের মত। দেশটিতে মেইন এক বিশাল পানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের ভার পেয়েছিল।

কলম্বিয়ার একজন অধ্যাপক আমেরিকান অঞ্চলের কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একটি তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণাত্মক বই লিখেছেন। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট হচ্ছেন প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক যিনি কলম্বিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি মানচিত্রকে দেখিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এই কর্নেল কলম্বিয়াকে ল্যাটিন আমেরিকার চাবিকাঠি বলে বর্ণনা করেছিলেন। আমি অবশ্য এই কাহিনীর সত্যতা যাচাই করতে পারিনি। তবে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে কলম্বিয়ার গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা যায়। কেননা, এই দেশটির মাধ্যমে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার সাথে দক্ষিণ আমেরিকার স্থল যোগাযোগ বজায় রয়েছে।

থিয়োডোর রুজভেল্ট ঠিক এই ভাষাতেই কলম্বিয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলেন কিনা তা যাচাই করার কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। তবে তিনি যে দেশটির প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা তার নীতিমালাকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। গত দুই শতাব্দী যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়াকে ল্যাটিন আমেরিকার চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছে। বাস্তবিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়াকে দক্ষিণ আমেরিকায় ঢোকার সদর দরজা রূপে ব্যবহার করেছে। আর এই প্রবেশের কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয়ই।

কলম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর ও পানামা, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে ভেনেজুয়েলা এবং দক্ষিণে

ব্রাজিল, পেরু ও ইকুয়েডর রয়েছে। দেশটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ক্যারিবিয়ান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলগুলোতে রয়েছে নারিকেল গাছের সারি। দেশটির মধ্যাঞ্চল জুড়ে রয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা। পূর্বাঞ্চল গঠিত হয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ উর্বর পম্পা সমভূমি দিয়ে। আর দক্ষিণে রয়েছে আমাজান অববাহিকার নোনা অরণ্যের প্রাণ প্রাচুর্যের ঐশ্বর্য। এমনকি জনগোষ্ঠীর দিক থেকেও কলম্বিয়া বৈচিত্র্যের সমাহার। স্থানীয় তাইরোনা থেকে শুরু করে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত বহু জনগোষ্ঠী দেশটিতে বসতি স্থাপন করেছে। তাই একেক গোষ্ঠীর দৈহিক গড়ন, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবিকা একেক রকম।

ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যায় যে, কলম্বিয়া ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উপনিবেশিক যুগে কোস্টারিকা ও পেরুর মাঝখানে যত স্প্যানিশ উপনিবেশ ছিল সবগুলোকে কলম্বিয়া থেকে শাসন করা হতো। গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় যত স্প্যানিশ উপনিবেশ ছিল সেগুলোর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী কলম্বিয়ার কার্তাগেনা বন্দরে এসে জড়ো হতো। এরপর স্প্যানিশ নৌ বহরের গোল্ড গ্যালিয়ন জাহাজগুলোতে করে এসব সামগ্রী যেত সুদূর স্পেনের বন্দরগুলোতে। দক্ষিণ আমেরিকার সকল স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ঘটেছে কলম্বিয়াতে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কলম্বিয়ার বোয়াকাতে সাইমন বলিভারের নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনী স্প্যানিশ ভাইসরয়ের নেতৃত্বাধীন স্প্যানিশ সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। সে থেকেই সূচনা ঘটেছিল স্বাধীন বলিভিয়াকে প্রতিষ্ঠা করার এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে।

আধুনিক যুগে কলম্বিয়া লাতিন আমেরিকার সেরা লেখক, শিল্পী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগকে উপহার দিয়েছে। সেই সাথে দেশটির সরকারগুলোকে মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দায়িত্বশীল বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি কলম্বিয়ার আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আদর্শ ধরে নিয়ে এর আদলেই ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশকে পুনর্গঠনের কর্মসূচী তৈরি করেছিলেন। কলম্বিয়া গুয়াতেমালার মতো সিআইএ'র তৈরি দেশ ছিল না। এ কারণে কলম্বিয়া উগ্র ডানপন্থী ও চরম বামপন্থী শাসনের বিকল্প হিসেবে মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক শাসনকে উপহার দিতে পেরেছিল। সেই সাথে দক্ষিণ আমেরিকার দুই শক্তিশালী দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতো কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহ করত না। তাই মাদক ব্যবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাতি অর্জনের পরেও কলম্বিয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীল মিত্র।

কলম্বিয়ার ইতিহাসে গৌরবের পাশাপাশি ঘৃণা ও হিংসার কাহিনীগুলোও রয়েছে। একদিন যে দেশ ছিল স্পেনের প্রধান রাজ প্রতিনিধির আসন সে দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম মতের বিরুদ্ধবাদীদের নির্মম হাতে দমন করা হয়েছিল। আদিবাসী ও আফ্রিকার ক্রীতদাসদের অস্থিপুঞ্জের উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল জমকালো দুর্গ, হাসিয়েন্দা (যার অর্থ, বসতবাড়ি সংবলিত বিশাল বিশাল তালুক) ও নগরগুলোকে। প্রাচীন সভ্যতাগুলো

থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান, দুর্লভ, পবিত্র ও শৈল্পিক সামগ্রীগুলোকে স্প্যানিশ নৌ বাহিনীর গোল্ড গ্যালিয়নগুলোতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুদুর স্পেনে। স্পেনের বিজয়ী বাহিনীগুলোর তলোয়ার ও রোগ কলম্বিয়ার প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে উজাড় করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের এক বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটেছিল তাতে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ২ লাখ কলম্বিয়ানের মৃত্যু ঘটেছিল। তাই কলম্বিয়ার ইতিহাসে ১৯৪৮-১৯৫৭ সময়টি রাজনৈতিক সহিংসতার দশক রূপে পরিচিত।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন ও ওয়ালস্ট্রীট পুরো আমেরিকা অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলম্বিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকরূপে গণ্য করেছে। এজন্য বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করেছে। এক. কলম্বিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকে পরিণত করেছে। দুই. দেশটির আর্থ-রাজনৈতিক পদ্ধতি ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশের জন্য অনুপ্রেরণা ও পথ নির্দেশের উৎস রূপে কাজ করেছে। তিন. কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কফি, কলা, কাপড়, পান্না, ফুল, পেট্রোলিয়াম ও মাদকদ্রব্য রপ্তানী করে বিপুল পরিমাণে। চার. কলম্বিয়া মার্কিণ পণ্য ও সেবামূলক খাতগুলোর এক বড় গ্রাহক।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা কলম্বিয়াতে নির্মাণ ও কারিগরী প্রযুক্তি রপ্তানী করেছি বিপুল পরিমাণে। আমি যে সব স্থানে কাজ করেছি সেসব স্থানের সিংহভাগে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই নীতিই কলম্বিয়াতে প্রয়োগ করা হয়েছিল। দেশটি প্রথমে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে নিজ ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়নের জন্য বিপুল অংকের ঋণ গ্রহণ করেছিল। এরপর উন্নয়নকৃত অবকাঠামোগুলো থেকে ও আহরিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলো থেকে এসব ঋণকে সুদে-আসলে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই কলম্বিয়ার ভৌত অবকাঠামোগুলোর উন্নয়নে বিপুল অংকের অর্থ বিনিয়োগ করে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার সুবিপুল জ্বালানী ভাণ্ডারের অলিখিত মালিকে পরিণত হয়েছে। এমনকি কলম্বিয়ার অনুন্নত আমাজান অঞ্চলও মার্কিন কোম্পানীগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া হয়েছে। এর বিনিময়ে বোগোটা আন্তর্জাতিক ঋণগুলোকে পুরোপুরিভাবে পরিশোধ করতে চেয়েছে।

এটাই ছিল কলম্বিয়ার পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আমরা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই কলম্বিয়াকেও বিশ্ব সাম্রাজ্যের অনুগত সদস্যে রূপান্তরিত করেছি। আমার অন্য সব কর্মক্ষেত্রের মতই আমি কলম্বিয়ার নীতিনির্ধারক মহলের কাছে বিপুল অংকের আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছি। দেশটিতে কোন ওমর তোরিজো ছিলেন না। তাই আমি কলম্বিয়াতে আমার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসগুলোকে যথারীতি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেছি।

আমি কলম্বিয়াতেও মাঝে মধ্যে অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছি। এরপরও দেশটি, আমার ব্যক্তিগত আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল। সত্তরের দশকের শুরুতে আমি ও অ্যান কয়েক মাস

কলম্বিয়াতে কাটিয়েছি। এমনকি ক্যারিবিয়া সাগরের এক পাহাড়ি উপকূলে কিস্তিতে একটি কফি খামারও কিনেছিলাম। সেই সময় আমরা নিজেদের মধ্যকার অতীত তিক্ততাকে অনেকখানিই মুছে ফেলতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরে পরিস্থিতির আর কোন উন্নতি ঘটে নি। বরঞ্চ অবনতি ঘটতে ঘটতে তা বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ ঘটনার পরবর্তী সময়ে আমি কলম্বিয়াকে ঠিক মতো চিনতে শিখলাম।

সত্তরের দশকে মেইন কলম্বিয়াতে অনেকগুলো বিশালাকার প্রকল্পকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছিল। এসব প্রকল্পের সিংহভাগই ছিল দেশটির বিভিন্ন স্থানে পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি স্থাপন। এসব প্রকল্প চালু হওয়ার পর কলম্বিয়ার গহীন অরণ্য থেকে পর্বত শিখর, সমুদ্র উপকূল থেকে পম্পা সমভূমি, সবখানেই বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমাকে ক্যারিবিয়ান সাগর উপকূলের একটি শহর বারানকুইলাতে অফিস দেওয়া হয়েছিল। এখানেই ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে আমি কলম্বিয়ার এক সুন্দরী যুবতীর সাথে পরিচিত হলাম। এই মেয়েটিই আমার জীবনকে পুরোপুরি পাল্টে দিলো।

পলার ছিল লম্বা সোনালী চুল ও উজ্জ্বল সবুজ চোখ। কলম্বিয়ার মেয়েদের এ রকম চুল ও চোখ সচরাচর দেখা যায় না। পলার মা-বাবা উত্তর ইতালী থেকে এসে কলম্বিয়াতে বসতি গেড়েছিল। নিজ পূর্বসূরীদের মতই পলা ছিল একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। সেই সাথে সে একটি ছোট্ট কারখানা তৈরি করেছিল। এই কারখানাতে পলার ডিজাইন মাফিক কাপড় তৈরি হতো। এসব কাপড় কলম্বিয়া, পানামা ও ভেনেজুয়েলার নামী দোকানগুলোতে বিক্রি হতো। পলা ছিল একজন গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন নারী। তার সহমর্মিতার প্রভাবেই আমি বিবাহ বিচ্ছেদের ধাক্কাকে সামলে উঠতে পেরেছিলাম। নারীদের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক হয়েছিল। এর পাশাপাশি পলা আমাকে নিজ কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখিয়েছিল।

আমি আগেই বলেছি যে, মানুষের জীবন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন সমানুপাতিক ঘটনা সমূহের সমাহার। আমার প্রথম জীবনে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি নিউ হ্যাম্পশায়ারের অজো-পাড়াগাঁয়ের একটি জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকের ছেলে হিসেবে বড় হয়েছি। এরপর পরিচিত হয়েছি অ্যান ও আঙ্কল ফ্র্যাঙ্কের সাথে। তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানকে এড়াতে গিয়ে পীস কোরের চাকরি নিয়ে ইকুয়েডরের গহীন অরণ্যে দিন কাটিয়েছি। সেখানে পরিচয় হয়েছে এইনার গ্রিভের সাথে। আমরা যখনই আমাদের জীবনে এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হই তখনই আমাদের সামনে একাধিক পছন্দ এসে দাঁড়ায়। কিভাবে আমরা এসব ঘটনাকে মোকাবিলা করি। এজন্য আমরা কোন পথকে বেছে নেই, তার উপরেই ঘটনার ফলাফল নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে আমি নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, অ্যানকে বিয়ে করা, পীস কোরের চাকরি নেওয়া, মেইনের চাকরিতে যোগদান করা ও অর্থনৈতিক ঘাতকের ক্যারিয়ারকে বেছে নেওয়া- এসব সিদ্ধান্ত আমাকে নিজ জীবনের বর্তমান পর্যায়ে টেনে এনেছে।

পলার সাথে পরিচিত হওয়াটাও আমার জীবনের আরেকটি সমানুপাতিক ঘটনা। তার প্রভাবে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। পলার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমি নিজ ক্যারিয়ার সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে সন্তুষ্টই ছিলাম। মাঝে মধ্যে আমি নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিজ বিবেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম। কখনও কখনও তীব্র অপরাধবোধ আমার মনকে আচ্ছন্ন করত। তারপরও নিজ ক্যারিয়ারকে বজায় রাখার মতো যুক্তি আমি সব সময়ই খুঁজে পেতাম। খুব সম্ভবত পলা ঠিক সময়ই আমার জীবনে এসেছিল। হয়তোবা সৌদি আরবে, পানামায় ও ইরানে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তা আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করত। এক নারী ক্লডিন আমাকে অর্থনৈতিক ঘাতকে রূপান্তরিত করেছিল। আরেক নারী পলা আমাকে ওই জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সহযোগিতা করল। সে আমাকে নিজের মাঝে ডুব দিতে অনুপ্রাণিত করল। ডুব দিয়েই বুঝতে পারলাম যে, আমি চরমভাবে অসুখী।

শুরু হলো আমার সাথে আমার নিজেরই লড়াই।

অধ্যায়-২২

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিশ্ব সাম্রাজ্য

একদিন আমি ও পলা কফির দোকানে বসে কফি পান করছি আর আড্ডা মারছি। কথায় কথায় পলা বলল, "আজ আমি স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটা কঠিন সত্য কথা বলব। যে নদীতে তোমরা বাঁধ তৈরি করছ সেই নদীর তীরে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো ও কৃষকদের দল তোমাদের চরমভাবে ঘৃণা করছে। এমনকি নদীর কাছের শহরগুলোর বাসিন্দারা, যারা বাঁধের কারণে সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, তারাও তোমাদের নির্মাণ শিবিরগুলোতে হামলা পরিচালনাকারী গেরিলাবাহিনীগুলোকে সমর্থন করছে। তোমাদের সরকার এসব গেরিলাযোদ্ধাকে কমিউনিস্ট, সন্ত্রাসী ও মাদকদ্রব্য পাচারকারীরূপে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অন্যরকম। তোমার প্রতিষ্ঠান যে জমির উপরে বাঁধ তৈরি করছে সেই জমিতেই এসব গেরিলাযোদ্ধাদের পরিবারগুলো যুগ যুগ ধরে বাস করেছে।"

আমি তখন পলাকে ম্যানুয়েল তোরের কাহিনী শোনালাম। তোরে মেইনের একজন প্রকৌশলী। পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের কাজ তদারকি করার জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। ক'দিন আগে একদল গেরিলাযোদ্ধা তোরে ও তার শ্রমিকদের উপরে হামলা চালিয়েছিল। ম্যানুয়েল তোরে কলম্বিয়ার একজন নাগরিক। মেইনের নীতি অনুযায়ী, যে কোন নির্মাণ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে যতটা সম্ভব স্থানীয় প্রকৌশলী, কারিগর, কর্মী ও শ্রমিক নিয়োগ করা হতো। আমাদের অনেকেই, এমনকি স্থানীয় নীতিনির্ধারকদের একাংশ, এই নীতিকে স্থানীয় নাগরিকদের খুশি করার পন্থা বলে মনে করতেন। আমি এই নীতিকে মনে মনে ঘৃণা করতাম। আর এই ঘৃণার কারণেই আমার পক্ষে নিজ দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি বললাম, "গেরিলারা আকাশে ও ম্যানুয়েলের পায়ের দিকে একে -৪৭ রাইফেলের গুলি ছুঁড়েছিল। ম্যানুয়েল যখন আমাদেরকে এসব কথা শোনাচ্ছিল তখন তার কণ্ঠ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ঘটনা ঘটেছিল তখন নিশ্চয়ই সে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, কেউই গেরিলাদের গুলিতে আহত বা নিহত হয়নি। গেরিলারা স্রেফ ম্যানুয়েলের হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিল। এরপর রাইফেলের মুখে ম্যানুয়েল ও তার লোকদের স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। ওরা নৌকা বেয়ে জান হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।"

পলা বিস্ময়ের সুরে বলল, "ইস! ওরা তো সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল।"

আমি একমত হয়ে বললাম, "ঠিক তাই। আমি ম্যানুয়েলের কাছে একটি তথ্য জানতে চেয়েছিলাম। যে সব গেরিলাযোদ্ধা ওই শিবিরে হামলা করেছিল তারা কি ফার্ক, না এম-১৯ বাহিনীর সদস্য? কলম্বিয়ার গেরিলাবাহিনীগুলোর মধ্যে এই দু'টিই হচ্ছে সবচেয়ে কুখ্যাত।"

পলা জানতে চাইল, "ম্যানুয়েল কি বলল?"

আমি জবাব দিলাম, "ম্যানুয়েলের মতে এরা ফার্ক ও এম-১৯ কোন দলেরই সদস্য নয়। তবে গেরিলাদের চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা সে বিশ্বাস করে।"

আমি যে খবরের কাগজটি সাথে করে নিয়েছিলাম সেটিকে তুলে ধরে পলা গেরিলাদের চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনাল।

"আমরা স্রেফ আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের নামে শপথ করছি যে, আমরা আমাদের নদীগুলোতে বাঁধ তৈরি করতে দেবো না। আমরা সহজ-সরল আদিবাসী ও মেস্তেজো। কিন্তু আমরা আমাদের জমিকে নদীর পানির নিচে তলিয়ে যেতে দেবো না। আমরা আমাদের কলম্বিয়ান ভাইদেরকে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ না করার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি।"

পলা খবরের কাগজ নামিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি ম্যানুয়েলকে কী বলেছ?"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আমার কোন উপায় ছিল না। আমাকে মেইনের আইন-কানুন মানতেই হবে। আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, কলম্বিয়ার কোন আদিবাসী চাষীর পক্ষে এ ধরনের চিঠি লেখা সম্ভব কিনা।"

পলা শান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল।

পলার চোখে চোখ রেখে আমি বললাম, "ম্যানুয়েল কোন কথা বলে নি। তবে আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে মাত্র। এ ধরনের জেরা করতে আমি যে কতোটা ঘৃণা বোধ করি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।"

পলা আলতোভাবে চাপ বাড়ালো, "এরপর তুমি কী করলে?"

আমি কোমল সুরে বললাম, "আমি টেবিলে ঘুষি মেরেছি। আমি তার উপরে মানসিক চাপ প্রয়োগ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, এ পর্যন্ত কোন কলম্বিয়ান চাষীর হাতে সে একে-৪৭ রাইফেল দেখেছে কিনা। তার কাছে জানতে চেয়েছি যে, একে-৪৭ রাইফেল কে আবিষ্কার করেছে?"

পলা কোমলতর সুরে জানতে চাইল, "ম্যানুয়েল কী বলল?"

আমি জবাব দিলাম, "ও ঠিক জবাবই দিয়েছে। কিন্তু ওর কথাগুলো শুনতে ও বুঝতে

আমাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। সে এখন পর্যন্ত কোন কলম্বিয়ান চাষীর হাতে একে-৪৭ রাইফেল দেখে নি। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে সে শুধু রাশিয়ান শব্দটি উচ্চারণ করতে পেরেছে। তার জবাব যে ঠিক এ কথাটি তাকে আমি বলেছি। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আন্দ্রে কালাশনিকভ নামের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা একে-৪৭ রাইফেল আবিষ্কার করেছিলেন। কমিউনিস্ট গেরিলা যোদ্ধারা যে এই চিঠিটি লিখেছে সে কথাটি আমি ম্যানুয়েলকে বোঝাতে পেরেছি।"

পলা নিচু সুরে প্রশ্ন করল, "তুমি কি এই কথাটি বিশ্বাস করো?"

তার প্রশ্নটি আমাকে থামিয়ে দিলো। এর জবাব আমি কিভাবে দেবো? তখন আমার ইরান সফরের কথা মনে পড়ল। ইয়ামিন আমাকে দুই ভুবনের মধ্যকার লোক বলে আখ্যায়িত করেছিল। আমি ভাবলাম যে, যখন গেরিলাযোদ্ধারা শিবিরে হামলা চালিয়েছিল, তখন যদি আমি সেখানে থাকতাম! পরক্ষণেই ভাবলাম যে, যদি আমি গেরিলাবাহিনীর একজন সদস্য হতে পারতাম! একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি ডক, ইয়ামিন ও কলম্বিয়ান গেরিলাযোদ্ধাদের ঈর্ষা করতে লাগলাম। তারা একটি আদর্শকে বিশ্বাস করে। তারা কঠিন বাস্তব জগতকে বেছে নিয়েছে। আমার মতো দু'টি জগতের মাঝে ঝুলে থাকে নি।

অবশেষে আমি বললাম, "আমার তো নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।"

পলা কিছু না বলে মৃদু হাসি হাসল।

আমি বলতে লাগলাম, "আমি এটাকে ঘৃণা করি।" বলেই থামলাম। চুপ করে টম পেইন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী অন্যান্য নায়ক, জলদস্যু ও সীমান্তের দুর্ধর্ষ বাসিন্দাদের কথা চিন্তা করলাম। বহু বছর ধরে আমি এদের কথা চিন্তা করেছি নানা কারণে। এরা সবাই দৃঢ়ভাবে একটি মাত্র জগতকে বেছে নিয়েছিল। দু'টি জগতের মাঝে অসহায়ভাবে আটকে থাকে নি। এরা যে কোন একটি আদর্শকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এর ফল ভোগ করেছে। এরপর বললাম, "প্রতিদিন নিজ কাজের প্রতি আমার ঘৃণা একটু একটু করে বাড়ছে।"

সে আমার হাত ধরল। বলল, "তোমার চাকরি?"

আমরা একে অপরের চোখের দিকে স্থিরভাবে কতক্ষণ চেয়ে রইলাম। আমি প্রশ্নটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলাম। বললাম, "আমাকে।"

সে আমার হাতে আলতো চাপ দিয়ে ধীরে মাথা নাড়ল। কথাটা স্বীকার করতে পেরে আমি স্বস্তি অনুভব করলাম।

পলা তখন জিজ্ঞেস করল, "জন এরপর তুমি কি করবে?"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। স্বস্তি রূপান্তরিত হলো আত্মরক্ষাতে। আমি কয়েকটি সাধারণ যুক্তি দাঁড় করাতে চাইলাম। আমি অন্যদের উপকার করতে চাইছি। আমি ভেতর

থেকে পদ্ধতিটিকে পাল্টানোর পথ খুঁজছি। যদি আমি এই চাকরি ছেড়ে দিই তাহলে আমার চেয়েও খারাপ কেউ এই দায়িত্ব পাবে। কিন্তু পলার নীরব প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারলাম যে, সে এসব যুক্তিকে মোটেও গ্রহণ করছে না। এমনকি আমার নিজের কাছেও এসব যুক্তিকে খোঁড়া অজুহাত বলে মনে হচ্ছে। সে আমাকে প্রকৃত সত্যটিকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে। আমার নৈতিক পতনের জন্য আমার চাকরি নয়, আমিই দায়ী।

অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?"

সে আলতো নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার হাতকে মুক্তি দিলো। এরপর পাল্টা প্রশ্ন করলো, "তুমি কি আলোচনার বিষয় পাল্টাতে চাইছো?"

আমি আস্তে মাথা নাড়লাম।

সে রাজি হয়ে বলল, "ঠিক আছে। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে। আমরা আরেকদিন এ বিষয়ে আলোচনা করব।" বলেই টেবিল থেকে একটি চামচ তুলে এটিকে কতক্ষণ পরীক্ষা করল। এরপর বলল, "কয়েকজন গেরিলাযোদ্ধা রাশিয়ায় ও চীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে তা আমি জানি।" চামচটিকে তার কফির কাপে চুবিয়ে নাড়ল। এরপর ধীরে ধীরে চামচটিকে চাটল। তারপর বলল, "ওদের কিইবা করার ছিল? কলম্বিয়ার সৈন্যরা তোমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ওরা তোমাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ পেয়েছে। সৈন্যদেরকে ঠিক ভাবে মোকাবেলা করতে হলে গেরিলাযোদ্ধাদেরও প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলা-বারুদ পেতে হবে। এজন্য গেরিলারা রাশিয়া ও চীনকে বেছে নিয়েছে। এসবের খরচ মেটানোর জন্য গেরিলা যোদ্ধারা চোরাকারবারীদের কাছে কোকেন বিক্রি করছে। নইলে তারা কিভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলা-বারুদের খরচ মেটাবে? আসলে গেরিলাযোদ্ধারা এক অসম যুদ্ধে লড়ছে। তোমাদের বিশ্বব্যাংক গেরিলাযোদ্ধাদেরকে একটুও সাহায্য করবে না। বরঞ্চ বিশ্বব্যাংকের কারণেই গেরিলাযোদ্ধারা সবকিছু হারিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।" বলেই সে কফির কাপে চুমুক দিলো। এরপর বললো, "তাদের মতাদর্শ যে সঠিক তা আমি বিশ্বাস করি। পুরো কলম্বিয়া জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলে এর সুফল ভোগ করবে দেশটির উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলো। কিন্তু কলম্বিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির বাইরে থাকবে। সেই সাথে পাহাড়ি নদীগুলোতে বাঁধ দেওয়া হলে আদিবাসী ও দরিদ্র চাষীরা চাষের জমি হারাবে। নদীর পানি বিষাক্ত হওয়ার কারণে মাছগুলো মারা যাবে। ফলে, দুর্ভিক্ষের কারণে বহু লোক প্রাণ হারাবে।"

যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের সম্পর্কে এতটা দরদ দিয়ে পলাকে কথা বলতে শুনে আমার পুরো শরীর শিউরে উঠছিল। আমি আমার বাহুকে জোরে চেপে ধরছিলাম।

পলার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি প্রশ্ন করলাম, "গেরিলাদের সম্পর্কে তুমি এত কথা জানলে কিভাবে?" প্রশ্নটা করেই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার মন এর জবাব শুনতে চাইছে না। কেননা, প্রশ্নটির জবাব যে মোটেও সুখকর হবে না, তা আমার মন টের পাচ্ছিল। এক তীব্র অস্বস্তি তখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সে জবাব দিলো, "আমি এদের কয়েকজনের সাথে পড়ালেখা করেছি।" এরপর একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার ভাই একটি গেরিলাবাহিনীর সদস্য।" বলেই তার কফির কাপটিকে একপাশে সরিয়ে দিলো।

এতক্ষণে আসল কথাটি জানা হলো। কথাটি শুনে আমি একেবারে চুপসে গেলাম। এতদিন আমি ভাবতাম যে, আমি পলার সব খবরই জেনে ফেলেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, তার আসল খবরটিই আমি এতদিন টের পাইনি। নিজেকে কেমন বেকুব বলে মনে হলো। যেন আমি বাড়ি ফিরে আমার বিছানায় আমার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে প্রণয়লীলায় লিপ্ত হতে দেখছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ কথাটি এতদিন বলো নি কেন?"

সে নরম গলায় জবাব দিলো, "প্রয়োজন মনে হয়নি। আর বলবই বা কেন? এটাতো অহঙ্কার করে বলার মতো কথা নয়।" বলেই একটু চুপ করে বসে রইল। এরপর বলল, "দু'বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তাকে অবশ্য খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "ও যে বেঁচে আছে তা তুমি জানলে কিভাবে?"

ও অনিশ্চিত সুরে জবাব দিলো, "আমি জানি না। তবে ক'দিন আগে সরকার ওকে ফেরারী আসামীদের তালিকাভুক্ত করেছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ।"

আমি পলাকে সমর্থন ও ওকে বিচার করার বিপরীতমুখী ইচ্ছাটিকে বহু কষ্টে দমন করলাম। কথা বলার সময় বহু কষ্টে গোপন ঈর্ষাটিকে লুকালাম। যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভাই ওই দলে ভিড়ল কিভাবে?"

ভাগ্য ভাল যে, পলা তখন কফির কাপের দিকে চেয়েছিল। এরপর আস্তে আস্তে বলল, "ওর বন্ধুদের সাথে অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর অফিসের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল আদিবাসীদের জমি ও অরণ্য থেকে জ্বালানী উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ১০-১২ জনের বেশী ছিল না। ওরা স্রেফ অফিস ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদের গান গাইছিল। এর বেশী কিছু ওরা করে নি। তারপরও পুলিশ ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করল। "ছ'মাস ওরা কারাগারে বন্দী ছিল। বের হওয়ার পর জেলখানায় কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার ভাই টু শব্দটিও করেনি। কিন্তু যখন সে মুক্তি পেল তখন সে পুরোপুরি ভাবে পাল্টে গেছে।"

পলার সাথে এ ধরনের বহু আলোচনার মধ্যে এটাই ছিল প্রথম। আর এমন আলোচনা থেকেই পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মন দুই বিপরীতমুখী চিন্তার টানে ছিঁড়ে দু'টুকরা হওয়ার যোগাড় হয়েছিল। একদিকে ছিল অর্থের আকর্ষণ ও অন্যান্য দুর্বলতাগুলো। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে এনএসএ এসব দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই আমাকে এই অন্ধকার জগতে টেনে এনেছিল। অন্যদিকে ছিল জলদস্যু ও বিদ্রোহীদের প্রতি দুর্নিবার

আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে পুঁজি করে পলা আমার সামনে আমার কর্মজগতের অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরেছিল। এ থেকেই আমি আমার মুক্তির পথকে খুঁজে পাচ্ছিলাম।

আমার ব্যক্তিগত সঙ্কটের পাশাপাশি কলম্বিয়াতে কাজ করার সময় আমি আমেরিকার প্রাচীন যুক্তরাষ্ট্র ও নয়া বিশ্ব সাম্রাজ্যের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে বুঝতে পেরেছিলাম। প্রাচীন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে আশার বাণী শুনিয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল নৈতিক ও দার্শনিক। কোন বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এর আদর্শের মধ্যে ঠাঁই পায়নি। সকলের জন্য সাম্য ও ন্যায়বিচার ছিল এর মূলনীতি। একই সাথে এটি ছিল বাস্তববোধযুক্ত একটি রাষ্ট্র। কোন অবাস্তব নীতি কখনই একে পরিচালনা করে নি। বরঞ্চ এটি ছিল জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল ও উদার একটি বাস্তব রাষ্ট্রসত্তা। এটি গোটা বিশ্বে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। একই সময় এটি ছিল একটি ভীতিপ্রদ শক্তি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই এটি প্রবল গতিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু কখনই নিজের মূলনীতিগুলোকে বিসর্জন দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে এর সেরা দৃষ্টান্ত। যেসব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকির সম্মুখীন করেছে, যেমন সরকারী আমলাতন্ত্র, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক সংস্থা, সেসব প্রতিষ্ঠান গোটা বিশ্বকে আমূলভাবে পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে পারত। এসব প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা। এসব ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষকে প্রতিহত করা খুবই সহজ। অবশ্য এজন্য এসব সংস্থাকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অন্যদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কুপরিণতি। বিশ্ব সাম্রাজ্য হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসেবক, লোভী ও বস্তুতান্ত্রিক। এটির ভিত্তি হচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থ। অতীতের সাম্রাজ্যগুলোর মতই এটি দুর্নিবার ক্ষুধায় গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব শ্রমকে গিলে খাচ্ছে। আরও ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য অর্জন করার লক্ষ্যে এটি যে কোন পন্থা অবলম্বনের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত।

এসব পার্থক্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারার সুবাদে আমি নিজ ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে পেরেছি। আমার কর্মজীবনের শুরুতেই ক্লডিন আমাকে পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছিল। একেবারে সৎভাবে সে মেইনের চাকরি দিলে আমার কাছে কী আশা করা হবে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারপরও ইন্দোনেশিয়া, পানামা, ইরান ও কলম্বিয়ায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে নিজ ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপকে চিনতে শিখিয়েছে। আর এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে পলার মত নারীর ধৈর্য্য, ভালবাসা ও ব্যক্তিগত কাহিনী।

আমি সব সময়ই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলাম। কিন্তু ভিয়েতনামে আমরা সামরিক শক্তি দিয়ে যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক শক্তি দিয়ে তা অর্জন করার লক্ষ্যে আমরা সাম্রাজ্যবাদের নতুন ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কলাকৌশলগুলোকে প্রয়োগ করছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের ব্যর্থতা সামরিক শক্তি প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই আমাদের অর্থনীতিবিদগণ উন্নততর

পরিকল্পনাকে প্রণয়ন করেছেন। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই পরিকল্পনাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করছে।

বিভিন্ন মহাদেশের বিবিধ দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর পক্ষে কিভাবে লোকজন কাজ করছে তা আমি দেখেছি। এরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্থনৈতিক ঘাতক দলের সদস্য নয়। তারপরও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের চেয়ে বেশী ভয়াবহ ভূমিকায় এসব লোক কাজ করছে। মেইনের বেশীর ভাগ প্রকৌশলীর মতো এরাও নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে অন্ধ। তারা মনে করে যে, গোটা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ছোটখাটো কারখানায় যে সব পণ্য নির্মাণ করা হচ্ছে তা ওইসব কারখানার শ্রমিকদের দারিদ্র্য মধ্যযুগের খামার ও কারখানাগুলোতে কাজ করা ক্রীতদাসদের পর্যায়েই অবস্থান করছে। অতীতের শ্রমিকদের মতই বর্তমান শ্রমিকরা নিজেদেরকে ইউরোপের বস্তিগুলোতে, আফ্রিকার জঙ্গলে বা আমেরিকার বুনো পশ্চিমে কর্মরত শ্রমিকদের চেয়ে বেশী স্বচ্ছল মনে করে। কিন্তু এতে ক্রীতদাসের বাস্তব পরিস্থিতি মোটেও পাল্টায় না।

আমি মেইনে চাকরি করব, না ছেড়ে দেবো এই দ্বন্দ্ব আমার মানসিক ক্ষেত্রে এক যুদ্ধে পরিণত হলো। আমার বিবেক এই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে গোঁ ধরে বসল। কিন্তু আমার বাস্তববাদী সত্তাটি তখনও এতে সায় দিতে পারছিল না। দিনে দিনে আমার নিজ সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ছে। বাড়ছে আমার কর্মক্ষেত্র, কর্মীবাহিনী, সম্পদ ও আত্মঅহমিকা। অর্থ, জীবনযাত্রার বিলাসিতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমি ক্লডিনের বলা কথাগুলোকেও মনে করতাম। ও বলত যে, একবার এ জগতে ঢুকলে এ থেকে বেরুনোর পথ খোলা নেই।

কথাটি শুনে পলা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, "ও কী জানে?"

আমি বললাম, "ওর কথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফলেছে।"

শান্ত সুরে পলা পাল্টা জবাব দিলো, "সেতো অনেকদিন আগের কথা। মানুষের জীবন প্রতিক্ষণেই বদলায়। তাছাড়া তাতে কী আসে যায়? তুমি নিজেকে নিয়ে সুখী নও। ক্লডিন বা অন্য কেউ কি খারাপ কোন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে?"

এ কথাটি পলা বার বার বলত। অবশেষে আমি এটিকে মেনে নিলাম। আমি নিজের ও পলার কাছে স্বীকার করলাম যে, অর্থ, উত্তেজনা ও চাকচিক্য মানসিক চাপ, অপরাধবোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে মুছে ফেলতে পারছে না। মেইনের অংশীদার হিসেবে আমার ঐশ্বর্য প্রতিনিয়ত বাড়ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আর বেশীদিন এই জগতে বাস করলে আমি এর স্থায়ী ক্রীতদাসে পরিণত হব।

একদিন আমরা কার্তাগেনার প্রাচীন স্প্যানিশ দুর্গের কাছের সাগর সৈকতে পায়চারি করছিলাম। এখানে অতীতে বহুবার জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিল। হঠাৎ করে পলা এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করল। আমি এজন্য একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম।

পলা জিজ্ঞেস করল, "তুমি যা জান তা নিয়ে যদি কোনদিন কিছু না বলো তাহলে কী ঘটবে?"

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "তুমি আমাকে একেবারে বোবা সাজতে বলছ?"

ও জবাব দিলো, "ঠিক তাই। ওদেরকে তোমার পেছনে তাড়া করার কোন অজুহাত দিও না। বরঞ্চ ওরা তোমাকে নিশ্চিত জীবনযাপনের সুযোগ দিক। কোন পক্ষই যেন কোনদিন পানি ঘোলা না করে।"

ওর বুদ্ধিটা যে ঠিক তা আমি বুঝতে পারলাম। এই বুদ্ধিটা কেন এতদিন আমার মাথায় আসেনি, তা আমি ভেবেও পেলাম না। আমি যেসব নির্মম বাস্তবতার মোকাবিলা করেছি এতদিন সেগুলোকে কোনদিন কোন ভাবেই প্রকাশ করব না। আমি এই ভয়াবহ শক্তির বিরুদ্ধে লড়ব না। বরঞ্চ সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন উপভোগ করব। মনের সুখে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব। পলার মতো কারোর সাথে নতুনভাবে সংসার পাতব। যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমি এই অন্ধকার জগত থেকে বেরিয়ে যাব।

পলা যোগ করল, "ক্লডিন তোমাকে যা শিখিয়েছিল তার পুরোটাই মিথ্যা। এমনকি তোমার জীবনটাও মিথ্যা। "সে মৃদু ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল। এরপর প্রশ্ন করল, "তুমি কি এর মধ্যে তোমার জীবন বৃত্তান্ত পড়েছ?"

আমি জবাব দিলাম, "না তো।"

সে উপদেশ দিলো, "পড়ে দেখ। ক'দিন আগে আমি এর স্প্যানিশ অনুবাদটিকে পড়েছি। যদি তা ইংরেজীতে লেখা মূল সংস্করণের হুবহু অনুবাদ হয় তাহলে তুমি মূল সংস্করণে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাবে।"

অধ্যায়-২৩
জীবন বৃত্তান্তে মিথ্যাচার

আমি কলম্বিয়তে থাকার সময়ই খবর পেলাম যে, মেইনের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে জেক ডওবার অবসর নিয়েছেন। সংস্থাটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যাক হল, ব্রুনো জামবোত্তিকে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট পদে পদোন্নতি দিয়েছেন। এটা অবশ্য হিসাব মাফিকই ঘটেছে। বোস্টন ও বারানকুইলার মধ্যকার সবকটি ফোন লাইনই পাগলের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাই আমার পদোন্নতিরও পূর্বাভাস জারি করল। কেননা, আমি ব্রুনোর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে একজন।

এসব পরিবর্তন ও গুজব আমাকে আমার অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য ব্যাপকভাবে সাহায্য করল। কলম্বিয়াতে থাকার সময় আমি পলার উপদেশ মাফিক নিজ জীবন বৃত্তান্তের স্প্যানিশ অনুবাদটিকে পড়েছিলাম। পড়ে আমি রীতিমত স্তব্ধ হলাম। বোস্টনে ফিরে এসে আমি জীবন বৃত্তান্তের ইংরেজী সংস্করণ ও মেইনের প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িকী মেইনলাইন্সের নভেম্বর ইস্যুটিকে যোগাড় করলাম। সাময়িকীতে প্রকাশিত "বিশেষজ্ঞগণ মেইনের গ্রাহকদের নতুন সেবা উপহার দিচ্ছেন।" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার কথা বলা হয়েছে।

অন্য সময় আমি এই জীবন বৃত্তান্ত ও প্রবন্ধ পড়লে গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু পলা আমার তৃতীয় নয়নকে খুলে দিয়েছে। এখন এগুলোকে পড়ে আমি রীতিমত ক্রুদ্ধ ও হতাশ হলাম। এসব প্রকাশনায় যে সব তথ্যকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো পুরোপুরিভাবে মিথ্যা না হলেও ইচ্ছামূলক মিথ্যাচার। এসব তথ্যের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো বর্তমান বাস্তবতার প্রতিফলন। সেই সাথে বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেগুলোর অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এগুলো হচ্ছে প্রকৃত বাস্তবতাকে আড়াল করার লক্ষ্যে তৈরি করা একটি সুশোভন ছদ্মবেশ। এক বিচিত্র উপায়ে তারা আমার অন্ধকার জীবনের উপরে একটি চমৎকার মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে।

আমার জীবন বৃত্তান্তে যে সব তথ্যকে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর জন্য আমি অনেকাংশে দায়ী তা অনুভব করে আমার ক্রোধ হতাশা আরও বাড়ল। মেইনের নিয়ম অনুযায়ী এর প্রত্যেক কর্মীকেই হালনাগাদ জীবন বৃত্তান্ত তৈরি করতে হয়। এতে গ্রাহকসেবার সর্বশেষ দায়িত্ব পালনের বিবরণ দিতে হয়। যদি কোন বিপণন কর্মকর্তা বা

প্রকল্প ব্যবস্থাপক আমাকে কোন প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত করতে না চান, অন্য কোনভাবে আমার পরিচিতিকে কাজে লাগাতে চান, তাহলে তিনি নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী আমার জীবন বৃত্তান্তকে ব্যবহার করতে পারবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন অথবা বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমি যে সব প্রতিবেদনকে উপস্থাপন করেছি সেগুলোকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আমার কর্মজীবনের যে অংশটিকে যেভাবেই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তা করার আগে আমার অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু মেইনের আর সব কর্মীর মতো আমিও প্রচুর ভ্রমণ করি। তাই আমার অনুপস্থিতিতে ব্যবহারকারী তার পছন্দ মাফিক আমার জীবন বৃত্তান্তের অংশ বিশেষকে ব্যবহার করবেন এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই পলা আমার জীবন বৃত্তান্তের যে স্প্যানিশ সংস্করণটি পড়েছিল সেটি এবং এর মূল ইংরেজী সংস্করণটি আমার কাছে একেবারেই নতুন। অবশ্য এই নতুন বৃত্তান্তে যে সব তথ্যকে ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো আমার ব্যক্তিগত নথিতে রয়েছে।

প্রথমবার পড়লে আমার জীবন বৃত্তান্তকে নির্দোষ বলেই মনে হবে। এর অভিজ্ঞতা শিরোনামের নিচে বলা হয়েছে যে, আমি যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছি। অন্যদিকে দায়িত্ব শিরোনামের নিচে আমার কাজগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোকে বয়ান করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে — উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, জ্বালানী চাহিদা ও ভৌত অবকাঠামোগুলোর উন্নতিসূচক প্রণয়ন করা। এই অংশের শেষদিকে আমার ইকুয়েডরে কাজ করার কথাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে আমার পীস কোরে চাকরি করার বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই কোন কথা বলা হয়নি। বরঞ্চ আমি এখানে একটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম এ কথাটি ছাপানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। ইকুয়েডরে পীস কোরের একজন স্বেচ্ছাসেবক রূপে আমি দেশটির আদিবাসী শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এসব আদিবাসী শ্রমিক ইট বানানোর কাজ করতো।

এই দু'টি অংশের পরে রয়েছে আমার গ্রাহকদের তালিকা। এই তালিকায় রয়েছে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কুয়েতের সরকার, ইরানের জ্বালানী মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবের অ্যারাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী, ইন্সটিটিউট ডি রিকার্সো হাইড্রোলিকো ই ইলেকট্রিফিকেশিও, পেরুসাহান উমুম লিস্ত্রিক নেগারাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম। এই তালিকার শেষ নামটি আমার নজর কাড়ল। এটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় ও সৌদি আরবের সরকার। আমি অবশ্যই এ দু'টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার জন্য কাজ করেছি। কিন্তু নাম দু'টিকে ছাপার অক্ষরে দেখে আমি রীতিমত অবাক হলাম।

জীবন বৃত্তান্তটি সরিয়ে রেখে আমি মেইনলাইন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধটিকে পড়তে

বসলাম। লেখকের নাম দেখে আমার মনে পড়ল এক মেধাবী ও সৎ মানসিকতার অধিকারী এক তরুণীর কথা। প্রবন্ধটি ছাপানোর আগে মেয়েটি আমাকে তা পড়তে দিয়েছিল। এতে আমার যে উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছিল তা দেখে আমি খুশি মনে এটিকে অনুমোদন করেছিলাম। তাই প্রবন্ধটিতে যে সব কথা ছাপা হয়েছে সেগুলোর দায়-দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হবে। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

"টেবিলগুলোর পেছনে বসা ব্যক্তিদের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, মেইনের নতুন বিভাগগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ। এই বিভাগকে চালু করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তবে বিভাগটির বর্তমান প্রধান জন পার্কিন্স এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে মেইনের প্রধান পূর্বাভাস প্রদানকারীর সহকারী পদে জন পার্কিন্সকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সময় মেইনে নিযুক্ত হাতে গোনা কয়েকজন অর্থনীতিবিদের মধ্যে জন পার্কিন্স ছিলেন অন্যতম। তবে তার প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল ইন্দোনেশিয়া। সেখানে তিনি বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা নিরুপণকারী ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ দলের একজন সদস্য রূপে কাজ করেছিলেন।"

প্রবন্ধটিতে আমার প্রথম কর্মজীবনের সারসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে। এতে আমি যে ইকুয়েডরে একটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক (!) রূপে তিন বছর কাজ করেছি সে কথাও বলা হয়েছে। এরপর নিচের কথা ক'টি ছাপা হয়েছে!

"এ সময়ে জন পার্কিন্স পরিচিত হলেন এইনার গ্রীভের সাথে। গ্রীভ মেইনের একজন প্রাক্তন কর্মী। বর্তমানে তিনি টাকসান গ্যাস অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। সেই সময় গ্রীভ ইকুয়েডরের পাউত শহরে মেইনের পানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। খুব দ্রুত গ্রীভ ও পার্কিন্সের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দু'জনের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের ভিত্তিতে গ্রীভ পার্কিন্সকে মেইনে চাকরি করার প্রস্তাব দিলেন। এক বছর পর জন পার্কিন্স মেইনের প্রধান পূর্বাভাস প্রদানকারীর পদে পদোন্নতি পেলেন। বিশ্ব ব্যাংকের মতো গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, মেইনে অর্থনীতিবিদদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।"

উপরের তথ্যগুলোকে মোটেও মিথ্যা কথা রূপে আখ্যায়িত করা যাবে না। আমার ব্যক্তিগত নথিতে প্রায় একইরকম তথ্য রয়েছে। কিন্তু এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত পরিস্থিতিকে ইচ্ছেমত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। মার্কিন মিডিয়া যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক দলিলপত্রকে প্রায় অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। তাই এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে যে কোন বানোয়াট কাহিনীকে তৈরি করা সম্ভব। যে সব কাহিনী পুরোপুরিভাবে মিথ্যা সেগুলোকে সরাসরিভাবে প্রত্যাখান করা যায়। কিন্তু যেসব কাহিনী আধা-সত্য তথ্য দিয়ে বানানো সেগুলোকে প্রত্যাখান করা রীতিমত দুঃসাধ্য। যে বাণিজ্যিক সংস্থার সরকার, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার কাছে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য সেই

সংস্থা যদি আধা-সত্য ও আধা-মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে তাহলে সেই কাহিনীকে অবিশ্বাস করার তো প্রশ্নই উঠে না। কেননা, এই কাহিনী তো পুরোপুরিভাবে মিথ্যা হয়।

আমার জীবন বৃত্তান্ত মেইনের প্রাতিষ্ঠানিক দলিল। অন্যদিকে মেইনলাইন্সে প্রকাশিত প্রবন্ধটি সাময়িকীর রিপোর্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। আমার জীবন বৃত্তান্তের নিচে মেইনের প্রতীক ছাপা হয়েছে। এমনকি আমার জীবন বৃত্তান্ত বা আংশিকভাবে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব ও প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোতেও মেইনের প্রতীক মুদ্রণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জগতে মেইনের প্রতি কাঙ্খিত আমার জীবন বৃত্তান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সনদ। তা চিকিৎসক ও আইনজীবীদের চেম্বারের দেওয়ালে ঝোলানো ও বাঁধানো, শিক্ষাগত সনদের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর এই গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন পথ খোলা নেই।

এসব দলিলে আমাকে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরূপে অভিহিত করা হয়েছে। আমি একটি বিখ্যাত কনসালটিং ফার্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান। গোটা বিশ্বকে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের বিবিধ ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালানোই হচ্ছে আমার প্রধান দায়িত্ব। এসব দলিলে যা বলা হয়েছে সেগুলোতে তেমন একটা মিথ্যাচার নেই। বরঞ্চ যে সব বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলোকে এড়ানোর মাধ্যমেই মিথ্যাচার করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায়, এসব দলিলে আমি যে এনএসএ'র চাকরি পেয়েছিলাম তার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি এইনার গ্রীভ যে মার্কিন সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক কোরের একজন কর্নেল ছিলেন ও এনএসএ'র একজন লিয়াজো অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই বিষয়গুলোও উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ করা হয়নি কাল্পনিক উন্নয়ন সূচক বিশিষ্ট অর্থনৈতিক পূর্বাভাস তৈরি করার জন্য আমার উপরে যে চাপ প্রয়োগ করা হতো তার কথা। আমার আসল কাজ যে ছিল উন্নয়ন দেশগুলোকে এমনভাবে ঋণগ্রস্থ করা যাতে করে এসব দেশ ওইসব ঋণকে কোনদিনও পরিশোধ করতে না পারে সেকথাও বলা হয়নি। এসব দলিলে আমার পূর্বসূরী হাওয়ার্ড পার্কারের পেশাগত সততার কোন প্রশংসা করা হয়নি। তিনি যে বাস্তব পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার কারণেই চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন তাও উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি আমি যে অবাস্তব উন্নয়নের পূর্বাভাস দেওয়ার কারণেই হাওয়ার্ড পার্কারের পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম সেই বিষয়টিকেও সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমার গ্রাহকদের তালিকায় একসাথে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় ও সৌদি সরকারকে এক সাথে উল্লেখ করা।

আমি এ কথাটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম যে, পাঠকরা এর কী অর্থ করতে পারে। সাধারণ পাঠক হয়তোবা মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় ও সৌদি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেই না। বেশীর ভাগ পাঠকই হয়তো বা একে ছাপার ভুল মনে করতে পারে। ভাবতে পারে যে, কম্পোজিটারের ভুলের কারণে দু'টি আলাদা কথা একই কথা হিসেবে ছাপা হয়েছে। আসলে যে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে এই বাক্যটিকে ছাপা হয়েছে তা বেশীর

ভাগ পাঠক বুঝতেই পারবে না। কিন্তু যারা আমার জগতের অন্দরমহলের বাসিন্দা তারা এই লাইনের আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। বাক্যটি পড়ামাত্র তারা বুঝতে পারবেন যে, গত শতাব্দীর যে চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোড়কে পাল্টে দেওয়া হয়েছিল সেই চুক্তি প্রণয়নকারী দলের একজন সদস্য ছিলাম আমি। এই চুক্তির কথা কোনদিনও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। অথচ এই চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র নিজ জ্বালানীর সরবরাহ, সউদ পরিবারের শাসন, ওসামা বিন লাদেনের মত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা প্রদান ও ইদি আমিনের মত আন্তর্জাতিক অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়কে সুনিশ্চিত করবে। তারা বুঝতে পারবেন যে, মেইনের প্রধান অর্থনীতিবিদ একজন নির্ভরশীল অঘটন ঘটন পটিয়সী।

মেইনলাইন্সের প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লেখিকার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। এটি পড়ে আমার মন-মেজাজ বিগড়ে গেল। এতে বলা হয়েছে ঃ

"অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগটি খুবই দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়েছে। তারপরও বিভাগটির প্রধান জন পার্কিন্স নিজেকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করছেন। কেননা, বিভাগটির প্রত্যেক কর্মীই কঠোরভাবে পরিশ্রমী একজন পেশাদার। তিনি যখন আমার সাথে কথা বলছিলেন তখন তার কর্মীদের কাজগুলোর প্রতি তার আগ্রহ ও সমর্থনকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল। তার এই মানসিকতা প্রকৃতভাবেই প্রশংসনীয়।"

বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, আমি নিজেকে কোনদিনও একজন প্রকৃত অর্থনীতিবিদরূপে গণ্য করিনি। আমি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজ থেকে বিপণন বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেছি। পুরো ছাত্র জীবনে গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয় দু'টিতে আমি একেবারেই কাঁচা ছিলাম। মিডলবারি কলেজে পড়ার সময় আমার প্রধান বিষয় ছিল আমেরিকান সাহিত্য। ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই আমার লেখার হাত খুবই ভাল ছিল। মেইনের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের ব্যবস্থাপকের পদ দু'টিকে অর্জনের পেছনে অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয় দু'টিতে আমার দক্ষতা বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি। বরঞ্চ আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও মূল গ্রাহকদের ইচ্ছামাফিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষমতা আমাকে এত অকল্পনীয় উন্নতির শিখরে টেনে নিয়ে গেছে। সেই সাথে আমি যেভাবে এসব পূর্বাভাস ও পরিকল্পনার যাদুতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সম্মোহিত করেছি তা আমার ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে বাড়তি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সেই সাথে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে আমি মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রীধারী মেধাবী ও পরিশ্রমী এক কর্মীবাহিনীকে গড়ে তুলেছি। এসব কর্মী নিজ নিজ পেশাগত দায়িত্বের খুঁটিনাটি দিকগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও ওয়াকিবহাল। আমার কাজ হচ্ছে এদের কাছ থেকে এদের সেরা পারফরম্যান্সকে আদায় করা। বিনিময়ে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসব কৃতিত্বের যোগ্য পারিশ্রমিক ও স্বীকৃতি আদায় করেছি। তাই সব সময়ই আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থ কর্মী বাহিনী আমার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। এজন্যই মেইনলাইন্সের প্রবন্ধের ওই কথাগুলো লেখা হয়েছিল। এটাও আমার কাজকে মেইনের প্রশংসা করায় একটি পরোক্ষ পন্থা মাত্র।

আমি এসব দলিলপত্রকে আমার টেবিলের সবচেয়ে উপরের ড্রয়ারে রাখা একটি বিশেষ নথিতে সংরক্ষণ করেছিলাম। কাজের অবসরে আমি এগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম ও নানা রকম চিন্তা-ভাবনা করতাম। দিনে দিনে এসব দলিলের সংখ্যা কেবলই বেড়েছে। মাঝে মধ্যে আমি নিজের অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমার বিভাগীয় কর্মীদের টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে চুপচাপ হেঁটে বেড়াতাম। আর এসব কর্মব্যস্ত নারী পুরুষদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে, আমি এদেরকে এক অন্ধকার জগতে টেনে এনেছি। আরও ভাবতাম যে, আমরা সবাই মিলে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ধনীকে আরো ধনী, দরিদ্রকে আরও দরিদ্র বানাচ্ছি। চিন্তা করতাম যে, বিশ্বের অর্ধেক লোকই জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার কিনতে পারছে না। অথচ আমি ও আমার কর্মীরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে গোটা দুনিয়া ভ্রমণ করছি। পাঁচ তারা হোটেলগুলোর বিলাস বহুল স্যুটে থাকছি। দামী রেস্তোরাঁগুলোতে মনের সুখে পানাহার করছি। নিশ্চিন্ত মনে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলছি। তখন এক তীব্র অপরাধবোধ আমাকে গ্রাস করত।

কখনও কখনও নিজের কক্ষে বসে আমার ক্যারিয়ারের কথা ভাবতাম। আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল মেইনের একজন অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে। সেদিন সংস্থাটির এক বিশেষ কনসালট্যান্ট ক্লডিন তার যৌবন ও সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এখন আমি মেইনের অর্থনৈতিক ঘাতক বাহিনীর বিশেষ একটি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। এই দলের প্রত্যেক সদস্যকে আমি সযত্নে বাছাই করেছি। এর চেয়ে আরও সযত্নে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। কিন্তু যখন আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল সে সময়ের চেয়ে বর্তমান সময় সবদিক থেকেই আলাদা। মাত্র এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। কর্পোরেটোক্রেসি সর্বগ্রাসী এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রবল গতিতে বিস্তৃত হয়েছে। আমাদের কর্মকাণ্ডের কলাকৌশল আরও সূক্ষ্ম ও আরও ভয়াবহ হয়েছে। আমার কর্মীবাহিনীর সদস্যরা আমার চেয়ে আলাদাভাবে তাদের কর্মজীবন শুরু করেছে। তাদেরকে এনএসএ'র পরীক্ষাগুলোর ধকলকে সহ্য করতে হয়নি। এমনকি তাদেরকে ক্লডিনের মতো মৌরাণীদের ছলনার ফাঁদেও আটকাতে হয়নি। তারা যে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিস্তারের একনিষ্ঠ কর্মী সে কথাটি তাদেরকে কখনও বলা হয়নি। তারা কোন সময়ই অর্থনৈতিক ঘাতক বা ইএইচএম শব্দটি শোনে নি। এই জগতে একবার ঢুকতে পারলে যে আর বের হতে পারা যায় না এ কথাটি তাদেরকে কখনোই বলা হয়নি। তারা খুব সহজেই আমার দিক নির্দেশনা মাফিক কোন প্রশ্ন না করে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্বগুলোকে পালন করছে। তারা আমার দেওয়া প্রশংসা পেয়ে গলে পড়েছে। আমার দেওয়া শাস্তি পেয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। কখনোই তারা আমার নির্দেশকে অমান্য করে নি। বরঞ্চ সব সময়েই আমার চাহিদা মাফিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আমার সন্তুষ্টির উপরেই যে তাদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরিভাবে নির্ভর করেছে এ কথাটি তারা কখনোই ভোলেনি। এভাবেই আমি আমার অধীনস্থ কর্মী বাহিনীর পূর্ণ আনুগত্য আদায় করতে পেরেছিলাম।

আমি অবশ্য বিভিন্নভাবে তাদের দায়িত্বের বোঝা কমানোর চেষ্টা করেছি। আমি প্রবন্ধ লিখেছি। বক্তৃতা দিয়েছিঃ প্রতিটি সুযোগেই তাদেরকে আশাবাদী অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, বিপুল অংকের ঋণ, বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধিকারী বিনিয়োগ ও বিশ্বের শান্তি রক্ষাকারী আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব বুঝিয়েছি। মাত্র এক দশকের মধ্যেই প্রলোভন ও নিপীড়নের সূক্ষ্ম কলাকৌশল এক দল মানুষ নামের যন্ত্রকে তৈরি করেছে যারা নিজ দায়িত্ব পালন করছে অতি সূচারুরূপে। এখন বোস্টন শহরের ব্যাক বে উপকূলের চমৎকার দৃশ্যকে উপেক্ষা করেই আমার কর্মী বাহিনী একনিষ্ঠভাবে নানা রকম অর্থনৈতিক পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা তৈরি করছে। এরপর মেইনের গোটা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের কাছে এগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য বেরিয়ে পড়ছে। এভাবেই তারা বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ক্লডিন যেভাবে আমাকে গড়ে তুলেছিল ঠিক সেভাবেই আমি আমার কর্মী বাহিনীকে গড়ে তুলেছি। তবে এক্ষেত্রে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ক্লডিন আমাকে সব কথা খুলে বলেছিল। কিন্তু আমি আমার কর্মী বাহিনীকে কোন কথাই বলিনি।

বহু রাত আমি কাটিয়েছি এসব কথাকে চিন্তা করে। সেসব রাতে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি। বরঞ্চ বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি। পলা আমার জীবন বৃত্তান্তের কথা বলে প্যান্ডোরার বাক্সকে খুলে দিয়েছে। সেই সাথে শুরু হয়েছে আমার মানসিক দহন। প্রায়শই আমি আমার কর্মী বাহিনীর অজ্ঞতাকে ঈর্ষা করতাম। আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছি। সেই সাথে তাদেরকে বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা করেছি। যে সব নৈতিক সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাকে মানসিকভাবে নিপীড়ন করছে সেগুলোর বিরুদ্ধে কখনোই তাদেরকে লড়াই করতে হয়নি। এদিক থেকে তারা ছিল পরমভাবে সুখী আর আমি ছিলাম চরমভাবে অসুখী।

আমি ব্যবসায়িক সততা নিয়ে বহু চিন্তা-ভাবনা করেছি। বাস্তবতা ও বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে আমার বহু সময় ব্যয় হয়েছে। আমি নিজেকে বুঝিয়েছি যে, মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের ঠকিয়েছে। বিশেষ করে প্রতিটি দেশের রূপকথায় ও লোক সাহিত্যে এসব ঠকানোর অজস্র কাহিনীকে খুঁজে পাওয়া যায়। দামি কার্পেট বিক্রি করার নামে সস্তা ও বাজে কার্পেট গছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুদখোর মহাজন খাতকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। দর্জি বাদশাহকে সূক্ষ্মতম পোশাক পরানোর নামে একেবারে নগ্ন করে ছেড়েছে।

কখনও কখনও আমি ভেবেছি যে, প্রকৃত বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে প্রাতিষ্ঠানিক দলিলপত্রে। এসবে যেটুকু মিথ্যাচার করা হয়েছে, সেটুকু হচ্ছে মানুষের সহজাত দুর্বলতা। কিন্তু আমার এই ধারণা যে ঠিক নয় তা আমি নানাভাবে বুঝতে পেরেছি। আসলে যুগ পাল্টেছে। আমি এখন বুঝতে পারছি, আমরা মিথ্যাচারের নতুন পর্যায়ে পৌছেছি। যদি আমরা নিজেদেরকে সংশোধন না করি তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের উদাহরণ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাফিয়ার

প্রধানদের ক্যারিয়ার শুরু হয় রাস্তার মাস্তান রূপে। এদের মধ্যে যারা অপরাধ জগতের শীর্ষে পৌঁছতে পারে তাদের ভোল পাল্টে যায়। তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, বৈধ ব্যবসার মালিকে পরিণত হয়, সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়। তারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোটা অংকের চাঁদা দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর প্রধান বা বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করে। বিপদগ্রস্তদের অর্থ ধার দেয়, বাইরের দিক থেকে দেখলে এরা প্রত্যেকেই এক একজন আদর্শ নাগরিক। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্যের আড়ালে যে পটভূমিকা লুকিয়ে রয়েছে তা পুরোপুরিভাবে রক্তাক্ত। যখন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তখন মাফিয়া বস খাতকের সেরা সম্পদটিকে দাবি করে। তা না পেলে স্থানীয় গডফাদারের পেটোয়া বাহিনী খাতকের যে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে ভাঙচুর করে। তাতেও কাজ না হলে ঘাতকের বুলেট ঋণ গ্রহীতার প্রাণকে কেড়ে নেয়।

আমি বুঝতে পারলাম যে, মেইনের প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান হিসেবে আমার যে জাঁকজমক তা একজন অসৎ কার্পেট বিক্রেতার সাধারণ মিথ্যাচার নয়; একজন সাধারণ ক্রেতা সতর্ক হতে পারবে। আমি যে অশুভচক্রের সদস্য সেই চক্রটি একজন সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য তৈরি হয়নি। বরঞ্চ এই চক্রের কাজ হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। আমার অধীনস্থ কর্মী বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের একটি করে সুশোভন পদবী রয়েছে - অর্থনৈতিক বিশ্লেষক, সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস প্রদানকারী ইত্যাদি। এসব পদবি দেখে কোনভাবেই বোঝা সম্ভব নয় যে, এরা প্রত্যেকেই এক একজন অর্থনৈতিক ঘাতক। এরা প্রত্যেকেই বিশ্ব সাম্রাজ্যের স্বার্থকে হাসিল করার লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা যে বিশাল এক পদ্ধতির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তাও বোঝার উপায় নেই। প্রতিটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থারই নিজস্ব অর্থনৈতিক ঘাতক বাহিনী রয়েছে। এসব সংস্থা গোটা বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক খাতে বিপুল অংকের অর্থ বিনিয়োগ করছে। গোটা বিশ্বের সকল দেশের ভারী থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত সকল শিল্পখাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। এখন তা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। এককালের পাতি মাস্তানেরা কাউবয় হ্যাট, লেদার জ্যাকেট, জিন্সের প্যান্ট ও বুট ঝেড়ে ফেলে দামি বিজনেস স্যুট পরেছে। তাদের আচার ও আচরণ ভদ্র ও মার্জিত। তাদের কথা-বার্তা পরিশীলিত ও নম্র। তাদের কর্মকাণ্ড সুচিন্তিত ও দায়িত্বশীল। নিউইর্ক, লন্ডন, প্যারিস ও টোকিওর মতো প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে অবস্থিত কর্পোরেট সংস্থাগুলোর সদর দপ্তরগুলো থেকে প্রতিদিন কার্যনির্বাহীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা নীতিনির্ধারকদের ব্যক্তিগত দুর্নীতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত করছে। আর এসব উপনিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব শ্রম কর্পোরেটোক্রেসির মুনাফাচক্রকে সচল রাখছে।

আমার জীবন বৃত্তান্তের ও মেইনলাইন্স সাময়িকীর প্রবন্ধে যে সব কথা বলা হয়নি সেসব কথাই এক ধোঁয়াশার আবরণ তৈরি করে সবাইকে অন্ধ করে ফেলেছে। আর এই অন্ধত্বই আমাদেরকে বাধ্য করছে কলুর বলদের মত কর্পোরেটোক্রেসির ঘানি গাছটিকে ঘুরাতে। গোটা প্রক্রিয়াটিই মানসিকভাবে ক্ষতিকর ও আত্মহানিকর। পলা আমাকে এসব দলিলের না বলা কথাগুলোকে পড়তে শিখিয়েছে। এসব কথা আমার মনোজগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এসব আলোড়ন আমাকে এমন এক পথে পরিচালনা করছে যা আমার জীবনের মোড়কে পাল্টে দেবে।

অধ্যায়-২৪
বৃহৎ জ্বালানী প্রতিষ্ঠানের সাথে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ

পানামাতে ও কলম্বিয়ায় আমাকে যে সব দায়িত্ব পালন করতে হতো সেগুলোর সুবাদে আমাকে প্রায়শই পানামাতে যেতে হতো। দেশটি আমার দ্বিতীয় স্বদেশে পরিণত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ দীর্ঘ সময় জুড়ে ইকুয়েডরে ডানপন্থী স্বৈরশাসকদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এসব স্বৈরশাসকের ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল ইকুয়েডরের গোঁড়া ডানপন্থী মহলটি। এই মহলটি দেশটির সকল খাতকে লৌহকঠিন হাতে নিয়ন্ত্রণ করত। প্রকৃত অর্থে দেশটির অর্থনীতি ছিল একেবারেই দেউলিয়া। আর এই সুযোগে কর্পোরেটোক্রেসি ইকুয়েডরকে পরিচালনা করত।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ ভাগে ইকুয়েডরের আমাজান অববাহিকায় পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছিল। জ্বালানী বিক্রির অর্থে দেশটির শাসক গোষ্ঠী যে বিলাসবহুল জীবনযাপন করল তাতে দেশটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর কবলে পড়ল। জ্বালানী বিক্রির অর্থ দিয়ে আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ করা হবে এই শর্তে গোটা ইকুয়েডর জুড়ে রাজপথ, সেতু, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, পানি-বিদ্যুৎ বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পদ্ধতিসহ নানা রকম ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হলো। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই লাভবান হলো আন্তর্জাতিক প্রকৌশল ও নির্মাণকারী সংস্থাগুলো।

এই আন্দিজ কন্যার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে ব্যক্তির দ্রুত উত্থান ঘটছিল তিনি দেশটির শাসক গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন না। তারপরেও ব্যক্তিগত সততা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাকে ইকুয়েডরের সাধারণ নাগরিকদের মাঝে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। হাইমে রোলদো ছিলেন কুইটো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক। সেই সাথে তিনি ইকুয়েডরে সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবীও ছিলেন। তার সাথে আমার যখন প্রথম পরিচয় ঘটে তখন তার বয়স মধ্য ত্রিশের কোঠায়। তারপর বহুবার তার সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে। তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ একেবারে অন্যদের সম্মোহিত করে ফেলে। একবার আমি তাকে বেশ আবেগপূর্ণ ভাবে যখনই তার প্রয়োজন হবে তখনই তাকে বিনামূল্যে পরামর্শ দানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এজন্য যে আমি বোস্টন থেকে সরাসরিভাবে বিমান যোগে নিজ খরচে কুইটোতে উড়ে যেতে রাজি তাও তাকে জানিয়ে দিলাম। কথাটি অবশ্য কিছুটা ঠাট্টার ছলে বলা হয়েছিল। তারপরও আমি যে তাকে

পছন্দ করেছি, ইকুয়েডর যে আমার সবচেয়ে প্রিয় দেশগুলোর মধ্যে একটি, সুযোগ পেলেই তাকে দেখতে ও তার দেশে ছুটি কাটাতে যেতে আমি সব সময়ই রাজি, একথাগুলো তাকে আমি জানিয়েছিলাম। হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, যদি ইকুয়েডরের সরকার আমার কনসালট্যান্সি ফি পরিশোধ না করে তাহলে আমি তাকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করতে পারব। এজন্য তাকে কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না।

তিনি একজন জাতীয়তাবাদী ও জনকল্যাণমুখী নেতা হিসেবে তার ইমেজ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সব সময়ই দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলোর মৌলিক অধিকারগুলোকে সংরক্ষণের জন্য সোচ্চার ছিলেন। সেই সাথে তিনি ইকুয়েডরের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে বিচক্ষণভাবে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করলেন। তখন থেকেই তিনি চিহ্নিত হলেন এমন একজন রাজনীতিবিদ রূপে যিনি আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারের মধ্যকার আঁতাতকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে মোটেও ভয় পান না। তার এই দুঃসাহসী নীতি দেখে ইকুয়েডরসহ বহু জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশের সাধারণ নাগরিকগণ উৎসাহী হয়ে উঠল। তারা নিজ দেশের সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি সামার ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুয়িস্টিক্সকে আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর তল্পিবহনের দায়ে অভিযুক্ত করলেন। পত্রিকায় তার এই অভিযোগের বিবরণ পড়ে আমি অবাক হলাম। আমি পীস কোরে চাকরি করার সময় থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত। এটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইভানজেলিক্যাল মিশনারী সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বহু দেশের ভাষাকে বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও অনুবাদ করে। বিশেষ করে প্রাচীন ভাষাগুলো সম্পর্কে সংস্থাটির গবেষণাগুলো রীতিমত বিশ্ব জোড়া সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

এ ঘটনার ক'দিন পরে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচজন মার্কিন কর্মীকে বর্শাবিদ্ধ ও মৃত অবস্থায় ইকুয়েডরের এক জঙ্গলে পাওয়া গেল। স্থানীয় হুয়াওরানি আদিবাসী গোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব স্বীকার করে নিল। গোষ্ঠীটির ভাষ্য মোতাবেক, তারা তাদের ভূমি থেকে মিশনারীদের তাড়ানোর জন্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হলো যুক্তরাষ্ট্র। নিহত এক মিশনারীর বোন র‍্যাচেল সেইন্ট গোটা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করে ও আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থ ও জনসমর্থন চাইলেন। র‍্যাচেলের মতে, এসব প্রতিষ্ঠান নাকি বর্বরদের সভ্য শিক্ষিত করে তুলতে চাইছে। পুরো ঘটনাটি দেখে আমার মোহমুক্তি ঘটল।

আমার মনে হলো যে, রোলদো চাও ওমর তোরিজোর পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন। দু'জনেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ওমর তোরিজো পানামার যোজক প্রণালী থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে চাইছেন। অন্যদিকে

রোলদো ইকুয়েডরের জ্বালানী সম্পদকে মার্কিন জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে চাইছেন। ওমর তোরিজোর মতই রোলদো কমিউনিস্ট নন। তারপরও তিনি ইকুয়েডরের ভাগ্যকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেশটির জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন। পণ্ডিতগণ এরই মধ্যে এ মর্মে পূর্বাভাস জারি করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক সংস্থাগুলো রোলদোকে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রূপে মেনে নেবে না। যদি তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন তাহলে তার পরিণতি গুয়াতেমালার আর্বেঞ্জ ও চিলির আলেন্দের মতই মর্মান্তিক হবে।

আমি ভাবলাম যে, ওমর তোরিজো ও রোলদো হয়তোবা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিকে পাল্টে দেওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলবেন। আর এই আন্দোলন থেকে জন্ম নেবে বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তনের ধারা। এরা ফিদেল কাস্ত্রো ও মোয়াম্মের গাদ্দাফী নন। ওমর তোরিজো ও রোলদোর সাথে রাশিয়া ও চীনের কোন গোপন আঁতাত নেই। এমনকি এরা সালভাদর আলেন্দের মতো আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাও নন। ওমর তোরিজো ও রোলদো দু'টি দেশের বুদ্ধিমান, জনপ্রিয় ও সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। তারা কট্টর আদর্শবাদী নন। বরঞ্চ এরা দু'জনেই কঠোরভাবে বাস্তববাদী। এরা জাতীয়তাবাদী হলেও আমেরিকা বিরোধী নন। কর্পোরেটোক্রেসি তিনটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে - সরকার, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। ওমর তোরিজো ও রোলদো প্রথম স্তম্ভটিকে ধ্বংস করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন।

রোলদোর নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম প্রধান দফা ছিল ইকুয়েডরের জাতীয় জ্বালানী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। ইকুয়েডরের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে এর জ্বালানী ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে করে দীর্ঘদিন ধরে ইকুয়েডরের জনসাধারণ এর সুফলকে উপভোগ করতে পারে। নিজ নাগরিকদের মধ্যকার দরিদ্রতম ও অনগ্রসরতম জনগোষ্ঠীগুলোর ভাগ্যোন্নয়ন করা যে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এই মতবাদকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রোলদো। তিনি তার নির্বাচনী জনসভাগুলোতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রায়ই বলতেন যে, জাতীয় জ্বালানী নীতি ইকুয়েডরের সমাজ ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে পারবে। তারপরও তাকে আর সব দেশের মতই ইকুয়েডরের নির্বাচনে জয়ী হতে গেলে দেশটির প্রভাবশালী মহলগুলোর সিংহভাগের সমর্থন আদায় করতে হবে। এমনকি শুধুমাত্র জনসমর্থনের জোয়ারে ভেসে নির্বাচিত হলেও তার নীতিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য এসব মহলের সহযোগিতা লাগবে। নতুবা, ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য সংস্কারকদের মতো তার শাসনামলও ব্যর্থ হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে জেমস আর্ল কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ব্যাপারটি আমার জন্য ব্যক্তিগত স্বস্তি বয়ে এনেছিল। টেক্সাকোসহ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঐক্যবদ্ধ চাপ সত্ত্বেও কার্টার প্রশাসন ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ইকুয়েডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশে আমেরিকা বিরোধী সরকারকে মেনে

নিতেন না। এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রশাসনের মনোভাব হতো একই রকম।

আমার ধারণা এই যে, হাইমে রোলদোর জাতীয় জ্বালানী নীতি ছিল ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে তার বিজয় অর্জনের সবচেয়ে বড় কারণ। দীর্ঘদিন রামরাজত্ব চালানোর পর ইকুয়েডরে স্বৈরশাসকদের শাসনের অবসান ঘটল। দেশটিতে শুরু হলো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম সরকারের শাসনামল। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্টে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার সময় রোলদো বললেন ঃ

"এদেশের জ্বালানী সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকেই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিজ রপ্তানী বাণিজ্যে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে এদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌম অধিকারকে পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করার সদিচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।"

কুইটোর সিনেট হলে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ইকুয়েডরের জ্বালানী মন্ত্রী হোসে কার্ভাহাল বললেন ঃ

"যদি একজন অংশীদার ঝুঁকি নিতে না চায়, জ্বালানী উত্তোলনে বিনিয়োগ করতে না চায় বা ইজারাকৃত অঞ্চলে কুপ খনন করতে না চায়, তাহলে অন্য অংশীদার এসব কাজ করার অধিকার রাখে। এমনকি দ্বিতীয় অংশীদার এসব ইজারাকৃত অঞ্চলের মালিকানা দাবি করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিদেশী সংস্থাগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। এই দ্বন্দ্বে আমাদেরকে দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে। সব ধরনের চাপকে সহ্য করার মানসিকতাকে গড়ে তুলতে হবে। বিদেশী সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করার সময় নীতি বা হীনতাবোধের শিকার হলে চলবে না।"

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিনে আমি একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। এদিনে নতুন দশক শুরু হলো। ২৮ দিন পর আমার বয়স হবে ৩৫ বছর। ১৯৮১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আমি আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। আমি আরও ঠিক করলাম যে, এরপর আমার কর্মপদ্ধতি হাইমে রোলদো ও ওমর তোরিজোর পথকে অনুসরণ করবে।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক'দিন পরেই মেইনে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। অর্জিত মুনাফার দিক থেকে বিচার করলে ব্রুনো জামবোত্তি ছিলেন সংস্থাটির সেরা প্রেসিডেন্ট। তারপরেও হঠাৎ করে কোন সতর্কবাণী জারি না করে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ম্যাক হল- ব্রুনো জামবোত্তিকে বরখাস্ত করলেন।

এক ধাক্কায় আমার জগৎ ওলট-পালট হয়ে গেল।

অধ্যায়-২৫
আমার পদত্যাগ

ম্যাক হল ছাঁটাই করেছেন ব্রুনো জামবোত্তিকে। এই খবরটি মেইনকে ভূমিকম্পের মতো আঘাত করল। গোটা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও মতভেদ ছড়িয়ে পড়ল। মেইনের কর্মীদের মধ্যে একটি দল অবশ্যই ব্রুনোর পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু তার বিদায় এই দলটিকেও আতঙ্কিত করে তুলল। অধিকাংশ কর্মীই ব্রুনোর পতনের জন্য চেয়ারম্যান হলের ঈর্ষাকে দায়ী করল। মেইনের কাফেটেরিয়ায় কফি পান ও মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে অনুচ্চ স্বরে বলা হলো যে, ম্যাক হল তারচেয়ে ১৫ বছরের ছোট ব্রুনো জামবোত্তির সাফল্যে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই হল ব্রুনোকে ছাঁটাই করেছেন।

সবাই অবশ্য যে এসব কথা নিচু স্বরে বলেছিল তা কিন্তু নয়। একজন তো জোর গলায় বলেই ফেলল, "ব্রুনো এত সাফল্য অর্জন করবেন আর হল তা নীরবে সহ্য করবেন এটা হতেই পারে না। এ রকম চললে ব্রুনো হলের পদটিকে দখল করতেন। আর হলকে পেনশন ভোগীদের খাতায় নাম লেখাতে হতো। তাই সময় থাকতেই ম্যাক হল ব্রুনো জামবোত্তিকে বিদায় করেছেন।"

এসব ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যই ম্যাক হল মেইনের প্রেসিডেন্ট পদে পল প্রিডিকে পদোন্নতি দিলেন। পল দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই অমায়িক লোকটি প্রকৌশল বিভাগের কাজ ছাড়া অন্য কোন বিভাগের কাজ মোটেও বুঝতেন না। তার ব্যক্তিত্ব ছিল নিষ্প্রভ। সব সময়ই তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশগুলোকে বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করতেন। পল প্রিডি কখনোই বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করে ম্যাট হলকে চাপের মুখে ফেলবেন না। মেইনের অধিকাংশ কর্মীই আমার ধারণার সাথে একমত হলো।

আমার জন্য ব্রুনোর বিদায় ছিল এক মারাত্মক আঘাত। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন আমার পথ প্রদর্শক। সেই সাথে মেইনের আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে পল প্রিডি সব সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে মেইনের কর্মকাণ্ডকে তদারকি করতেন। তাই সংস্থাটির আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। মেইনের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হবে সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমার

মনে জাগল। একদিন আমি ব্রুনোর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম তিনি পুরো ব্যাপারটি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন।

ব্রুনো বললেন, "জন পার্কিন্স, হল জানেন যে তার এই সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। তাই আমি একটি মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দাবি করে তা আদায় করতে পেরেছি। হল মেইনের সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের সিংহভাগ ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনি যখন আমাকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন আমার করার কিছুই ছিল না। মেইনের গ্রাহকদের মধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক আমাকে উঁচু পদে চাকরি করার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি এ ব্যাপারে খুব শিগগির সিদ্ধান্ত নেব।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আমার কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?"

তিনি পরামর্শ দিলেন, "চোখ খোলা রাখুন। ম্যাক হলের বাস্তব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কিন্তু তিনি আমাকে যেভাবে ছাঁটাই করেছেন এতে সবাই তাকে ভয় পাবে। কেউ তাকে এখন সত্য কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে না।"

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের মার্চের শেষ দিকে আমি মানসিক অবসাদ কাটানোর জন্য ভার্জিন দ্বীপে গেলাম। নিজের ইয়টে চড়ে ভাসলাম আটলান্টিক মহাসাগরে। মেইনের এক সুন্দরী তরুণী কর্মী মেরি আমার সফর সঙ্গিনী হলো। যখন আমি এই নৌপথটিকে বেছে নিয়েছিলাম তখন আমি কোন চিন্তা করিনি। কিন্তু এখন বুঝেছি যে, আমার ভবিতব্য আমাকে এ পথে টেনে নিয়েছিল। প্রথম ইঙ্গিত পেলাম একদিন বিকালে। তখন আমার ইয়ট সেইন্ট জন দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের পাশ দিয়ে ঘুরে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক প্রণালীতে ঢুকছিল। এই প্রণালীই যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ভার্জিন দ্বীপকে আলাদা করেছে।

প্রণালীর নামকরণ করা হয়েছে এমন এক ভয়াবহ ইংরেজ জলদস্যুর নামে যে ব্যক্তি ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলিশ প্রণালীতে স্পেনের নৌবহরকে ধ্বংস করেছিল। গত এক দশকে আমি বহুবার কুখ্যাত ইংরেজ জলদস্যুদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছি। স্যার ফ্যান্সিস ড্রেক ও স্যার হেনরি মর্গানের মতো জলদস্যুরা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, ইংলিশ প্রণালী ও উত্তর সাগর জুড়ে অবাধে লুটতরাজ, হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়েছে। তারপরও তারা বিভিন্ন সময়ে অন্য দেশগুলোর আগ্রাসন থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করেছে। তাই ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণীরা এসব জলদস্যুদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছে। ইন্দোনেশিয়া, পানামা, কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরে আমি যা করেছি তাতে আমাকে দ্বিতীয় ড্রেক বা মর্গান বলা চলে। এমনকি যাদেরকে আমি দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা করেছি সেই ইথান অ্যালেন, টমাস জেফার্সন, জর্জ ওয়াশিংটন, ড্যানিয়েল বুন, ডেভি ক্রকেট, লুইস ও ক্লার্ক যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী ও ক্রীতদাস জনগোষ্ঠীগুলোকে অবাধে শোষণ করেছেন। তারা যে সব ভূমি ছলেবলে কৌশলে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে এনেছিলেন, সেগুলো বিভিন্ন প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক প্রণালী দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় এসব চিন্তা আমাকে নাড়া দিলো।

তখনই আমার মন পাল্টা চিন্তায় আক্রান্ত হলো। ইথান অ্যালেন কয়েক মাস ইংল্যান্ডের

একটি জাহাজে বন্দী ছিলেন। ৩০ পাউন্ড ওজনের লোহার শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল ডেকের নিচে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে। এরপর প্রায় এক বছর তিনি একটি ইংরেজ কারাগারের পাতাল কক্ষে শেকল বাঁধা অবস্থায় বন্দী ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে মন্ট্রিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় আহত অবস্থায় ইংরেজদের হাতে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। টমাস জেফার্সন ও জর্জ ওয়াশিংটনসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। এই সংগ্রামে যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ জয়ী হবে তা হোসেটেও সুনিশ্চিত ছিল না। বরঞ্চ বৃটেন এই যুদ্ধে জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হতো। ড্যানিয়েল বুন, ডেভি ক্রকেট লুইস ও ক্লার্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাদেরকেও এ সময় বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

ফ্রান্সিস ড্রেক ও হেনরি মর্গানের কাহিনী আরও জটিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস মোটেও সহজ সরল কোন পর্ব নয়। সে সময়ের ইউরোপের সবচেয়ে পরাক্রান্ত পরাশক্তি ছিল স্পেন। অন্যদিকে ইংল্যান্ড তখন সবেমাত্র নিজ স্থল সীমান্ত টপকে চারপাশের সাগরগুলোতে জাহাজ ভাসাতে শুরু করেছে। সাথে সাথে খ্রীস্টান ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে রাষ্ট্র ধর্মরূপে গ্রহণ করল। সাথে সাথে খ্রীস্টান রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারী স্পেন ইংল্যাণ্ডকে রোমান চার্চের ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য এক বিশাল নৌবহর প্রেরণ করল। তখনও ইংল্যান্ডের নৌ বাহিনী পুরোপুরিভাবে গড়ে উঠে নি। তাই রাণী প্রথম এলিজাবেথ ইংরেজ জলদস্যুদের সহযোগিতা চাইলেন। সে সময় ইংরেজ জলদস্যুদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল ফ্রান্সিস ড্রেক। তারই নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের নৌবহর ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলিশ প্রণালীতে স্পেনের নৌবহরকে বিধ্বস্ত করল। সেদিন অবশ্যই ড্রেক ও মর্গানের স্বদেশপ্রেম তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমার ইয়ট প্রণালীর পাগলা বাতাসে মাতাল ঢেউয়ে হেলতে দুলতে ছুটল। প্রণালীর বুক চিরে জেগে উঠা পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে ইয়টের কাছে চলে আসছে। প্রণালীর দক্ষিণে রয়েছে সেইন্ট জন দ্বীপ ও উত্তরে রয়েছে গ্রেট ম্যাচ দ্বীপ। ইয়ট চালাতে চালাতে আমি কেবলই বিপরীতমুখী চিন্তা প্রবাহের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হচ্ছিলাম। তারপরও এসব চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। এমন সময় মেরি আমার হাতে একটি বিয়ারের ক্যান ধরিয়ে দিয়ে উঁচু ভলিউমে জিমি বাফের একটি রেকর্ড চালাল। নির্জন প্রণালীর সৌন্দর্য আমার চারদিককে ঘিরে রয়েছে। ইয়ট চালানোর স্বাধীনতাকে উপভোগ করছি আমি। এরপরও আমার বিক্ষুব্ধ মন বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনায় এলোমেলো হয়ে রয়েছে। আমি কিছুতেই একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমি এক ঢোকে পুরো ক্যানের বিয়ারটুকু গিয়ে ফেললাম।

বিক্ষুব্ধ আবেগ কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ছে না। ইতিহাসের পাতা থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরগুলোর তীব্র তর্ক-বিতর্ক আমার পুরো সত্তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলতে চাইছে। আমি এতদিন যেভাবে নিজ স্বার্থপরতার পক্ষে সাফাই গেয়েছি সেই অপরাধের গ্লানি আমাকে নিস্তেজ করে ফেলছে। আমি আমার মা-বাবা ও টিস্টন স্কুলের উপরে ক্রুদ্ধ হচ্ছি

আমাকে এতো ইতিহাস গেলানোর দায়ে। চট করে বিয়ারের আরেকটি ক্যান খুললাম। ক্রনোকে ছাঁটাই করার জন্য এখন আমার ম্যাক হলকে খুন করতে ইচ্ছা করছে।

রঙধনু পালওয়ালা একটি কাঠের তৈরি জাহাজ আমার ইয়টের পাশ দিয়ে উল্টোদিকে ভেসে গেল। জাহাজের পালটি দু'দিকেই ফুলে রয়েছে। জাহাজটির ডেকে তিনজোড়া তরুণ-তরুণী বসে রয়েছে। দু'জোড়ার পরণে রঙিন সারঙ। আর একজোড়া পুরোপুরিভাবে নগ্ন। পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময়ে এরা হইচই করে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। দেখেই বুঝলাম, এরা হিপ্পি। এদের কোন চালচুলা নেই, কোন ঠিকানা নেই, কোন পিছুটান নেই। স্রেফ মুক্ত, স্বাধীন ও বেপরোয়া জীবনযাপন করতে পারলেই এরা খুশি।

আমি এদের দিকে হাত নাড়তে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার মন ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

মেরি ডেকে দাঁড়িয়ে এদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। এরপর যখন কাঠের জাহাজটি দিগন্তরেখায় হারিয়ে গেল, তখন আমার দিকে ফিরে তাকাল। এরপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ওই রকম জীবন পছন্দ কর?"

ঠিক তখনই আমি আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কারণটিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। এজন্য আমার মা-বাবা, টিস্টন, ম্যাক হল বা অন্য কেউ দায়ী নয়। আমি নিজের জীবনকে ঘৃণা করছি। আমি নিজেকে ঘৃণা করছি। আমার সকল অশান্তির একমাত্র কারণ হচ্ছি আমি।

মেরি চিৎকার করে কিছু একটা বলল। সে ইয়টের সামনের ডেকের ডানপাশের দিকে হাত উঁচু করে কিছু একটাকে দেখাল। এরপর আমার কাছে এলো। বলল, "লেইনস্টার বে, আজ ইয়ট এখানেই নোঙর ফেলবে।"

ইয়টের মুখ ঘুরে গেল দু'পাহাড়ের মাঝখানের সরু খাঁড়ির দিকে। এসব খাঁড়ির ভেতরেই জলদস্যুদের জাহাজগুলো শিকার ধরার আশায় লুকিয়ে থাকত। আমি খাঁড়ির ভেতরে ইয়টকে ঢোকালাম। এরপর মেরির হাতে যান্ত্রিক হালকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম সামনের ডেকে। মেরি ধীরে ধীরে ইয়টকে ওয়াটারমেলন কে'র ভেতরে ঢুকিয়ে একপাশে ভেড়াল। আমি ইয়টের পাল নামিয়ে গুটালাম। এরপর লকার থেকে নোঙ্গর বার করে ফেলে দিলাম পানিতে। মেরি ততক্ষণে ইঞ্জিন বন্ধ করেছে। ঝনঝন শব্দ করে নোঙ্গরের শেকল তলিয়ে গেল সুনীল স্বচ্ছ নোনা পানিতে।

মেরি কেবিনের ভেতরে ঢুকল পোশাক পাল্টানোর জন্য। কতক্ষণ সে সাঁতার কাটবে। এরপর সে একটু ঘুমাবে। তারপর রাতের খাবার রাঁধবে। আমি একটি চিরকুট লিখে রেখে ছোট্ট ডিঙি নৌকাটাকে পানিতে ভাসালাম। এরপর জোড়া দাঁড় বেয়ে পৌঁছে গেলাম তীরে। যেখানে ডিঙিটাকে ভেড়ালাম তার উপরেই রয়েছে একটি প্রাচীন ইক্ষু খামারের ধ্বংসাবশেষ। আমি কতক্ষণ ডিঙ্গির উপরে চুপচাপ বসে রইলাম। চেষ্টা করলাম আর

চিন্তা না করে মনের আগুনকে নেভাতে। কিন্তু একে যত নেভাতে চাই, ও তত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

ডুবন্ত সূর্যের পড়ন্ত আলোয় খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠলাম। এসে দাঁড়ালাম খামারের ভেঙ্গে পড়া সদর দরজার সামনে। নিচের দিকে ফিরে তাকালে নোঙ্গর করা ইয়টটিকে চোখে পড়ে। সূর্য ধীরে ধীরে ডুবছে ক্যারিবিয়ান সাগরে। মনে নেশা ধরানোর মতো সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। অথচ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'শো বছর আগের এক বীভৎস ঐতিহাসিক নিদর্শন। বহু বছর ধরে হাজার হাজার আফ্রিকান ক্রীতদাশ এখানে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের ঘাম, রক্ত ও অস্থিপুঞ্জের উপরে গড়ে উঠেছিল এই আখ চাষের খামার, চিনি তৈরির কারখানা, রাম তৈরির ভাঁটিখানা ও এর মালিকের বিশাল প্রাসাদ। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এর পাশবিক ইতিহাসকে চাপা দিয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন। কিন্তু আমার মনের ক্রোধ তখন টগবগ করে ফুটছিল।

সূর্য একটি পাহাড়ী দ্বীপের পেছনে ডুবে গেল। এক লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম আকাশে। সাগরের পানির রং কালো হতে শুরু করল। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমিও একজন দাস ব্যবসায়ী। মেইনের পক্ষে আমার কাজ শুধু মাত্র দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণের জালে আটকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। আমার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসগুলো শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য জ্বালানী সরবরাহকে সুনিশ্চিত করেনি। মেইনের অংশীদার রূপে আমি শুধুমাত্র সংস্থাটির মুনাফার অন্যতম উৎসে পরিণত হয়নি। আমার মূল কাজ ছিল বিভিন্ন দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব সম্রাজ্যের উৎপাদনচক্রের ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করা। এদিক থেকে বিচার করলে আমার সাথে মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ীদের কোন অমিল নেই।

দীর্ঘ এক দশক আমি মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ীদের মতই কাজ করেছি। সে যুগের দাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার অরণ্যে সশস্ত্র ও দলবদ্ধভাবে ঢুকতো। এরপর আফ্রিকান যুবক-যুবতীদের ধরে নিয়ে যেত জাহাজে। তারপর এদেরকে চালান করতো বিভিন্ন উপনিবেশে। আমার কাজের ধরন সে তুলনায় অনেক বেশী আধুনিক ও সূক্ষ্ম। আমাকে কখনও ক্রীতদাসদের লাশ দেখতে হয়নি। পচাগলা লাশের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয়নি। আর্ত মানুষের যন্ত্রণাক্ত চিৎকার শুনতে হয়নি। কিন্তু আমি যা করেছি তা আরও ভয়াবহ। বহু দেশের বহু মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছি এদের উপরে কোন রকম অত্যাচার না করেই। এহেন কাজ আমার না করলেও চলত। তাহলে আমার বিবেককে এত যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। চূড়ান্ত বিচারে মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ীদের চেয়ে আমি আরও বড় অপরাধী।

আমি পেছনে ফিরে ইয়টের দিকে তাকালাম। ভাঁটার টানে ইয়টটি আস্তে আস্তে দুলছিল। মেরি ডেকের উপরে চেয়ার পেতে শুয়েছিল। খুব সম্ভবত সে তখন শীতল মার্গারিতার গ্লাসে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছিল। হয়তোবা চেয়ারের পাশের তেপায়ায় আমার জন্য মার্গারিতায় আরেকটি শীতল গ্লাস অপেক্ষা করছিল। সে সময় ফুরিয়ে যাওয়া দিনের শেষ

আলোয় মেরিকে নিশ্চিন্ত ও বিশ্বাসীভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে আমি এক তীব্র অপরাধবোধে আক্রান্ত হলাম। যারা আমার অধীনে কাজ করছে তাদের প্রত্যেককেই আমি এক-একজন অর্থনৈতিক ঘাতকে পরিণত করেছি। মেরিও এই রূপান্তর থেকে রেহাই পায়নি। ক্লডিন আমাকে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই আমি মেরিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ক্লডিন প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় আমাকে সব কথা খুলে বলেছিল। কিন্তু আমি কোন কথা না বলে মেরিদেরকে ফাঁকি দিয়েছি। পদোন্নতি দিয়ে ও বেতন বাড়িয়ে আমি তাদেরকে প্রলুব্ধ কর্পোরেটোক্রেসির ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করেছি। আমি কালচে সাগর, লালচে আকাশ ও ধূসর উপকূল থেকে ফিরে তাকালাম। আমার নজর পড়ল আফ্রিকার মাটি থেকে উপড়ে আনা ক্রীতদাসদের তৈরি করা দেয়ালের উপর। আমি চোখ বুঁজে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চাইলাম। কতক্ষণ পরে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পেলাম একটি বিশালাকার গাঁটযুক্ত লাঠিকে। আমি লাফ দিয়ে লাঠিটিকে কুড়িয়ে ভাঙাচোরা দেয়ালটিকে বদ্ধ উম্মাদের মতো পেটাতে শুরু করলাম। প্রাচীন পাথরের দেয়ালের একটি টুকরাও খসে পড়ল না। বরঞ্চ কতক্ষণ পরেই অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। ঘাসের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে দেখতে পেলাম আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলোকে।

কতক্ষণ পরে পাহাড় বেয়ে নেমে গেলাম উপকূলে। তীরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম কালচে পানিতে ভাসা ইয়টের দিকে। আমি আমার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত করে ফেলেছি। আমি জানি, যদি আমি আগের জীবনে ফিরে যাই তাহলে মেইন চিরদিনের জন্য আমাকে গ্রাস করবে। আমার স্বাধীনতা আর টিকবে না। বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা, বীমা-পেনশন, বিনিয়োগ-লভ্যাংশ সব একজোট হয়ে আমাকে আটকে ফেলছে। আমি আর এই অন্ধচক্র থেকে বেরুতে পারব না। আমি এরই মধ্যে কর্পোরেটোক্রেসির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। এখন আমার সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। হয় আমার বিবেক আমাকে দিনরাত পেটাবে, না হয় আমি এ থেকে বেরিয়ে যাব।

দু'দিন পর আমি বোস্টনে ফিরে গেলাম। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিলে আমি পল প্রিডির অফিসে গিয়ে পদত্যাগ করলাম।

চতুর্থ পর্ব
১৯৮১-বর্তমান

অধ্যায়-২৬
ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্টের মৃত্যু

মেইনকে ছেড়ে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না। পল প্রিডি আমার সিদ্ধান্তকে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। চোখ টিপে মুচকি হেসে তিনি বললেন, "পহেলা এপ্রিলের তামাশা।"

আমি তাকে বোঝালাম যে, আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না। পলার পরামর্শ অনুযায়ী আমি তাকে চটালাম না। এমনকি ভবিষ্যতে কোনদিন অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে আমি যে সব দায়িত্ব পালন করেছি সেগুলোর কথা ফাঁস করে দিতে পারি এমন সন্দেহও তার মনে জাগালাম না। আমি বরঞ্চ মেইন আমার জন্য যা করেছে তার প্রশংসা করলাম। সেই সাথে আমি নতুনভাবে নিজের জীবনকে গড়ার ইচ্ছা জানালাম। মেইনের চাকরি করার সময় যতগুলো দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি, সেসব দেশের সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে বই লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তবে এসব বইয়ে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রসঙ্গ থাকবে না বলে তাকে আশ্বস্ত করলাম। আমি বললাম যে, আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে একজন ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে লিখতে চাই। সেই সাথে গোটা বিশ্বকে নিজের চোখে দেখতে চাই। আমি মেইনের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার অঙ্গীকার করলাম। জানালাম যে, সুযোগ পেলেই সংস্থাটির প্রশংসা করব। অবশেষে পল আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে মেইনের কর্মীরা আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার জন্য বোঝাতে লাগল। সবার বক্তব্য একই সুরে বাঁধা ছিল। মেইনকে আমি যেমন অনেক কিছু দিয়েছি, তেমনি এর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। যখন এই কথায় কাজ হলো না তখন সবাই আমাকে সামনাসামনি পাগল বলে ডাকতে লাগল। আমি এদের মানসিকতাকে বুঝতে পারলাম। আমি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি এ কথাটি কেউই মেনে নিতে পারছে না। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অজানা আতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছে। যদি আমি ঠাণ্ডাভাবে চিন্তা ভাবনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তাহলে তাদেরকেও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অথচ মেইনে চাকরি করা মানেই বিলাসী জীবনযাপন করা। তাই আমাকে পাগল বলাটাই হচ্ছে নিরাপদ কৌশল।

সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল আমার বিভাগের কর্মীরা। তাদের ভাষায়, আমি তাদেরকে অথৈ সাগরে ফেলে যাচ্ছি। আমার স্থান পূরণ করার মতো যোগ্য উত্তরসূরী তখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু ততদিনে আমার মনোভাব একেবারে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন আমি এক্ষেত্রে সন্দেহের নাগরদোলায় দুলেছি। এবার আমার সকল সন্দেহের অবসান ঘটেছে। এখন আমি এই গ্লানিকর জীবনের ইতি ঘটাতে চাইছি।

আমার বেকার জীবন শুরু হলো খুবই খারাপ ভাবে। একে তো কোন চাকরি তখনও পাইনি। অন্যদিকে আমি মেইনের পূর্ণ অংশীদার ছিলাম না। তাই মেইন থেকে অবসর নেওয়ার পুরো সুযোগ-সুবিধা আমার বরাতে জুটল না। যদি আমি সংস্থাটিতে আরও পাঁচ বছর চাকরি করতাম, তাহলে আমি একজন কোটিপতিতে পরিণত হতে পারতাম। কিন্তু ৩৫ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমি একজন লাখপতির ঘরে আটকে রইলাম। হঠাৎ করেই বোস্টনের এপ্রিল আমার জন্য হিমশীতল ও বিষণ্ন হয়ে দাঁড়াল।

ক'দিন পরেই পল প্রিডি আমাকে টেলিফোন করে তার সাথে দেখা করার জন্য অনেক অনুনয় করলেন। তিনি বললেন, "মেইনের এক গ্রাহক আমাদেরকে পরিত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে। সংস্থাটি আমাদেরকে কন্সালট্যান্ট রূপে নিয়োগ করেছিল একটি মাত্র শর্তে। শর্তটি হলো এই যে, আপনি তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর নীতিনির্ধারণী সভাগুলোতে ওকালতি করবেন।"

আমি বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি এক্ষেত্রে লবিস্টের দায়িত্ব পালন করব। তবে মেইনের চাকরি করার সময় আমি যে বেতন-ভাতা পেতাম এর তিনগুণ অর্থ আমাকে পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হবে। আমাকে অবাক করে দিয়ে পল প্রিডি এই শর্তকে মেনে নিলেন। আমার নতুন ক্যারিয়ার শুরু হলো।

পরের কয়েক বছর আমি মেইনের গ্রাহকদের পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামে লবিস্টের দায়িত্ব পালন করলাম। বিশেষ করে যে সব মার্কিন প্রকৌশলী ও নির্মাণকারী সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি গড়ে তুলছে সেসব সংস্থাই আমাকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগাল। আমার গ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ার পাবলিক সার্ভিস কোম্পানী। আমি সংস্থাটির বিতর্কিত সীব্রুক পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জোরালোভাবে ওকালতি করেছি।

পেশাগত ভাবে তখন ল্যাটিন আমেরিকার সাথে আমার কোন সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। তারপরও আমি ওই অঞ্চলের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলাম। লবিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুবাদে আমার হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকত। আমি পলার সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। সেই সাথে ইকুয়েডরে পীস কোরের চাকরি করার সময় যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের সাথে নতুনভাবে যোগাযোগ গড়ে তুললাম। কেননা, দেশটি হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক জ্বালানী রাজনীতির প্রধান নটে পরিণত হলো।

ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট হাইমে রোলদো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিলেন। তিনি তার নির্বাচনী ইশতেহারকে একনিষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত করছিলেন। দেখতে দেখতে রোলদো প্রশাসনের সাথে আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর লড়াই জমে উঠল। পানামা প্রণালীর দু'পাশের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কগণ যেসব প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করছিলেন বা যেসব প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি, রোলদো সেসব প্রসঙ্গকে সঠিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে। আমি খবরের কাগজগুলোতে রোলদো ও ইকুয়েডর সম্পর্কে যত বেশী খবর, কলাম, আর্টিকেল ও ফিচার পড়ছিলাম ততই তার আন্তরিকতা ও জটিল বিষয়গুলোকে বুঝতে পারার সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করছিল। আমি সেই সাথে এটাও বুঝতে পারছিলাম যে, বিশ্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক নয়া যুগে প্রবেশ করতে চলেছে। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিমি কার্টার রোনাল্ড রেগানের কাছে পরাজিত হলেন। দৃশ্যত কার্টার তিনটি কারণে পরাজিত হয়েছিলেন এক. ওমর তোরিজোর হাতে পানামা যোজক প্রণালীকে ফিরিয়ে দেওয়া। দুই. ইরান থেকে একেবারে পানির চেয়েও সস্তা দামে আসা জ্বালানীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তিন. ইরানের হাতে জিম্মি মার্কিন কূটনীতিবিদদের মুক্ত করতে না পারা। কিন্তু অদৃশ্য কারণগুলো আরও বেশী শক্তিশালী ছিল। কার্টার গোটা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি পেট্রোলিয়ামের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতাকে কমাতে চেয়েছিলেন। তাই কর্পোরেটোক্রেসি কার্টারকে সরিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বানালো যিনি সামরিক শক্তির উপরে নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতেন। হোয়াইট হাউজে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ করতে চললেন যিনি গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব শ্রমকে নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিধি নির্দিষ্ট নিয়তি বলে ক'দিন পরেই হোয়াইট হাউজের ছাদে সৌরশক্তির প্যানেলগুলোকে লাগিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে রোনাল্ড রেগান ৪০তম প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ নেওয়ার পরের দিনই প্যানেলগুলোকে খুলে ফেলেছিলেন।

কার্টার হয়তোবা একজন অকার্যকর রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল সেই যুক্তরাষ্ট্রকে গড়তে চেয়েছিলেন। সবদিক থেকে বিচার করলে তাকে অকপট ও সেকেলে বলে মনে হয়। মনে হয় যে, যেসব আদর্শ আমেরিকান জাতিকে গড়ে তুলেছিল ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের এখানে টেনে এনেছিল কার্টার সেসব আদর্শের প্রতীক। তার আগের ও পরের মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সাথে তুলনা করলে তাকে এক অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। অর্থনৈতিক ঘাতকদের এই যুগের চলমান ধারার সাথে তার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারেই বেমানান।

অন্যদিকে রোনাল্ড রেগান ছিলেন বিশ্ব সাম্রাজ্যের একজন একনিষ্ঠ নির্মাতা, কর্পোরেটোক্রেসির একজন বিশ্বস্ত সেবক। নির্বাচনে তার বিজয়ের পর তার জীবনী পড়ে

আমি জানতে পারলাম যে, তিনি হলিউডের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত একজন অভিনেতা ছিলেন। অর্থাৎ পরিচালকদের নির্দেশ মোতাবেক তিনি অভিনয় করেছেন। এটাই হচ্ছে তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। যে সব ব্যক্তি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে মার্কিন সরকার এই চক্রের মধ্যে অনবরত ঘোরাফেরা করেন সেসব ব্যক্তির পরামর্শ মাফিক সরকারকে চালানোই হবে রেগানের প্রধান দায়িত্ব। দৃশ্যত জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ, জর্জ শুলজ, ক্যাসপার ওয়েনবার্গার, রিচার্ড চেনি, রিচার্ড হেমস ও রবার্ট ম্যাকনামারার মতো ব্যক্তিরা রেগানের নির্দেশ মাফিক যার যার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু আসল এদের পরামর্শ মোতাবেক রেগান তার প্রশাসনিক নীতিমালাকে প্রণয়ন করবেন। এরপর এরা একনিষ্ঠভাবে সেসব নীতিকে বাস্তবায়িত করবেন। রেগানের কাজ হবে কর্পোরেটোক্রেসির মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করা। এতে রেগান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো তিনটি বিষয়। এক. যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব শ্রমকে নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। দুই. মার্কিন সামরিক বাহিনী গোটা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে বজায় রাখবে। তিন. আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণকে গোটা বিশ্ব জুড়ে বহাল রাখবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, সামনে অর্থনৈতিক ঘাতকদের সুদিন আসছে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ঠিক এ সময়েই আমি এই জগত থকে বেরিয়ে এসেছি। এ নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা করি ততই আমি স্বস্তি অনুভব করি। আমি সঠিক সময়েই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দীর্ঘমেয়াদী রেগানোমিক্সের পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই। তবে যেটুকু ইতিহাস আমি পড়েছি সেটুকু থেকে জেনেছি যে, কোন সাম্রাজ্যই চিরদিন স্থায়ী হয় না। আর ঘড়ির দোলক দু'দিকেই দোলে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এই যে, রোলদোর মত ব্যক্তিরা এখনো আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। ইকুয়েডরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট যে চলমান যুগের বহু সূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপারকে ভালোভাবে বোঝেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমি জানতাম যে, রোলদো ওমর তোরিজোর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। এমনকি রোলদো পানামা যোজক প্রণালী সম্পর্কে দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে কার্টারের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, রোলদো তার পথ থেকে টলবেন না। আমি আশা করেছিলাম যে, তার সৎ সাহস অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু সুবিধাবাদীদের এই স্বার্থপর জগতে ওমর তোরিজো ও হাইমে রোলদো ছিলেন পুরোপুরিভাবে নিঃসঙ্গ।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের শুরুর দিকে রোলদো প্রশাসন ইকুয়েডরের কংগ্রেসে দেশটির নতুন জ্বালানী আইন উপস্থাপন করল। আইনটি পাস হলে তা আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর সাথে ইকুয়েডরের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আমূলভাবে পাল্টে দিতো। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ এই খসড়া আইনকে সবদিক থেকে চরমভাবে বিপ্লবী বলে

আখ্যায়িত করলেন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইকুয়েডরের জ্বালানী সম্পদের উপরে দেশটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এই আইনটি বাস্তবায়িত হলে বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো। স্বাভাবিক ভাবেই এসব প্রাকৃতিক সম্পদের বিপণনকারী বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর প্রতিক্রিয়া বিরূপ হতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা অনুযায়ীই বিরূপ হলো। এরা একেবারে আদা-নুন খেয়ে মাঠে নেমে পড়ল। সংস্থাগুলোর প্রচার কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে হাইমে রোলদোর চরিত্র হননের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে এসব সংস্থার তদবিরকারীরা ব্রিফকেস বোঝাই হুমকি ও প্রলোভন নিয়ে ওয়াশিংটন ও কুইটোর মাঝে ছুটোছুটি শুরু করল। তারা ইকুয়েডরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্টকে দ্বিতীয় ফিদেল কাস্ত্রো বানাতে চাইল। কিন্তু রোলদো কোন হুমকির কাছে নতি স্বীকার করলেন না। বরঞ্চ সজোরে রাজনীতি ও জ্বালানীর মধ্যকার ষড়যন্ত্রকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানালেন। তার হাতে কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি বহুজাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর তাঁবেদারী করার দায়ে সামার ইন্সটিটিউট অফ লিঙ্গুয়িস্টিক্সকে অভিযুক্ত করলেন। এর ক'দিন পরই রোলদো সংস্থাটিকে ইকুয়েডর থেকে বহিষ্কারও করলেন।

ইকুয়েডরের কংগ্রেসে নতুন জ্বালানী আইন উপস্থাপনের কয়েক সপ্তাহ পরে রোলদো বললেন যে, ইকুয়েডরের জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতিগ্রহণ না করলে প্রতিটি বিদেশী সংস্থাকে ইকুয়েডর ছেড়ে যেতে হবে। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন কুইটোর আতাহওয়ালপা অলিম্পিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়। জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর তিনি বিমানে উড়ে দক্ষিণ ইকুয়েডরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের উদ্দেশ্যে কুইটো ত্যাগ করলেন।

কয়েক ঘন্টা পর তাকে বহনকারী বিমানটি মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড ভাবে ধসে পড়ল মাটিতে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ২৪ শে মে তারিখে।

গোটা বিশ্ব এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। পুরো ল্যাটিন আমেরিকা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই অঞ্চলের প্রতিটি সংবাদপত্রের ২৫শে মে তারিখের সংখ্যার রক্তিম শিরোনাম ছিল, 'খুন করেছে সিআইএ'। নিঃসন্দেহে রেগান প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলো হাইমে রোলদোকে ঘৃণা করত। সেই সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যেসব তথ্য প্রকাশিত হলো সেগুলো লাটিন আমেরিকান মিডিয়াগুলোর সন্দেহকেই সমর্থন করল। দিন যত গড়ালো ততবেশী তথ্য প্রকাশিত হলো। যতবেশী তথ্য প্রকাশিত হলো ততবেশী এই হত্যাকাণ্ডে সিআইএ'র সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে লাটিন আমেরিকানদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। ইকুয়েডরের সরকারী তদন্ত যথারীতি এক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণকে খুঁজে পেল না। কিন্তু ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো মিডিয়াকে জানালো যে, রোলদোকে তার প্রাণনাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রে একাধিক

বিকল্পকে ব্যবহার করতেন। যে যানবাহনকে তিনি ব্যবহার করবেন সেটিকে বাছাই করা হতো একেবারে শেষ মুহূর্তে। বিমানের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। ২৪ মে তারিখে রোলদো তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক একটি বিকল্প বিমানে চড়েছিলেন। এটিই মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হলো।

এই খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা বিশ্বে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটল। কিন্তু মার্কিন মিডিয়াতে খবরটি কোন গুরুত্বই পেল না।

হাইমে রোলদোর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার ভাইস প্রেসিডেন্ট অসভালদো হুর্তাদো ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করলেন। তিনি সামার ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুয়িস্টিক্সের উপরে আরোপিত বহিষ্কারাদেশকে প্রত্যাহার করলেন। সংস্থাটির কর্মীদের ইকুয়েডরে প্রবেশের ভিসা দেওয়া হলো। ইকুয়েডরের কংগ্রেস থেকে রোলদো প্রশাসনের খসড়া জ্বালানী আইনকে প্রত্যাহার করা হলো। বছরের শেষ ভাগে হুর্তাদো প্রশাসন ইকুয়েডরের আমাজান অববাহিকায়ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে নতুন জ্বালানী ক্ষেত্র অনুসন্ধানের অনুমতি দিলো টেক্সকো ও অন্যান্য মার্কিন বহুজাতিক জ্বালানী সংস্থাকে। এতে টেক্সকো প্রথমবারের মতো গুয়াইয়াকুইল উপসাগর এলাকায় জ্বালানী অনুসন্ধানের সুযোগ পেল।

ওমর তোরিজো হাইমে রোলদোর মৃত্যুর পর তাকে ভাই বলে ডেকেছিলেন। মে মাসে ওমর তোরিজো নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, তার মৃত্যুও রোলদোর মতো একই ভাবে ঘটতে পারে।

ওমর তোরিজোর ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র দু'মাসের মধ্যেই বর্ণে বর্ণে মিলে গেল।

অধ্যায়-২৭
পানামা ঃ আরেক প্রেসিডেন্টের মৃত্যু

আমি রোলদোর মৃত্যুতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার তো তা হওয়ার কথা ছিল না। আমি আর যাই হোক না কেন, মোটেও সরল নই। আমি আর্বেঞ্জ, মোসাদ্দেক, আলেন্দেসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু মৃত নায়কের মর্মান্তিক পরিণতির প্রকৃত কাহিনী জানি। এদের সকলের নাম সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। এমনকি এদের সবার কথা ইতিহাসের পাতায় লেখাও হয়নি। কিন্তু কর্পোরেটোক্রেসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়ে অকালেই এদের প্রাণ ঝরে পড়েছে। তারপরও রোলদোর মৃত্যু আমাকে স্তব্ধ করে ফেলেছিল। কেননা, কৌশলটি ছিল একেবারেই স্থূল।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশীর ভাগ জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ সাফল্য অর্জনের পর এ ধরনের নগ্ন স্থূল কৌশলকে আমি মৃত অতীত বলে ধরে নিয়েছিলাম। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল। হাইমে রোলদোর মৃত্যু যে আদৌ দুর্ঘটনা নয় এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। পুরো ঘটনাটিতেই সিআইএ'র প্রভাব একেবারে সুস্পষ্ট। ঘটনাটি একেবারে নগ্ন স্থূলভাবে ঘটানোর পেছনে যে একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে, তা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। রেগান প্রশাসনের মনোভাব শুরু থেকেই ছিল বুনো পশ্চিমে ঘোড়া ছুটিয়ে সিং শুটার রিভলবারে আগুন ঝরিয়ে বেড়ানো কাউবয়দের মতো। এটা অবশ্য হলিউডে তৈরি করা কাউবয়দের ইমেজ। আসল কাউবয়রা কখনোই এ রকম বুনো ছিল না। হলিউডের কাউবয় মার্কা ছায়াছবিগুলোতে অভিনয় করার সুবাদে রোনাল্ড রেগানের মানসিকতা একই রকম ভাবে গড়ে উঠেছিল। আর তার প্রশাসনের পক্ষে এ ধরনের নগ্ন স্থূল কৌশলকে অবলম্বন করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। যে শৃগাল বাহিনীকে দীর্ঘদিন চিড়িয়াখানার খাঁচাগুলোতে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই শৃগাল বাহিনী একেবারে নখে-দাঁতে শান দিয়ে মুক্ত বিশ্বে বেরিয়ে এলো। তাদের প্রথম শিকার হলেন হাইমে রোলদো। রোলদোর মৃত্যু কর্পোরেটোক্রেসির বিরুদ্ধাচারণকারীদের জন্য হুঁশিয়ারি বয়ে আনলো। এমনকি যারা মনে মনে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিরোধিতা করার পরিকল্পনা আঁটছিলেন তারাও এতে সতর্ক হতে পেরেছেন।

একজন রাষ্ট্রনায়ক এতে বিন্দুমাত্রও টলেন নি। তিনি ছিলেন পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর

তোরিজো। ওমর তোরিজো পানামা থেকে সামার ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুয়িস্টিক্সকে বহিষ্কার করেছিলেন। এমনকি ওমর তোরিজো রেগান প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী পানামা যোজক প্রণালী চুক্তি সম্পর্কে নতুনভাবে আলোচনা শুরু করতে রাজি হননি।

রোলদোর মৃত্যুর ঠিক দু'মাস পর তোরিজোর মৃত্যু ঘটনা একই কায়দায়। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ৩১ শে জুলাই ওমর তোরিজোকে বহনকারী বিমানটি মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হলো। এরপর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়লো মাটিতে। গোটা বিশ্ব কেঁপে উঠল। পুরো ল্যাটিন আমেরিকার লোক চরম পর্যায়ে উপনীত হলো। ওমর তোরিজো পুরো বিশ্বে সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক রাষ্ট্রনায়ক যিনি পানামা যোজক প্রণালীকে এর বৈধ মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রেগান প্রশাসনকে প্রতিরোধ করার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখিয়ে ছিলেন। তাই গোটা বিশ্ব তাকে শ্রদ্ধা করত। ওমর তোরিজো মানবাধিকার সংরক্ষণের এক সোচ্চার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক শরণার্থীদের উন্মুক্ত হৃদয়ে স্বাগত জানাতেন। সেই সাথে ওমর তোরিজো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক নিরলস কর্মী ছিলেন। অনেকেই তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পরবর্তী বিজয়ী হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। এখন তিনি মৃত। ল্যাটিন আমেরিকার সংবাদপত্রগুলোর ১লা আগস্ট সংখ্যার শিরোনাম ছিল, 'আবারো খুন করেছে সিআইএ'।

গ্রাহাম গ্রীনের প্রথম বাস্তবভিত্তিক বই *জেনারেলের সাথে পরিচয়* প্রকাশিত হলো ওমর তোরিজোর মৃত্যুর কয়েক মাস পর। বইটি পানামাতে গ্রীনের চতুর্থ ভ্রমণের উপরে ভিত্তি করে লেখা। এই ভ্রমণের সময়েই গ্রীনের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল হোটেল পানামাতে। জেনারেলের সাথে পরিচয় বইটি শুরু হয়েছিল ঠিক এভাবে।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে আমি পঞ্চম বারের মতো পানামা ভ্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময়ই টেলিফোনে খবর পেলাম যে, আমার পরম সুহৃদ জেনারেল ওমর তোরিজো হেরেরা মৃত্যুবরণ করেছেন। যে ছোট বিমানটিতে করে তিনি কোক্লেসিতো পর্বতমালায় তার অরণ্য ভবনে যাচ্ছিলেন, সেটি মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল। যাত্রীদের কেউই প্রাণে রক্ষা পাননি। ক'দিন পর ওমর তোরিজোর প্রধান দেহরক্ষী সার্জেন্ট চুচু ওরফে হোসে বি জেসাস মার্টিনেজ, পানামা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রীয় দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক, গণিতবিদ ও কবি, টেলিফোনে আমাকে জানালেন, "ওমর তোরিজোকে বহনকারী বিমানে যে বোমা ফিট করা হয়েছিল এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত। টেলিফোনে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

যে ব্যক্তিত্ব দরিদ্র ও দুর্বলকে রক্ষাকারী রূপে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার মৃত্যুতে গোটা বিশ্ব শোক প্রকাশ করল। পুরো বিশ্বই সিআইএ'র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত চালানোর জন্য জোরালো ভাবে দাবি জানাল। কিন্তু ওয়াশিংটন এই দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাতও করল না। ওমর তোরিজোকে ঘৃণা করত এমন লোকের সংখ্যা কম ছিল না। এদের মধ্যে কর্পোরেটোক্রেসির নীতিনির্ধারক মহলগুলোর কর্ণধারদের সংখ্যাই ছিল বেশী। রিগান প্রশাসন ওমর তোরিজোকে এক বিপজ্জনক দায় বলে মনে করত। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান, ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, পররাষ্টমন্ত্রী জর্জ শুলজ প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী ক্যাসপার ওয়েনবার্গার, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ওমর তোরিজোকে মোটেও পছন্দ করতেন না। তারা ওমর তোরিজোকে এক বিপজ্জনক মতবাদের প্রবক্তা বলে মনে করতেন।

ওমর তোরিজো-কার্টার চুক্তির একটি ধারা মোতাবেক পানামাতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর আমেরিকান স্কুল ও দক্ষিণাঞ্চলীয় কমাণ্ডের ট্রপিক্যাল ওয়ারফেয়ার সেন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের সামনে একটি জটিল সমস্যার উদ্ভবও ঘটেছিল। হয় তাদেরকে ওমর তোরিজো-কার্টার চুক্তিকে এড়িয়ে চলার পথ খুঁজে বার করতে হতো, না হয় তাদেরকে অন্য কোন দেশে এসব কেন্দ্র স্থাপন করতে হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোন দেশই নিজ মাটিতে এহেন বিদেশী গোয়েন্দা ও সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করতে দিতে রাজি ছিল না। সে ক্ষেত্রে মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে তৃতীয় আরেকটি পথ খোলা ছিল। ওমর তোরিজোকে অপসারণ করে তার উত্তরসূরীর সাথে ওমর তোরিজো-কার্টার চুক্তি সম্পর্কে নতুনভাবে আলোচনা করা।

ওমর তোরিজোর বাণিজ্যিক শত্রুগুলোর মধ্যে প্রধানতম ছিল বৃহৎ বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো। বেশীর ভাগ সংস্থার সাথেই মার্কিন রাজনীতিবিদদের সুসম্পর্ক রয়েছে। এসব সংস্থা ল্যাটিন আমেরিকার মানব শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন পেট্রোলিয়াম, কাঠ, টিন, তামা, বক্সাইট ও কৃষি জমিকে নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে নির্মাণকারী, যোগাযোগ, সামুদ্রিক ও স্থল পরিবহন, প্রকৌশলী এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলো। বস্তুতপক্ষে ল্যাটিন আমেরিকা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অবাধ বিচরণক্ষেত্র।

বেখটেল গ্রুপ ইনকর্পোরেটেডের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছেন জর্জ শুলজ ও ক্যাসপার ওয়েনবার্গার। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর মধ্যকার সুসম্পর্কের সেরা উদাহরণ হচ্ছেন শুলজ-ওয়েনবার্গার জুটি। বেখটেলের কর্মকাণ্ডের সাথে আমি খুব ভালভাবেই পরিচিত ছিলাম। মেইনের কর্মীগণ প্রায়শই বেখটেলের কর্মীদের সাথে একযোগে কাজ করত। বেখটেলের প্রধান স্থপতি আমার ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। বেখটেল ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রকৌশলী ও নির্মাণকারী সংস্থা। বেখটেলের নীতিনির্ধারক মহলের অধিকাংশ সদস্যই ওমর তোরিজোকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। কেননা, ওমর তোরিজো পানামার প্রাচীন যোজক প্রণালীকে বন্ধ করে দিয়ে নতুন ও বেশী কার্যকর প্রণালী খননের জাপানী পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিলেন। এতে পানামার যোজক প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে জাপানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতো। সেই সাথে বেখটেল শতাব্দীর সেরা প্রকল্পকে বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো।

ওমর তোরিজো এহেন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এই কাজটি করতেন এক অসাধারণ প্রসন্নতা, সম্মোহিনী শক্তি ও রসবোধের সাথে। ওমর তোরিজোর মৃত্যুর পর পানামার নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন দেশটির সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল ম্যানুয়েল নারিয়েগা। নারিয়েগার মধ্যে

ওমর তোরিজোর রসবোধ, সম্মোহনী শক্তি ও প্রখর বিচক্ষণতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাই নারিয়েগা, রেগান, বুশ ও বেখটেলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুঃসাহস কখনই দেখাননি।

ওমর তোরিজোর মর্মান্তিক মৃত্যু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। ওমর তোরিজোর সাথে আমার যে কয়েকটি আলোচনা হয়েছিল সেগুলোর স্মৃতি মনে করে আমি বহু রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। এক মধ্যরাতে অমি একটি সাময়িকীতে ছাপা ওমর তোরিজোর ছবির দিকে চেয়েছিলাম। তখন হঠাৎ করেই পানামাতে আমার প্রথম রাতটির কথা মনে পড়ল। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এক নির্জন রাস্তায় একটি ট্যাক্সিতে আমরা ক'জন বসে রয়েছি। ট্যাক্সিটি থেমে রয়েছে ওমর তোরিজোর বিশাল এক প্রতিকৃতির সামনে। প্রতিকৃতির নিচে লেখা রয়েছে, 'ওমরের আদর্শ হচ্ছে স্বাধীনতা, কোন মিসাইল এই আদর্শকে হত্যা করতে পারবে না।' এই শ্লোগানটি প্রথম রাতের মতই আমাকে আবারও কাঁপিয়ে তুলল।

তখন আমি অনেক তথ্যই জানতাম না। ওমর তোরিজো পানামার যোজক প্রণালীর মালিকানা পানামার হাতে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্টারের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সাথে ওমর তোরিজো রেগান প্রশাসনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে লাতিন আমেরিকার ডানপন্থী স্বৈরশাসকদের সাথে অঞ্চলটির সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এতে রেগান প্রশাসন রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ওমর তোরিজো নিজেই নিজের টুইন অটার প্লেনটিকে চালাচ্ছিলেন। সে সময়ই প্লেনটি মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল। ফলে মাত্র ৫২ বছর বয়সে নিহত হয়েছিলেন ওমর তোরিজো হেরেরা। এ ধরনের মৃত্যুর মতো এই মৃত্যুর সাথেও সিআইএ জড়িত ছিল। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সিনেটে যে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ওমর তোরিজো বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসের বিস্তারকে প্রতিহত করার পদক্ষেপ নিতেন। তার অতীত কর্মকাণ্ডের উপরে ভিত্তি করে আমরা ধারণা করতে পারি যে, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া ও পেরুর আমাজান অববাহিকায় আন্তর্জাতিক জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলো জ্বালানী উত্তোলনের নামে যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল তাকে মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই ওমর তোরিজো প্রচেষ্টা চালাতেন। জ্বালানী প্রতিষ্ঠানগুলোর এহেন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সহিংসতা, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। ওয়াশিংটন এসব বিক্ষোভকে গেরিলা বাহিনী ও মাদক পাচারকারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করছিল। কিন্তু ওমর তোরিজো অবশ্যই এসব সহিংসতাকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলোর বসতভিটা ও কৃষি জমি রক্ষার বেপরোয়া পদক্ষেপ বলে মনে নিতেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ওমর তোরিজো আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারতেন।

এ ব্যাপারটি সিআইএ, এনএসএ ও অর্থনৈতিক ঘাতকেরা মেনে নিতে পারে নি।

অধ্যায়-২৮

আমার জ্বালানী প্রতিষ্ঠান, এনরন ও জর্জ বুশ

ওমর তোরিজের মৃত্যুর সময় বেশ কয়েক মাস পলার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি। এ সময়ে আমি বেশ কয়েকজন যুবতীর সাথে মেলামেশা করছিলাম। এদের মধ্যে একজন ছিল ইউনিফ্রেড গ্র্যান্ট। মেয়েটি মেইনের পরিবেশ পরিকল্পনা বিভাগের এক নতুন কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ছিল। উইনির বাবা বেখটেলের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। পলা তখন কলম্বিয়ার এক সাংবাদিকের সাথে মিশছিল। আমি ও পলা আগের মতই বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে প্রেম গড়ে উঠেছিল তার অবসান ঘটেছিল।

একজন অভিজ্ঞ তদবিরকারীর দায়িত্ব পালন করতে আমি রীতিমত বিব্রত বোধ করছিলাম। বিশেষ করে সীব্রুক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি আমার জন্য মানসিকভাবে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, আমি আবারো কর্পোরেটোক্রেসির কাছে নিজেকে বিক্রি করেছি। আবারো শ্রেফ ক'টা কাঁচা ডলারের লোভে অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন করছি। এ সময় উইনি যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছে আমাকে। সে একজন কট্টর পরিবেশবাদী ছিল। তারপরও সে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে ঠিক মতো বুঝতে পেরেছিল। সানফ্রান্সিসকো মহানগরীর ইস্ট বে'তে সে বড় হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেছিল। সে সব বিষয়েই মুক্তভাবে চিন্তা ভাবনা করতে অভ্যস্ত ছিল। এদিক থেকে উইনির সাথে আমার রক্ষণশীল মা-বাবা ও অন্যদের মধ্যে বড় পার্থক্য ছিল।

আমাদের সম্পর্ক উষ্ণ ও আন্তরিকভাবে গড়ে উঠল। উইনি মেইন থেকে দীর্ঘকালীন ছুটি নিল। আমরা দু'জনে আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল ঘেঁষে বোস্টন থেকে ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে ইয়ট চালালাম। আমরা কোন তাড়াহুড়ো করি নি। বরঞ্চ যাত্রা পথে যে ক'টি বন্দরের পরিবেশকে মনে ধরেছে সেগুলোতে রাত কাটিয়েছি। কখনও কখনও কোন বন্দর থেকে বিমান ভাড়া করে উড়ে গেছি তদবিরকারীর দায়িত্ব পালন করতে। অবশেষে আমরা ফ্লোরিডায় পৌঁছলাম। অনেক ঘোরাফেরা করার পর ওয়েস্ট পাম বীচের একটি অ্যাপার্টমেন্টকে আমরা পছন্দ করলাম। এখানেই আমরা বিয়ে করলাম। এখানেই

আমাদের একমাত্র সন্তান জেসিকা ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করল। এ সময় আমার বয়স ছিল ৩৬ বছর। আমার পর্যায়ের লোকদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী বয়সে সংসার পেতেছি ও সন্তানের বাবা হয়েছি।

সীব্রুক প্রকল্পে আমি যে দায়িত্ব পালন করছিলাম। এর একটি অংশ ছিল এই প্রকল্পের দ্বারা সবচেয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে এ কথাটি নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বোঝানো। আমি প্রথমে পারমাণবিক শক্তির বিষয়টি ভালভাবে বুঝি নি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত পড়াশুনা করতে লাগলাম তত পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। প্রতিনিয়তই এ সম্পর্কে নিত্য নতুন গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রতিক্ষণেই পারমানবিক শক্তি সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান সমৃদ্ধ হচ্ছিল। সেই সাথে আমি পারমাণবিক শক্তির বিকল্পগুলো সম্পর্কেও অবহিত হচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার নিরাপদ এ ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথার্থতা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ভুল পদক্ষেপ গ্রহণের সহজাত মানবিক প্রবণতা, যান্ত্রিক ত্রুটি ও বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতির অপর্যাপ্ততার কারণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সব সময়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। যেভাবে আমাকে বিভিন্ন সালিশে শপথ নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছিল তা আমার জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সাথে আমি আরও বুঝলাম যে, বিকল্প জ্বালানীগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে তা গোটা বিশ্বের পরিবেশচক্রকে সংরক্ষণের কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। এ কথাটি বর্জ্য পদার্থরূপে বিবেচিত বস্তুগুলো থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য।

অনেকদিন মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগার পর আমি সীব্রুক প্রকল্পের তদবিরকারীর দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই লাভজনক ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আমি একটি নতুন জ্বালানী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে হাত দিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি বিকল্প উৎসগুলো থেকে জ্বালানী উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তিগুলোকে কাছে লাগবে। সেই সাথে এক্ষেত্রের অনেক নতুন তত্ত্বের সম্ভাব্যতাকেও যাচাই করবে। এই পদক্ষেপের ঝুঁকি সত্ত্বেও উইনি আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল। অথচ সেই সময় সে প্রথমবারের মতো নিজের সংসার গড়ে তোলার কাজে পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে জেসিকার জন্মের কয়েক মাস পরে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার সিস্টেম নামের একটি সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করলাম। সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল পরিবেশ সহায়ক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা। এই লক্ষ্যটি হাসিল হলে তা অন্যান্য সংস্থার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াত। এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের সংস্থাগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমার বেলায় বেশ কিছু বিচিত্র সমানুপাতিক ঘটনা আমার প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিবিধ সূত্র থেকে আমি অযাচিতভাবে

সহযোগিতা পেয়েছি। এগুলো যে আমার অতীত কর্মকাণ্ড ও এ সম্পর্কে আমার নীরবতা অবলম্বনের ফসল এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

ব্রুনো জামবোত্তি ইন্টারআমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের শীর্ষতম কার্যনির্বাহী পদগুলোর একটিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনি আমার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য পদ গ্রহণ করে একে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে রাজি হলেন। ফলে আমি ব্যাংকার্স ট্রাস্ট, ইএসআই এনার্জি, প্রুডেন্সিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, শাদবের্ন অ্যান্ড পার্ক ও রিলে স্টোকার কর্পোরেশন থেকে বেশ মোটা অংকের বিনিয়োগ পেলাম। শাদবের্ন অ্যান্ড পার্ক হচ্ছে ওয়াল স্ট্রীটের একটি 'ল' ফার্ম। এর অন্যতম অংশীদার হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সিনেটর ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এডমন্ড মাস্ক। অন্যদিকে রিলে স্টোকার কর্পোরেশন হচ্ছে অ্যাশল্যান্ড অয়েল কোম্পানীর মালিকানাধীন একটি প্রকৌশলী সংস্থা। রিলে স্টোকারের মূল কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর জন্য বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন বয়লারের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ করা। এমনকি মার্কিন কংগ্রেসও আমার প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কয়েকটি কর থেকে রেহাই দিলো। এতে আইপিএস প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলো থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে আইপিএস ও বেখটেল একই সাথে ও পরস্পর থেকে পৃথকভাবে কয়েকটি বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজে হাত দিলো। এসব কেন্দ্রে আবর্জনা হিসেবে পরিত্যক্ত কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। অথচ এই কাজের ফলস্বরূপ বৃষ্টির পানিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। এক দশক পর এসব কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটালো। আমরা বর্জ্য পদার্থ হিসেবে যেসব পদার্থকে প্রতিনিয়ত অপচয় করি সেগুলো থেকেও যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব তা এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো। এতে উৎসাহিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ জাতীয় পরিবেশ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উৎসাহিত হলো। সে সাথে প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি অসার বলে প্রমাণিত হলো। এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, ওয়ালস্ট্রীটসহ বিভিন্ন প্রথাসিদ্ধ বিনিয়োগকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নতুন ও ক্ষুদ্র সংস্থা এ ধরনের নতুন প্রযুক্তিকে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারে। আইপিএসের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে বাড়তি তাপশক্তি উৎপাদিত হতো তা দিয়ে সাড়ে তিন একর আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্রীন হাউজের চাহিদা মেটানো হতো। এভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে সহায়তা করেছে।

আইপিএসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুবাদে আমি জ্বালানী শিল্পের অন্দরমহলে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলাম। এইখাতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যেমন বিভিন্ন সংস্থার নীতিনির্ধারকগণ, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চপদস্থ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, আইনজীবিগণ ও তদবিরকারীবৃন্দের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার শ্বশুর বেখটেলে ৩০ বছর চাকরি করার পর সংস্থাটির স্থাপত্য বিভাগের প্রধান পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম। আশির দশকে তিনি সৌদি আরবের বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক শহর নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তার এই দায়িত্ব পালন ছিল

সত্তরের দশকের শুরুতে আমি সৌদি আরবের অর্থ পাচারের যে ছক কষেছিলাম তারই ফলশ্রুতি। উইনি সানফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত বেখটেলের সদর দপ্তরের খুব কাছাকাছিই বড় হয়েছিল। সে আক্ষরিক অর্থেই ছিল বেখটেল পরিবারের সদস্যা। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভের পর পরই তার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল বেখটেলেই।

এদিকে আন্তর্জাতিক জ্বালানী শিল্পখাতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছিল। বৃহৎ জ্বালানী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রায়শই বৃহৎ প্রকৌশলী সংস্থাগুলোর বাণিজ্যিক যুদ্ধ ঘটছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ জ্বালানী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল বিশেষ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সুবাদে। আশির দশকের শেষভাগে এসব আইনের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নিজেদের স্বার্থেই এসব আইনকে নবায়ন করতে ইচ্ছুক ছিল না। বরঞ্চ এই খাতে যে সব নতুন আইন পাস করা হলো সেগুলো সকল কাজের কাজী প্রকৌশলী সংস্থাগুলোকে এইখাতে ঢোকার সুযোগ দিলো। প্রকৌশলী সংস্থাগুলোর উচ্চাভিলাষী কর্ণধারগণ ঝড়ের গতিতে জ্বালানী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করতে লাগলেন। এরপর এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এগুলোকে টপাটপ কিনতে লাগলেন। পরিস্থিতির এহেন দ্রুত পরিবর্তন দেখে গোটা বিশ্বের সরকারগুলো ও আইন পরিষদবৃন্দ একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। বিশেষজ্ঞরা এই সময়কে "জ্বালানীখাতের বুনো পশ্চিম যুগ" বলে অভিহিত করলেন।

এই ব্যাপক পরিবর্তনের প্রথম দিককার অন্যতম প্রধান শিকার হলো মেইন। ব্রুনো একদিন বলেছিলেন যে, ম্যাক হল বাস্তবের সাথে সম্পর্ক হারিয়েছেন। অথচ কেউ তাকে এ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। ব্রুনোর ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। পল প্রিডি কখনোই মেইনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। ফলে প্রতিষ্ঠানটি পরিবর্তনের সুফলকে কাজে লাগাতে পারেনি। বরঞ্চ এর ব্যবস্থাপকদের কতকগুলো ভুল নীতি প্রতিষ্ঠানটির পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলল। ব্রুনোকে ছাঁটাই করার পরপরই মেইন অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ব্রুনোর আমলে অর্জিত রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা থেকে সংস্থাটি নেমে গিয়েছিল লোকসানের ঘরে। অবশেষে মেইন দেউলিয়া হয়ে পড়ল। একে কিনে নিল একটি বৃহৎ প্রকৌশলী ও নির্মাণকারী সংস্থা। এই সংস্থাটি কখনোই আর্থিক লোকসানের শিকার হয়নি।

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে পদত্যাগের সময়ে আমি আমার প্রতিটি ইউনিট শেয়ারের মূল্য বাবদ মেইনের কাছ থেকে ৩০ ডলার করে পেয়েছিলাম। চার বছর পর মেইন বিক্রি হওয়ার সময় এর অংশীদাররা প্রতি ইউনিট শেয়ারের মূল্য বাবদ ১৫ ডলারও পায়নি। এভাবেই মেইনের একশ বছরের গর্বিত কর্মকাণ্ডের শোচনীয় পরিণতি ঘটল। সংস্থাটির এহেন পরিণতি দেখে আমি মনে মনে দুঃখ পেলাম। কিন্তু সময় মতো চাকরি ছেড়ে দিতে পেরে মনে মনে শান্তিও অনুভব করলাম। নতুন মালিকরা মেইনের নাম ও প্রতীক মাত্র অল্প ক'দিনের জন্য ব্যবহার করলেন। এরপর মেইন নতুন নামের আড়ালে হারিয়ে গেল।

একদিন যে প্রতীক গোটা বিশ্বে অবিশ্বাস্য মর্যাদা ভোগ করত সেই প্রতীক চিরদিনের জন্য মুছে গেল।

আন্তর্জাতিক জ্বালানী খাতে ওলট-পালট ঘটার কারণে মেইনের মতো বেশ কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। অন্যদিকে হঠাৎ করেই উত্থান ঘটল এনরনের মতো দীর্ঘদিন অখ্যাত ও অজ্ঞাত পর্যায়ে পড়ে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর। বিশেষ করে এনরন পরিণত হলো এইখাতে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতিকারী প্রতিষ্ঠানে। একেবারে নগণ্য পর্যায়ে থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতির শিখরে সংস্থাটি আরোহণ করল বিশাল সব চুক্তি বাগানোর মাধ্যমে। বেশীর ভাগ বাণিজ্যিক বৈঠকের চিত্র একই রকম। অংশগ্রহণকারীরা ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসেন। ব্রীফকেস খুলে ফাইল বার করে সামনে রাখেন। এরপর কাপে কফি ঢালেন। গরম কফির কাপে আয়েশ করে চুমুক দিতে দিতে রাজা-উজির মারেন। তারপর কাজের কথা শুরু করেন। আশির দশকের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত জ্বালানী খাতের বেশীর ভাগ আলোচনা শুরুই হতো এ ধরনের অলৌকিক উত্থানের কাহিনী দিয়ে। সংস্থাটির বাইরের লোকজন কখনোই এই উত্থানের রহস্যকে উদঘাটন করতে পারে নি। অন্যদিকে সংস্থাটির ভেতরের লোকজন এক রহস্যময় হাসি হেসে এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে যেত। খুব চাপাচাপি করলে সংস্থাটির কর্মীগণ উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা ও সৃজনশীল বিনিয়োগ শব্দ দুটিকে তোতাপাখির মতো উচ্চারণ করে সরে পড়তো। আসল কথা ছিল এই যে, এনরনের নীতি নির্ধারকগণ বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন মহলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম এ রকম একদল কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই সত্যটি উদঘাটন করতে আমাকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

এ থেকে আমি বুঝলাম যে, এনরন অর্থনৈতিক ঘাতক তত্ত্বের নতুন কৌশলকে প্রয়োগ করছে। সেই সাথে বিশ্ব সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে গোটা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা যারা আন্তর্জাতিক জ্বালানীর রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম তাদের কাজে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের বড় ছেলে জর্জ ওয়াকার বুশের প্রসঙ্গ ছিল অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। বুশ জুনিয়রের প্রথম জ্বালানী প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল আর্বুস্টো। এটি একটি স্প্যানিশ শব্দ যার ইংরেজী অর্থ ছিল বুশ। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে সংস্থাটি দেউলিয়া হওয়ায় একে কিনে নিয়েছিল স্পেক্ট্রাম-৭ নামের আরেকটি জ্বালানী সংস্থা। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে স্পেক্ট্রাম-৭ দেউলিয়া হওয়ায় একে কিনে নিল হার্কেন এনার্জি কর্পোরেশন তৃতীয় জ্বালানী সংস্থা। হার্কেন বুশ জুনিয়রকে বার্ষিক ১ লাখ ২০ হাজার ডলার বেতনের বিনিময়ে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করল।

জ্বালানীখাতের নির্বাহী কর্মকর্তা রূপে বুশ জুনিয়রের অতীত রেকর্ড ছিল একেবারেই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। তাই আমরা বলাবলি করলাম যে, রেগান প্রশাসনের প্রকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই হার্কেন বুশ জুনিয়রকে এত বড় পদে নিয়োগ করেছে। খুব সম্ভবত এ কারণেই হার্কেন নিজ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক

জ্বালানীখাতে প্রবেশ করার সুযোগ পেল। হার্কেনের এই কর্মকাণ্ড শুরুই হলো মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে। ভ্যানিটি ফেয়ার সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে লেখা হলো, 'বুশ জুনিয়রকে নিয়োগ করার পর পরই হার্কেন অভূতপূর্ব সুযোগগুলোকে অর্জন করল। এগুলোর মধ্যে ছিল নতুন বিনিয়োগ, মূলধনের অপ্রত্যাশিত উৎস লাভ ও জ্বালানী উত্তোলনের আকস্মিক অধিকার প্রাপ্তি।'

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে আমোকো বাহরাইন সরকারের সাথে পারস্য উপসাগর এলাকায় জ্বালানী উত্তোলনের অধিকার প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করছি। সে বছরের শুরুতেই জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এর কয়েকদিন পর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ পরামর্শদাতা মাইকেল আমীন বাহরাইনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস হোস্টলারের সাথে দেখা করলেন। শুরু হলো বাহরাইনের নীতিনির্ধারক মহলে হোস্টলারের ছুটোছুটি। ক'দিন পর বাহরাইন সরকার আমোকোকে বাদ দিয়ে হার্কেনের সাথে আলোচনা শুরু করল। অমনি নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে হার্কেন এনার্জি কর্পোরেশনের শেয়ারের মূল্য ২০% বৃদ্ধি পেল। সাড়ে ৪ ডলার মূল্যের শেয়ার বিক্রি হতে লাগলো সাড়ে ৫ ডলারে।

বাহরাইনের কাণ্ড দেখে জ্বালানীখাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পর্যন্ত মর্মাহত হলেন। ওয়ালস্ট্রীটে অবস্থিত টুইন টাওয়ার্সের একটির ছাদে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান বারে বসে একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু ককটেল পান করছিলাম। আমার হাতে ছিল ভদকা মার্টিনির ও বন্ধুর হাতে ছিল জীন টনিকের গ্লাস। বন্ধুটি জ্বালানী খাতের একজন অতি ধুরন্ধর আইনজীবী। সেই সাথে রিপাবলিকান পার্টির একজন কট্টর সমর্থক। তিনি সখেদে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি আশা করি বুশ জুনিয়র এমন কোন কাজ করবেন না যার খেসারত বুশ সিনিয়রকে খুব খারাপ ভাবে দিতে হবে। আমার তো মনে হয় না যে, হার্কেনকে ব্যবসাটা দেওয়া এমন কোন জরুরি কাজ ছিল। ছেলের ক্যারিয়ার গড়তে গিয়ে কি বাবার প্রেসিডেন্সী সম্পর্কে ঝুঁকি নেওয়া উচিত?"

আমি পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের চেয়ে কম বিস্মিত হয়েছিলাম। কেননা, এক্ষেত্রে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান ও মিশরে কাজ করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির মারপ্যাচের মধ্যে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। সত্তরের দশকে আমি ও আমার সতীর্থ অর্থনৈতিক ঘাতকেরা বিশ্বব্যাপী এক বিশাল নেটওয়ার্ককে গড়ে তুলেছিলাম। পরবর্তীকালে এনরনের মতো সংস্থাগুলো এই নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়েছে।

বুশ পরিবার এই নেটওয়ার্ককে নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

অধ্যায়-২৯
আমি ঘুষ নিলাম

আমার জীবনের এই পর্বে এসে আমি এক বাস্তব উপলব্ধিকে অর্জন করতে পারলাম। আমরা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। এই যুগের প্রধান স্থপতি হচ্ছেন আমার আদর্শ রবার্ট ম্যাকনামারা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টরূপে দায়িত্ব পালন করার সময় যেসব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলোই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তার আগ্রাসী নেতৃত্ব তত্ত্ব ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত করার পরিকল্পনা থেকেই অর্থনৈতিক ঘাতক পদ্ধতির প্রয়োগ গোটা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। আর এই পদ্ধতির কুপ্রয়োগ থেকেই দুর্নীতি পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সকল পর্যায়ের কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাদেরকে এনএসএ'র মতো রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বাছাই বা নিয়োগ করে নি। কিন্তু তারা একই ধরনের দায়িত্ব পালন করছেন। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণে পরিণত হয়েছে।

অতীতের অর্থনৈতিক ঘাতকদের সাথে বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ঘাতকদের মধ্যে কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পার্থক্য বিরাজ করছে। অতীতের অর্থনৈতিক ঘাতকেরা আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত ঋণ ব্যয়ের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করতেন। বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ঘাতকেরা আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো প্রাপ্ত ঋণ ব্যয়ের কর্মকাণ্ডকে তদারকি করার ভার ঋণ গ্রহণকারী দেশের রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষাকারী সংস্থাগুলোর উপরে ছেড়ে দেন। গত শতাব্দীর আশির দশকে অর্থনৈতিক ঘাতকদের পুরোনো ও নবীন দু'টি শাখাই পাশাপাশি কাজ করেছে। সে সময় থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য পর্যায়ের কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণ যে কোন পন্থায় সাফল্য অর্জনের নীতিকে গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই কর্পোরেটোক্রেসির কর্মপদ্ধতি অতীতের তুলনায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যের দাসত্ব এখন বিপুল অংকের মুনাফা অর্জনের উৎসে পরিণত হয়েছে।

জ্বালানী শিল্প হচ্ছে এই নতুন প্রবণতার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এই শিল্পখাতেই আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস পাবলিক ইউটিলিটি রেগুলেটরি পলিসি অ্যাক্ট পাস করেছিল। টানা চার বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালতে এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে

বিবিধ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে অ্যাক্টটি আইনে পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে এই আইনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থাগুলো বিকল্প জ্বালানী উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করুক এটাই চেয়েছিল। এই আইনের আওতায় বৃহৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো ছোট সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ন্যায্য ও সঠিক মূল্যে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য ছিল। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার পেট্রোলিয়ামের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এই আইন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। আইনটির মূল লক্ষ্য ছিল বিকল্প জ্বালানী উৎসগুলোকে ব্যবহারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জ্বালানী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উদ্যোগ খাতের সম্প্রসারণ ঘটত। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক এর উল্টোটা।

আশির ও নব্বইয়ের দশকে বাণিজ্যিক উদ্যোগের চেয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে শিল্পগুলোকে বেসরকারীখাতে ছেড়ে দেওয়ার উপরে বেশী গুরুত্বারোপ করা হলো। এরই সুযোগে উন্নত বিশ্বে বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে স্রেফ গিলে খেল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জ্বালানী শিল্পে বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানী প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো বৃহৎ প্রকৌশল, নির্মাণ ও জ্বালানী সংস্থাগুলোর মাঝে বিলুপ্ত হলো। এসব বৃহৎ সংস্থার মধ্যে জ্বালানী সংস্থাগুলো আইনের ফাঁকগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিশালাকার কর্পোরেশনগুলোকে গড়ে তুলল। এসব কর্পোরেশন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জ্বালানী সংস্থা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থা পর্যন্ত সব ধরনের জ্বালানী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকে পরিণত হলো। কোন কোন কর্পোরেশন নির্মমতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থাগুলোকে দেউলিয়া করে ফেলল। এরপর এগুলোকে পানির দামে কিনে নিলো। আবার কোন কোন কর্পোরেশন ক্ষুদ্র ও স্বায়ত্তশাসিত সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জ্বালানী বাজারকে দখল করল।

এই ডামাডোলের অবকাশে পেট্রোলিয়ামের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা কমানোর নীতি ব্যর্থ হয়ে গেল। রেগান মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর কাছে গভীরভাবে ঋণী ছিলেন। বুশ সিনিয়র জ্বালানী ব্যবসার মাধ্যমেই কোটিপতি হয়েছিলেন। রেগান ও বুশ সিনিয়রের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন দু'টোর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয় জ্বালানী ব্যবসার সাথে, না হয় এর সাথে সম্পর্কিত প্রকৌশল ও নির্মাণ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসব ব্যবসার সাথে শুধু যে রিপাবলিকান পার্টির নেতৃবৃন্দ জড়িত ছিলেন তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দও এসব ব্যবসা থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

আইপিএস পরিবেশ সহায়ক জ্বালানী উৎপাদনের নীতিকে অব্যাহত রাখল। আমরা পাবলিক ইউটিলিটি রেগুলেটরি পলিসি অ্যাক্টের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করেছি। এই কঠোর পরিশ্রম আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছে। মাৎস্যন্যায়ের যুগে আইপিএস হাতে গোনা ক'টি ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থার মতো নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কর্পোরেটোক্রেসি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা যে এর অন্যতম প্রধান কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জ্বালানীখাতে যা ঘটছিল তা বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি মাত্র। সমাজকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে পরাস্ত হচ্ছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের বিকাশের উপরে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছিল। প্রথমে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যেই ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের উন্নয়নের শ্লোগানকে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। কমিউনিজমের পতনের পর এই শ্লোগানকে আর কাজে লাগানো হয়নি। বরঞ্চ পরে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পের চেয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প শ্রেয়তর এ কথাটা বোঝাতেই উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের বিকাশের শ্লোগান তোলা হয়েছিল। বিশ্ব ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে শিল্পগুলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে ছেড়ে দেওয়া, ব্যক্তিমালিকানাধীন সেবামূলক সংস্থাগুলোর বিকাশের উপরে গুরুত্বারোপ করতে লাগল। বলাবাহুল্য যে, এসব প্রচারণা উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালানো হলো।

এতে অর্থনৈতিক ঘাতক তত্ত্বকে গোটা বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা বিবিধ পর্যায়ের কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের নানা রকম দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করছে। এক সময় এসব দায়িত্ব পালনের ভার একটি বিশেষ শ্রেণীর কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের উপরে অর্পণ করা হতো। এখন নতুন অর্থনৈতিক ঘাতকেরা পুরো বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সবচেয়ে সস্তা শ্রম, সবচেয়ে সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ ও সবচেয়ে বড় বাজারকে খুঁজে বার করছে। তাদের কর্মকাণ্ড অতি নির্মম। নতুন যুগের অর্থনৈতিক ঘাতকেরা তাদের পূর্বসূরীদের অপকর্মকে অতি চমৎকার যুক্তি দিয়ে ঢাকতে সক্ষম হয়েছে। আমি যেমন ইন্দোনেশিয়ায়, পানামাতে ও কলম্বিয়ায় আমার কুকর্মগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলাম। আমাদের মতই এ যুগের অর্থনৈতিক ঘাতকেরা বিভিন্ন দেশকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত করতে পেরেছে। তারা অর্থনৈতিক প্রগতির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে ঋণজাল থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতগুলোকে বিকাশের নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজপথ নির্মাণ করেছে। টেলিফোন ও টেলিভিশন দান করেছে, সমাজকল্যাণমূলক সেবা দিয়েছে। এরপর যখন লাভের স্রোত শুকিয়ে গেছে তখন আরও সস্তা শ্রম, আরও সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ ও আরও বড় বাজারের খোঁজে অর্থনৈতিক ঘাতকেরা নতুন ঠিকানায় সরে পড়েছে। তারা যে দেশকে পেছনে ফেলে গেছে সেই দেশ হঠাৎ করে সুখ স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে চারপাশে সেই পুরোনো দারিদ্র্যের করাল ছায়াকেই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এই ভাঙাগড়ার খেলা কখনোই অর্থনৈতিক ঘাতকদের বিবেককে বিন্দুমাত্র পীড়া দেয়নি। এমনকি তারা এ কাজ করার সময় বিন্দুমাত্র দ্বিধাও অনুভব করেনি।

আমি মাঝে মধ্যে ভাবি যে, এ যুগের অর্থনৈতিক ঘাতকদের মনে এসব কুকর্ম কোন আলোড়ন কি কখনও তৈরি করেছে? তারা কি কখনও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহের শিকার হয়েছে? তারা কি কখনও একটি দূষিত খালের পানিতে পাশাপাশি এক বৃদ্ধকে

মলত্যাগ ও এক তরুণীকে গোসল করতে দেখেছে? কোন হাওয়ার্ড পার্কার কি তাদেরকে কোন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নি? তারা কি কখনোই আমার মতো মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়নি?

আমি আইপিএসের সাফল্য ও পারিবারিক সুখ উপভোগ করছিলাম। তারপরও মাঝে মধ্যে এক তীব্র মানসিক অবসাদ আমাকে আচমকা আচ্ছন্ন করে ফেলত। আমার ছোট্ট সোনা মেয়ে বেড়ে উঠছিল। আমি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্ক বোধ করতাম। আমি অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে যে সব কুকর্ম করেছি সেগুলোর পাপবোধ আমাকে নত করে ফেলতো।

অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমি এক অন্ধকার যুগকে দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস শহরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকেই বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সূচনা ঘটেছিল। বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই দু'টি সংস্থা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠনের কাজে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর সংস্থা দুটি দ্রুতগতিতে পুরো বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে গ্রহণ করল। এমনকি উন্নয়নশীল বিশ্বেও পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সকল অনগ্রসরতার মহৌষধ বলে প্রচার করা হলো। বলা হলো যে, এটি বিশ্বকে কমিউনিজমের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে।

এসব বিষয় আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে এই চিন্তা মাঝে মধ্যে আমাকে পেয়ে বসতো। আশির দশকের শেষভাগে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতন ঘটল তখন বোঝা গেল যে কমিউনিজমকে প্রতিহত করা পুঁজিবাদী প্রচারণার লক্ষ্য ছিল না। বরঞ্চ গোটা বিশ্বকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশ পরিণত করাই ছিল পুঁজিবাদী প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য। স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফোরামের প্রেসিডেন্ট জিম গ্যারিসনের ভাষায় ঃ

'সমষ্টিগতভাবে ধরতে গেলে সমগ্র বিশ্বের ঐক্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার পুঁজিবাদের কাল্পনিক গুণাবলীর ভিত্তিতে গঠিত বৈশ্বিক একতা, প্রকৃত অর্থে বিশ্ব সাম্রাজ্যকেই বোঝায়। বিশ্বের কোন দেশেই বিশ্বায়নের অপ্রতিহত গতিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়নি। এখন পর্যন্ত কোন দেশেই বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের গঠনগত সমন্বয় সাধন ও শর্তযুক্ত উন্নয়নের ফাঁদকে এড়াতে পারেনি। এখনও কোন দেশের পক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সালিশকে এড়ান সম্ভব হয়নি। এসব আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হলেও এগুলোর কর্মকাণ্ডই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব সংস্থার নীতিমালাই আন্তর্জাতিক অর্থনীতির আইন-কানুনে পরিণত হয়েছে। কোন দেশকে আত্মসমর্পণের কারণে পুরস্কৃত করা হবে ও কোন দেশকে বিরোধিতার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে তাও এসব সংস্থাই নির্ধারণ করে।

বিশ্বায়নের ক্ষমতা এখন এতটাই শক্তিশালী যে আমাদের মৃত্যুর আগেই আমরা বিশ্বের সকল জাতীয় অর্থনীতিকে একটি একক আন্তর্জাতিক মুক্তবাজার অর্থনীতির মাঝে বিলুপ্ত হতে দেখব। তখনই বিশ্ব সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।'

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমি সব গোপন কাহিনী ফাঁস করার লক্ষ্যে একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। বইয়ের শিরোনাম ঠিক করলাম 'এক অর্থনৈতিক ঘাতকের বিবেক' তবে এই বই লেখার সিদ্ধান্তকে আমি নিজের মধ্যে গোপন রাখলাম না। এখনও আমি সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে লিখতে পারি না। বরঞ্চ আমার লেখা সম্পর্কে আমি অন্যদের সাথে আলোচনা করতে উৎসাহ বোধ করি। এতে আমি অনুপ্রাণিত হই। ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অতীতের ঘটনাগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করি। বিভিন্ন সময়ে আমি তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাদেরকে আমার লেখার বিভিন্ন অংশ পড়ে শোনাই। এটা যে চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি পদ্ধতি তা আমি বুঝি। কিন্তু এই পদ্ধতিকে অবলম্বন না করলে আমার পক্ষে একটি শব্দও লেখা সম্ভব নয়। তাই আমি যে মেইনে আমার চাকরি জীবন সম্পর্কে বই লিখছি এ কথাটি অনেকেই জানতে পেরেছিল।

১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের এক বিকালে মেইনের এক প্রাক্তন অংশীদার আমাকে ফোন করলেন। তিনি আমাকে স্টোর অ্যান্ড ওয়েবস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কনসালট্যান্ট রূপে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন। এজন্য আমাকে অত্যন্ত লাভজনক অংকের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। সে সময় সংস্থাটি ছিল বিশ্বসেরা প্রকৌশল ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক জ্বালানী শিল্প খাতে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল তাকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি এইখাতে ঢুকতে চাইছিল। এজন্য সংস্থাটি এক সহযোগী সংস্থাকে গড়ে তুলেছিল। এই সহযোগী সংস্থাটি আইপিএসের মতই বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানী তৈরির কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। আমাকে এই সহযোগী সংস্থাতে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে হবে। সংস্থাটির কোন আন্তর্জাতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাকে অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন করতে হবে না জেনে আমি খুশি হলাম।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী আমাকে জানালেন যে, আমাকে তেমন করে কোন কাজ করতে হবে না। আমি হচ্ছি হাতে গোনা ক'জন উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন যে একটি ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে একে সফলভাবে পরিচালনা করছে। সেই সাথে এ খাতে আমার যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সুনামকে কাজে লাগানোর জন্য আমাকে উপদেষ্টাদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা। এ ধরনের পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে বৈধ ও স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। আমি নানা কারণে আইপিএসকে বিক্রি করার কথা ভাবছিলাম। তাই স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের প্রস্তাবটি আমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। সেই সাথে পারিশ্রমিকের অংকটিও ছিল অত্যন্ত লোভনীয়।

যেদিন আমি স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারে যোগ দিলাম সেদিন সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী

কর্মকর্তা আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য দাওয়াত করলেন। কতক্ষণ আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার সত্তার একটি অংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জগতে ফিরে যেতে চাইছে। এটি একটি জ্বালানী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো জটিল কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছে। একটি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের সময় শতাধিক কর্মীকে পরিচালনা করার মতো কষ্টসাধ্য দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। একটি জ্বালানী সরবরাহ পদ্ধতিকে চালনা করার দায়দেনা মোকাবিলা থেকে রেহাই পেতে চাইছে। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের পারিশ্রমিককে কিভাবে ব্যয় করব সে রাস্তাও বার করে ফেলেছি। আমি এই অর্থ দিয়ে একটি লাভহীন সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করব।

মিষ্টি খাবার সময় আমাকে নিমন্ত্রণকারী সে সময় আমার যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটির কথা তুললেন। বইটির শিরোনাম ছিল "চাপমুক্ত জীবন" তিনি বললেন, "আমি বইটির অনেক সুনাম অনেকের মুখে শুনেছি।" এরপর সরাসরিভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি নতুন বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?"

আমার তলপেটে চাপ পড়ল। হঠাৎ করেই আমি প্রশ্নটির প্রকৃত অর্থকে বুঝতে পারলাম। আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করেই জবাব দিলাম, "এ মুহূর্তে বই লেখার কোন ইচ্ছা আমার নেই।"

তিনি বললেন, "কথাটা শুনে খুশি হলাম। মেইনের মতই আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডের গোপনীয়তা রক্ষা করি।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি।"

তিনি বলে চললেন, "ঠিক বলেছেন, তবে আপনার কোন বইয়ে স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের নাম উল্লেখ করতে পারবেন না। আপনি এই সংস্থার বা মেইনে কাজ করার সময় যে সব দায়িত্ব পালন করেছেন বা করবেন সেগুলো সম্পর্কে কোন কথা লিখতে পারবেন না। এমনকি আপনার কোন লেখায় রাজনৈতিক বিষয়, আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেন ও উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না। এগুলো পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" বলেই আমার দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, "অবশ্যই, এসব কথা আপনার না বললেও চলতো।" কথাটি বলার সময় এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃদস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর পরপরই অতি পুরোনো একটি অনুভূতি ফিরে এলো আমার মনে। ইন্দোনেশিয়ায় হাওয়ার্ড পার্কারের সাথে বাহাস করার সময়, পানামা সিটিতে ফিদেলের গাড়িতে বসে ও কলম্বিয়ার কফি শপে বসে পলার সাথে কফি পান করার ফলে আমার মনে হয় একই অনুভূতি ভর করেছিল। আমি আবার নিজেকে বিক্রি করছি। আইনের চোখে এটি ঘুষ নয়। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় ও আমার সম্মতিতে আমার নাম সংস্থাটির উপদেষ্টাদের তালিকায় ব্যবহার করবে। কখনও সংস্থাটি আমার কাছে পরামর্শ

চাইবে। কখনও বা সংস্থাটির আমন্ত্রণে আমাকে কোন বৈঠকে যোগ দিতে হবে। কিন্তু আমাকে নিয়োগ করার আসল কারণটি আমি বুঝতে পেরেছি।

তিনি আমার জন্য একজন কার্য নির্বাহী কর্মকর্তার বেতনের সমান পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেন।

সেদিন বিকেলে আমি বিমানবন্দরে বসে ফ্লোরিডাগামী বিমানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার দেহমন তখন পুরোপুরি ভাবে অসাড়। নিজেকে আমার একজন বেশ্যার মতো মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, আমি নিজের মেয়ের সাথে নিজের পরিবারের সাথে ও নিজ দেশের সাথে বেঈমানী করছি। তারপরও আমি নিজেকে বোঝালাম যে, আমার সামনে এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। যদি আমি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতাম তাহলে আমার চারপাশ থেকে একের পর এক বিপদ এসে ঘিরে ধরতো।

অধ্যায়-৩০
পানামাতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান

ওমর তোরিজোর মৃত্যুর পরেও আমার হৃদয়ে পানামা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। দক্ষিণ ফ্লোরিডায় বসবাসের কারণে আমি মধ্য আমেরিকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম। ওমর তোরিজোর নীতি তখনও বহাল ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নের ভার যারা বহন করছিলেন তাদের কেউই ওমর তোরিজোর মতো শক্তিশালী চরিত্র ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। ওমর তোরিজোর মৃত্যুর পরেও আঞ্চলিক বিবাদ মেটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। সেই সাথে নতুন প্রণালী চুক্তিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানামা যুক্তরাষ্ট্রের উপরে কূটনৈতিক চাপ বজায় রেখেছিল।

ওমর তোরিজোর উত্তরসূরী জেনারেল ম্যানুয়েল নরিয়েগা শুরুতে একনিষ্ঠভাবে ওমর তোরিজোর নীতিমালাকে অনুসরণ করছিলেন। আমি কখনই ব্যক্তিগতভাবে নরিয়েগার সাথে পরিচিত হইনি। কিন্তু নিজ শাসনামলের গোড়ার দিকে তিনি পানামার দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছিলেন। ওমর তোরিজোর মতো নরিয়েগাও জাপানের আর্থিক অনুদানে ও কারিগরী সহযোগিতায় পানামাতে নতুন যোজক প্রণালী খননের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাকে মার্কিন সরকার ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর তীব্র বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। নরিয়েগা তার আত্মজীবনিতে লিখেছেন ঃ

"যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ ছিলেন বহুজাতিক নির্মাণ সংস্থা বেখটেলের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পানামাতে নতুন যোজক প্রণালী খননের কর্মকাণ্ড থেকে শত কোটি ডলারের মুনাফা অর্জনই ছিল বেখটেলের প্রধান লক্ষ্য। রেগান ও বুশ প্রশাসনগুলো নতুন যোজক প্রণালী খননের কর্মকাণ্ডে জাপানের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিহত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার কাল্পনিক ভয় অবশ্যই মার্কিন সরকারকে প্রভাবিত করেছিল। এর চেয়েও বড় কারণ ছিল জাপানের কাছে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হওয়ার বাস্তব আতঙ্ক। তবে বেখটেলের সম্ভাব্য লোকসানই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ।"

কিন্তু নরিয়েগা ওমর তোরিজো ছিলেন না। নরিয়েগার মাঝে ওমর তোরিজোর ব্যক্তিগত

সততা ও সম্মোহনী শক্তি ছিল না। বরঞ্চ ধীরে ধীরে নরিয়েগা জড়িয়ে পড়েছিলেন দুর্নীতি ও মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের সাথে। এমনকি তার বিরুদ্ধে তার প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হুগো স্পাদাফোরাকে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।

পানামার সামরিক বাহিনীর জি-২ ইউনিটের কর্নেল রূপে নরিয়েগা তার সামরিক সুখ্যাতি গড়ে তুলেছিলেন। এই ইউনিটটি ছিল পানামার সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী। এর সাথে সিআইএ'র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এ কারণেই সিআইএ'র তৎকালীন পরিচালক উইলয়াম জে, কেসির সাথে নরিয়েগোর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সুসম্পার্কের কারণেই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সিআইএ'র নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে রেগান প্রশাসন যখন গ্রেনাডায় মার্কিন সামরিক অভিযান পরিচালনা করার পূর্বাভাস কিউবায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, তখন সিআইএ এ কাজে নরিয়েগাকে বিশেষ দূত রূপে ব্যবহার করেছিল। নরিয়েগার সক্রিয় সহযোগিতার কারণেই সিআইএ দক্ষিণ আমেরিকার মাদকদ্রব্য পাচারকারী চক্রগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। আর এ থেকেই উদ্ভব ঘটেছিল কন্ট্রাগেট কেলেঙ্কারির।

১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে নরিয়েগা চার তারকা বিশিষ্ট জেনারেল পদে নিজেকে পদোন্নতি দিলেন। সেই সাথে তিনি একই সাথে নিজের মাথায় পানামার সেনাবাহিনীর প্রধান, দেশটির সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রেসিডেন্ট পদগুলোর টুপিগুলো চাপালেন। এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পরই সিআইএ'র পরিচালক উইলিয়াম কেসি পানামা বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন। বিমান থেকে নামার পর কেসির প্রথম কথাই ছিল, "আমার ছেলে নরিয়েগা কোথায়?" নরিয়েগা তার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটনে যাওয়ার পর পরই কেসির বাড়িতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন। বহু বছর পর নরিয়েগা স্বীকার করেছিলেন যে, কেসির সাথে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক থাকার কারণে তিনি নিজেকে অপরাজেয় মনে করতেন। নরিয়েগা মনে করতেন যে, জি-২ ইউনিটের মতই সিআইএ হচ্ছে মার্কিন সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। তিনি ভেবেছিলেন যে, পানামা যোজক প্রণালী সম্পর্কিত নতুন চুক্তির বাস্তবায়ন ও যোজক প্রণালী এলাকা থেকে মার্কিন সামরিক ঘাটিগুলোকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে তার দৃঢ় ভূমিকা সত্ত্বেও কেসি তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নরিয়েগা সিআইএ'র স্বরূপকে চিনতে ভুল করেছিলেন।

ওমর তোরিজো ছিলেন ন্যায়বিচার ও সাম্যের এক আন্তর্জাতিক প্রতীক। অন্যদিকে নরিয়েগা দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের এক আন্তর্জাতিক প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে নরিয়েগার কুখ্যাতি চরমে পৌঁছেছিল ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুনে। এদিনে *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম ছিল "পানামার লৌহমানব মাদকদ্রব্য ও অর্থ পাচারের ব্যবসার সাথে জড়িত।" প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী এক মার্কিন সাংবাদিক। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হলো যে, জেনারেল নরিয়েগা আমেরিকান অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত পাচারকারী চক্র মেডেলিন কার্টেলের একজন প্রভাবশালী সদস্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা উভয় দেশের পক্ষেই গোয়েন্দাগিরি করছেন। তার নির্দেশেই জি-২ ইউনিটের গুপ্তঘাতকেরা হুগো স্পাদাফোরার শিরচ্ছেদ করেছে। তিনি

ব্যক্তিগতভাবে পানামার পাচারকারী চক্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।" প্রতিবেদনের শুরুতে নরিয়েগার একটি ভয়ঙ্কর ছবি ছাপানো হলো। পরদিন প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে তার কুকীর্তিগুলোর আরও বিবরণ প্রকাশিত হলো।

নরিয়েগার সমস্যাগুলো জটিল করে তুলেছিল সে সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের একঘেয়ে সুরে অভিযোগ করার বদভ্যাসটি। তাই মার্কিন সাংবাদিকরা তাকে উপাধি দিয়েছিল 'ছিঁচকাদুনে বুশ' বলে। যখন নরিয়েগা পানামাতে স্কুল অব দ্য আমেরিকাজের অবস্থানের মেয়াদকে ১৫ বছর বাড়াতে মোটেও রাজি হলেন না, তখন বুশ সিনিয়রের নাকিসুরে কান্নাকাটি শতগুণে বেড়ে গেল। নরিয়েগার আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ঃ

"ওমর তোরিজোর নীতিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জাতি হিসেবে আমরা ছিলাম গর্বিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এসব বৈশিষ্ট্যকে সহ্য করতে মোটেও রাজি ছিল না। স্কুল অব দ্য আমেরিকাজের অবস্থান চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ওয়াশিংটন আমাদের উপরে চাপ দিয়েছিল। মার্কিন সরকারের ভাষ্য বাড়ানোর জন্য ওয়াশিংটন আমাদের উপরে চাপ দিয়েছিল। মার্কিন সরকারের ভাষ্য ছিল যে, মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রস্তুতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পানামার মাটিতে এহেন একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর। ডানপন্থী সামরিক গুপ্ত ঘাতকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আমাদের দেশে অবস্থান করবে এটা আমাদের কাম্য ছিল না।"

বিশ্বের কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও যখন ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র পানামাতে সামরিক অভিযান চালাল, তখন গোটা বিশ্ব হতভম্ব হয়ে পড়ল। এই সামরিক অভিযানটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন শহরের উপরে চালান সবচেয়ে বড় বিমান আক্রমণ। সেই সাথে এটি ছিল এক নিরীহ বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপরে বিনা কারণে আক্রমণ করা। পানামা ও এর জনগণ যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় নি। তাই গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারগুলো ও সংবাদ মাধ্যমগুলো এই অভিযানকে আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনরূপে তীব্র নিন্দা করল।

যদি কোন গণহত্যাকারী বা অন্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কোন সরকার, যেমন পিনোশের চিলি, স্ট্রোয়েসনারের প্যারাগুয়ে, সমোজার নিকারাগুয়া, ডি অবুইশোর এল সালভাদর বা সাদ্দামের ইরাকের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হতো তাহলে হয়তোবা বিশ্ব এটাকে মেনে নিতে পারত। কিন্তু নরিয়েগারর পানামাকে এই শ্রেণীতে কখনই অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। দেশটির একমাত্র অপরাধ ছিল মার্কিন সরকার ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর স্বার্থকে উপেক্ষা করা। পানামা চেয়েছিল যে, মার্কিন সরকার যেন নতুন যোজক প্রণালী চুক্তিকে মেনে নেয়। পানামার সরকার সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর সাথে দেশটির দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছিল। সেই সাথে জাপানের আর্থিক অনুদানে ও কারিগরী সহযোগিতায় নতুন যোজক প্রণালী খননের

উদ্যোগ নিয়েছিল। এর ফলাফল হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

নরিয়েগা তার আত্মজীবনীতে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেনঃ

"আমি একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র পানামাকে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল করার যে প্রচারণা শুরু করেছিল তা ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে পানামাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। পানামা যোজক প্রণালীতে জাপানের সহায়তায় পানামার সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বানচাল করাই ছিল এই অভিযান পরিচালনা করার একমাত্র কারণ। শুলজ ও ওয়েনবার্গার মার্কিন জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের ভূমিকা পালন করলেও আদতে তারা মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থের আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু মার্কিন জনগণ কখনোই এ বিষয়টি বুঝতে পারে নি। তাই মার্কিন সরকার বিনা বাধায় আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে।"

পানামাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সব যুক্তি উপস্থাপন করেছিল সেগুলোর সবক'টিই মাত্র একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র তার যুব সম্প্রদায়কে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে পানামায় পাঠিয়েছিল। সেখানে মার্কিন সৈন্যরা নিরীহ বেসামরিক জনগণকে হত্যা করেছে যাদের অধিকাংশই ছিল বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। মার্কিন বিমানগুলোর ভয়াবহ আক্রমণে পানামা নগরীর একটি বড় অংশ আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল। এসবের একমাত্র কারণ ছিলেন নরিয়েগা। মার্কিন সরকার তাকে ইবলিশ, জনগণের শত্রু ও মাদকদ্রব্য পাচারকারী দানব রূপে আখ্যায়িত করেছিল। তাকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই ২০ লাখ জনসংখ্যার একটি দেশে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে আরেকটি কারণও ছিল। পানামা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান ভূখণ্ড। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কখনই এ কারণটির কথা প্রকাশে উচ্চারণ করেনি।

এই অভিযানের কারণে আমি দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদে ভুগেছি। আমি জানতাম যে, নরিয়েগার এক বিশাল দেহরক্ষী বাহিনী রয়েছে। কিন্তু তারপরও আমাদের মনে হচ্ছিল যে, শৃগাল বাহিনী রোলদো ও ওমর তোরিজোর মতো নরিয়েগাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। খুব সম্ভবত নরিয়েগার দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে তারা ঘুষ খেয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। নতুবা তারাই নরিয়েগাকে ক্ষমতা ও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে।

এই অভিযান সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারছিলাম সেগুলো থেকে একটি কথাই আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলাম। যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্য গঠনের পুরোনো পন্থাতেই ফিরে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রেগান প্রশাসনের চেয়ে বুশ প্রশাসনের মনোভাব আরও কঠোর। বুশ প্রশাসন নিজের লক্ষ্যকে হাসিল করার জন্য সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করবে না। পানামাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল দু'টি। এক. দেশটিতে ওমর তোরিজোর নীতিমালার বাস্তবায়ন বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি

পুতুল সরকারকে গদীতে বসান। দুই. ইরাকের মত বেয়াড়া দেশগুলোকে প্রচ্ছন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া। প্রথম লক্ষ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যটিকে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে অর্জন করতে পারে নি।

নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের একজন বিভাগীয় সম্পাদক ও বেশ কয়েকটি বইয়ের লেখক ডেভিড হ্যারিস এক চমকপ্রদ ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন। ২০০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত *চাঁদকে আঘাত করা* বইয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বহু স্বৈরশাসক, রাজা, লৌহমানব, সামরিক শাসক ও যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে কাজ করেছে। কিন্তু জেনারেল ম্যানুয়েল আন্তোনিও নরিয়েগা হচ্ছেন এই শ্রেণীর একমাত্র শাসক যাকে যুক্তরাষ্ট্র নির্মমতম ভাবে শাস্তি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ২২৫ বছরের ইতিহাসে মাত্র একবার মার্কিন সামরিক বাহিনী অন্যদেশে অভিযান চালিয়ে সে দেশের শাসককে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, গ্রেফতারকৃত রাষ্ট্রনায়কটি নিজের দেশের যে এলাকাটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত সেই এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের আইনকে লঙ্ঘন করেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের বিচার অনুষ্ঠিত হবে।"

বিমান আক্রমণের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। তখন মনে হয়েছিল যে, গোটা ব্যাপারটিই ওয়াশিংটনকে বেকায়দায় ফেলবে। সেই সময় বুশ প্রশাসন নাকি সুরে কান্নাকাটি করার ইমেজকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু সামরিক অভিযানের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে গোটা বিশ্বে তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। অনেক মহলই যুক্তরাষ্ট্রকে আগ্রাসী শক্তি রূপে আখ্যায়িত করেছিল। টানা তিন দিন মার্কিন সামরিক বাহিনী পানামা নগরীর বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে সংবাদ মাধ্যম, রেডক্রস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেয়নি। এ সময় মার্কিন সৈন্যগণ মৃতদেহগুলোকে আগুনে পুড়িয়েছে, অথবা গণকবর দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো কী পরিমাণ সামরিক অপরাধের সাফল্য প্রমাণকে ধ্বংস করা হয়েছে ও কতজন নিরীহ বেসামরিক ব্যক্তি, সঠিক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে সেই প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু মার্কিন সরকার কখনোই এসব প্রশ্নের জবাব দেয়নি।

এই অভিযানের সকল তথ্য ও এতে মৃতদের সঠিক সংখ্যা কখনোই জানা যাবে না। তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড চেনি এই অভিযানে পাঁচ থেকে ছয়শ' লোকের মৃত্যু ঘটনার কথা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাব মাফিক তিন থেকে পাঁচ হাজার এই অভিযানের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিল। ২৫ হাজার লোক সর্বস্বান্ত হয়েছিল। নরিয়েগাকে গ্রেফতার করে মায়ামিতে আনা হয়েছিল। দীর্ঘ বিচারের পর তাকে ৪০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। তিনিই ছিলেন এই অভিযানের একমাত্র যুদ্ধবন্দী।

আন্তর্জাতিক আইনের এই জঘন্য লঙ্ঘনে গোটা বিশ্ব চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিশ্বের

সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর হাতে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশের এহেন শোচনীয় পরিণতি উন্নয়নশীল বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলা। কিন্তু খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এ সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এই অভিযান ও এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি ভাবে উদাসীন ছিল। এ জন্য অনেকগুলো কারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এগুলোর মধ্যে প্রধানতম ছিল মার্কিন সরকারের নীতি। হোয়াইট হাউজ থেকে সংবাদ মাধ্যমগুলোর মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছিল। সেই সাথে মার্কিন সরকার মার্কিন কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্যদের মন জয় করেছিল। তাই সংবাদ মাধ্যম ও কংগ্রেস মার্কিন সরকারকে এক্ষেত্রে কোন রকম চাপ দেয় নি।

এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন রিপোর্টার ও *নিউজ ডে* সাময়িকীর সম্পাদক পিটার এইজনার। তিনি সামরিক অভিযানের সময় পানামাতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এই অভিযানকে নানারকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে তার লেখা আমেরিকার বন্দী ঃ *ম্যানুয়েল নরিয়েগার স্মৃতিকথা* বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ইজনার লিখেছেন ঃ

"নরিয়েগাকে উৎখাতের নামে অনেক মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। অনেক ধ্বংস, হত্যা ও অবিচার করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড আমেরিকান গণতন্ত্রের মূল আদর্শগুলোর প্রতি হুমকি বয়ে এনেছে। এক নৃশংস ও দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসকের কবল থেকে পানামাকে রক্ষার নামে মার্কিন সৈন্যদের ঢালাওভাবে ধ্বংস ও হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর অভিযান শুরু হওয়া মাত্র পুরো যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন সৈন্যদের কর্মকাণ্ডকে অন্ধভাবে সমর্থন করেছে।"

মিয়ামির কারাগারে নরিয়েগার সাক্ষাৎকার নেওয়াসহ দীর্ঘকাল গবেষণা চালানোর পর এইজনার লিখেছেন ঃ

"গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিক থেকে বিচার করলে নরিয়েগাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মতো সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল বলে আমি মনে করি না। একজন বিদেশী সমরনায়ক বা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান রূপে তার কর্মকাণ্ড কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করে নি। এমনকি পানামাতে সামরিক অভিযান চালানোর যে সব অজুহাত ওয়াশিংটন দাঁড় করেছিল সেগুলোও পুরোপুরিভাবে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।"

সবশেষে এইজনার এভাবে উপসংহার টেনেছেন ঃ

"পানামা অভিযানের আগে ও পরে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পানামাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান পরিচালনা করার ঘটনাটি ছিল বিশ্বসেরা পরাশক্তির জন্য নিজ ক্ষমতাকে চরমভাবে অপব্যবহার করা। এই অভিযান ক্ষমতান্ধ মার্কিন রাজনীতিবিদ ও তাদের পানামানিয়ান মিত্রদের লক্ষ্যকে হাসিল করেছে। মাঝ থেকে পানামার নিরীহ নাগরিকদের রক্ত ঝরেছে।"

কলম্বিয়া থেকে পানামাকে কেটে বার করার দীর্ঘদিন যে আরিয়া পরিবার পানামাকে শাসন করেছিল, সেই আরিয়া পরিবারকে হটিয়ে ওমর তোরিজো ক্ষমতা দখল করেছিলেন। অভিযানের পর সেই আরিয়া পরিবারকে আবারো পানামার ক্ষমতায় বসানো হলো। সেখানে আবারও পানামার ডানপন্থী মহলটি দেশটির সকল খাতকে কুক্ষিগত করল। নতুন পানামা যোজক প্রণালী চুক্তি স্রেফ কাগজে-কলমে টিকে রইল। বাস্তবে প্রণালীটির নিয়ন্ত্রণ ভার ফিরে গেল যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই।

এসব ঘটনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমি নিজেকে একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। মেইনে চাকরি করার অভিজ্ঞতা থেকেই এসব প্রশ্নের জন্ম ঘটেছিল। লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার সময় নীতিনির্ধারকগণ কি ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হন, না সৎ কাজ করার সদিচ্ছা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে? আমাদের সরকারের ক'জন শীর্ষ কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দেশপ্রেমের পরিবর্তে ব্যক্তিগত লোভ দ্বারা পরিচালিত হন?

স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও পানামা অভিযানের বিরুদ্ধে কিছু না করতে পারার মানসিক হতাশা আমাকে আবারও কলম তুলে নিতে বাধ্য করল। এবার আমি ওমর তোরিজো সম্পর্কে লিখতে শুরু করলাম। নিজের অপরাধবোধকে প্রশমিত করার পাশাপাশি যেসব অন্যায় গোটা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করেছে সেগুলোর স্বরূপকে উন্মোচন করাই ছিল আমার লক্ষ্য। এবার আমি পুরো ব্যাপারটিকেই গোপন রাখলাম। কেননা, বই লেখার কাজ আবারও শুরু করেছি এ কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই আমি চাপের শিকার হব।

বই লেখার কাজ যত এগোয় ততই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ঘাতকেরা যেসব সাফল্য অর্জন করেছি সেগুলোর পরিমাণ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি শুরুতে আমার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রগুলোকে বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন লেখার পরিধি বাড়তে লাগলো তখন আমি যেসব দেশের সর্বনাশ করেছি সেসব দেশের তালিকা দেখে রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। আমি নিজের দুর্নীতির বহর দেখে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি বহুবার মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছি। কিন্তু যখন একজন অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে কাজ করছিলাম, তখন নিজের কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, আমার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ফলাফলকে অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই ইন্দোনেশিয়ায় আমি হাওয়ার্ড পার্কারের নির্মম সত্য ভাষণের কারণে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছি। পানামার বস্তিতে যোজক প্রণালী এলাকার ও ডিস্কো ক্লাবে যা দেখেছি তা আমাকে আলোড়িত করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় রাসির বন্ধুদের সাথে এবং ইরানে ইয়ামিন ও ডকের সাথে আমার আলোচনাগুলো আমাকে দীর্ঘদিন তাড়া করেছে। কিন্তু বই লিখতে বসে আমি এসব ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। নিজের অতীত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ফলাফলকে সাদা চোখে দেখতে পেয়েছি।

এসব কথাকে বুঝতে পারা যতটা সহজ এগুলোকে বলতে পারাটা আরও সহজ। কিন্তু এসব কথার পটভূমিকা অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমার কাছে নিজেকে একজন সৈনিক বলে

মনে হয়। শুরুতে একজন সৈনিক সহজ-সরল থাকে। সে হয়তোবা শুরুতে অন্যদের হত্যা করার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। তবে শুরুতে সে টিকে থাকার, নিজের ভয়কে জয় করার কাজেই ব্যস্ত থাকে বেশী। নিজের হাতে নিজের প্রথম শত্রুকে হত্যা করার পর সে মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়। সে মৃত অসহায় পরিবারের কথা চিন্তা করে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। কিন্তু সময় যত গড়ায় সে ততবেশী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, তত বেশী শত্রু হত্যা করে, তত বেশী মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করে। এভাবেই সে একজন পেশাদার সৈনিকে পরিণত হয়।

এভাবেই আমিও একদিন একজন পেশাদার অর্থনৈতিক ঘাতকে পরিণত হয়েছিলাম। এ কথাটি স্বীকার করে নেওয়া মাত্র আমি নিজের অপরাধগুলোর প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পারলাম। আমি প্রকৃত অর্থে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন পেশাদার সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছি মাত্র। যুগে যুগে বহু ব্যক্তি এভাবেই নির্বিকার চিত্তে বহু জঘন্যতম অপরাধে অংশগ্রহণ করেছে। সুখী ও নিরাপদ পারিবারিক জীবনযাপনকারী ইরানীরা শাহের গোপন পুলিশ বাহিনী সাভাকে চাকরি করেছে। একই শ্রেণীর জার্মানরা হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীতে কাজ করেছে। একই ধরনের মার্কিন নাগরিকরা এখন অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে দায়িত্ব পালন করছে।

একজন অর্থনৈতিক ঘাতক হিসেবে আমি কখনও এনএসএ সহ কোন মার্কিন রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে একটি পয়সাও পাইনি। এই দায়িত্ব পালনকালে আমি মেইনে চাকরি করেছি। মেইন আমাকে বেতন-ভাতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। এক কথায়, আমি ছিলাম এক ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকরি করা এক সাধারণ মার্কিন নাগরিক। কিন্তু এ যুগে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারাই প্রধান অর্থনৈতিক ঘাতকের দায়িত্ব পালন করছেন। এরা যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থাতে কাজ না করেও দেশটির মূল রাষ্ট্রীয় নীতিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পেশাদার সৈনিকের দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের এসব পেশাদার সৈনিক নিজেদের কর্মকান্ডের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

আমি লিখলাম ঃ

"আজ মার্কিন নাগরিকগণ কাজ পাওয়ার জন্য উম্মুখ। শ্রমিকদের খোঁজে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, বোতসোয়ানা, বলিভিয়াসহ বিশ্বের সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়ছেন। এসব মার্কিন নাগরিকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোকে শোষণ করা। এসব জনগোষ্ঠী ঘিঞ্জি বস্তিগুলোতে বাস করে। ক্ষুধা ও দারিদ্র এদের নিত্য সহচর। এদের শিশুরা জন্ম থেকেই অপুষ্টির শিকার। এরা স্বচ্ছল জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে না। বরঞ্চ প্রতিনিয়ত এরা নিজ জীবনকে টিকিয়ে রাখার কঠোর সংগ্রামে ব্যস্ত। এদেরকে কাজে লাগানোর জন্য ম্যানহ্যাটন, সানফ্রান্সিসকো বা শিকাগোর বিলাসবহুল অফিসগুলো থেকে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর কার্য নির্বাহী কর্মকর্তারা বেরিয়ে এসে নামকরা বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলোর বিলাসবহুল বিমানে চড়েন। এরপর সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে হাজির হন এক দরিদ্র দেশে। দেশটির সেরা হোটেলের সেরা স্যুটটি তাদের

জন্য ভাড়া করা হয়। তারা দেশটির সেরা রেস্তোরায় পানাহার করেন। তারপর বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ে সুলভ শ্রমিকদের খোঁজে বের হন।

এ যুগের দাস ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করছে। তবে এখন আর তাদেরকে শার্লটিন, হাভানা ও কার্তাগেনার দাস বাজারগুলোতে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য আফ্রিকার গহীন অরণ্য থেকে সুস্বাস্থ্যবান দাসদাসীদের ধরে আনতে হয় না। বরঞ্চ এ যুগের দাস ব্যবসায়ীরা দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোকে সুলভতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া করে। এরপর এদেরকে নানারকম কারখানার শ্রমিক পদে নিয়োগ করা হয়। এসব কারখানার জ্যাকেট, ব্লু জিন্স, টেনিস জুতা, অটোমোবাইল পার্টস, কম্পিউটার কম্পোনেন্টস সহ নানা রকম পণ্য তৈরি হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক স্থানীয় ব্যবসায়ীকে এসব কারখানার মালিক বানানো হয়।

বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর কার্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিজেদের সৎ ব্যবসায়ী বলে মনে করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ক্ষেত্রে তারা নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত সুন্দর স্থানগুলোর ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর চমৎকার সব ছবি দেখায়। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে পরস্পরের সাফল্যের জয়গান গায়। বহুদূরের দেশগুলোর বিচিত্র সংস্কৃতিগুলোকে সফলভাবে মোকাবিলা করার উপদেশগুলোকে বয়ান করে। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর মালিক পক্ষগণ যেসব আইনজীবীদের নিয়োগ করে সেসব আইনজীবী তাদের নিয়োগকর্তাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে আইনগত বৈধতা পাইয়ে দেয়। মনোবিজ্ঞানী ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ তাদেরকে বিশ্বের দরিদ্রতম ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলোকে কাজে লাগানোর পন্থাগুলোকে বাতলে দেয়।

অতীতের দাস ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করত না। সে যুগের দাস ব্যবসায়ীরা ভাবতো যে, ক্রীতদাসদের সভ্য জগতে নিয়োগের মাধ্যমে এদেরকে সভ্য মানুষে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। আসলে সে যুগের ক্রীতদাসরা ছিল সভ্য দেশগুলোর সামাজিক অবকাঠামোর মূল ভিত্তি। ক্রীতদাসদের ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর উপরে নির্ভর করেই সভ্য দেশগুলোর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

এ যুগের দাস ব্যবসায়ীদের মনোভাব পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক। তারা বেকার জনশক্তিকে প্রতিদিন কমপক্ষে এক মার্কিন ডলার আয়ের সুযোগ দিচ্ছে। সেই সাথে তারা উন্নয়নশীল বিশ্বকে মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবিধা দিচ্ছে। আসলে দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলো হচ্ছে ধনী দেশগুলোর ধনাঢ্যতম বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। এ যুগের দাসদের ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর উপরে নির্ভর করেই আধুনিক দাস মালিকদের বিলাসবহুল জীবন গড়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অনুন্নত বিশ্বের শ্রমিকদের সস্তা শ্রমের উপরে ভর করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অতএব, যে কোন মূল্যে যুগ-যুগান্তর ধরে এই সুলভ শ্রম প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।"

অধ্যায়-৩১
ইরাকে অর্থনৈতিক ঘাতকদের ব্যর্থতা

গত শতাব্দীর আশির দশক জুড়ে আমি ছিলাম আইপিএসের প্রেসিডেন্ট। আশির দশকের শেষভাগ থেকে নব্বুইয়ের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমি স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার কর্পোরেশনের কনসালট্যান্টের দায়িত্ব পালন করেছি। এই দু'টি পদ অধিকারের সুবাদে আমি ইরাক সম্পর্কে এমন সব তথ্য যোগাড় করতে পেরেছিলাম যা অনেকের কাছেই অজানা ছিল। গোটা আশির দশক জুড়ে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক ইরাক সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এদের চিরচেনা বিশ্বের মধ্যে ইরাকের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু দেশটিতে যা ঘটছিল তাতে আমি বিমোহিত হয়েছিলাম।

আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুবান্ধবেরা তখনও বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড ও আইএমএফ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থায় চাকরি করছিল। মেইনে আমার প্রাক্তন সহকর্মীরা তখনও বেখটেল ও হ্যালিবার্টনসহ বিবিধ বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিল। এমনকি আমার শ্বশুর তখনও বেখটেলের প্রধান স্থপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। আইপিএসের ঠিকাদার সংস্থার প্রকৌশলীরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিবিধ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছিল। এদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো মোতাবেক ইরাকে অর্থনৈতিক ঘাতকেরা দেশটিতে কব্জা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

রেগান ও বুশ প্রশাসনগুলো ইরাককে আরেকটি সৌদি আরব বানানোর জন্য একেবারে আদানুন খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন। সৌদি পরিবারের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সাদ্দাম হোসেন অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতেন। অর্থ পাচারের ঘটনা থেকে সৌদি আরব যেসব সুফলকে অর্জন করেছে সেগুলো সাদ্দামের সামনেই ছিল। মাত্র এক দশকের মধ্যেই সৌদি আরব এক আধুনিক দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশটির রাস্তাগুলো থেকে আবর্জনা চিবানো ছাগলের দল উধাও হয়ে আবর্জনা বহনকারী সুদৃশ্য ট্রাকের দল চরে বেড়াচ্ছে। পানির লবণাক্ততা শোধন, পয়নিষ্কাশন প্রণালী, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির আধুনিক প্রযুক্তি সৌদি আরবের চেহারাকেই পাল্টে দিয়েছে। এহেন দৃষ্টান্ত যে কোন রাষ্ট্রনায়ককে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক আইন পালনের ক্ষেত্রে সৌদি আরব যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তা সাদ্দাম

হোসেন জানতেন। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের অনেক কর্মকাণ্ডকে দেখেও না দেখার ভান করতো। রিয়াদ এমন সব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতো যেগুলোর কর্মকাণ্ডকে অনেকেই জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রূপে আখ্যায়িত করতেন। এমনকি সৌদি আরব নির্ভয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধী ও ফেরারী আসামীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করত। গোটা আশির দশক জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের কারণে সৌদি আরব আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওসামা বিন লাদেনকে আর্থিক অনুদান দিয়েছিল। রেগান ও বুশ প্রশাসনগুলোর চাপের কারণে প্রায় গোটা মুসলিম বিশ্ব কোন না কোনভাবে সে সময় আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করেছিল। আর এই সুবাদে লাদেনের জঙ্গিবাদী সংগঠন আল কায়েদা শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পেল।

গোটা আশির দশকজুড়ে ইরাকে অর্থনৈতিক ঘাতকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা সাদ্দাম হোসেনের উপরে সৌদি মডেলকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেছিল। একদিন সাদ্দাম এই মডেলকে অনুসরণ করবেন এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। আমিও এই বিশ্বাসের কবলে পড়েছিলাম। কেননা, সৌদি আরবের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করলে সাদ্দাম হোসেন আমৃত্যু ইরাককে শাসন করতে পারবেন। এমনকি তার মৃত্যুর পরও তার বংশধরেরা ইরাককে শাসন করার সুযোগ পাবে। সেই সাথে সাদ্দাম মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বলয়কে গড়ে তুলতে পারবেন। এ জন্যই ইরান-ইরাক যুদ্ধের প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে সাহায্য করেছিল।

সাদ্দাম হোসেন যে একজন ভয়াবহ স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি যে প্রায়শই ব্যাপক গণহত্যার মাধ্যমে তার কুশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা বিদ্রোহগুলোকে দমন করতেন এ কথাটি ওয়াশিংটনের অজানা ছিল না। তার নীতিগুলো যে অ্যাডলফ হিটলারের দুঃসহ স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিত এটা মার্কিন নীতিনির্ধারক মহল এক বাক্যে স্বীকার করতেন। যুক্তরাষ্ট্র এর আগে এ ধরনের বহু রাষ্ট্র নায়ককে সহ্য ও সমর্থন করেছে। মার্কিন সরকার সাদ্দাম হোসেনের শাসনকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করতে রাজি ছিল। বিনিময়ে সাদ্দামকে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানী সরবরাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার ও সৌদি মডেলকে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হতো। সৌদি মডেলকে অনুসরণ করা মানেই ইরাকী পেট্রো ডারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে এক আধুনিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পেতো। সেই সাথে ওয়াশিংটন বাগদাদের কাছে ট্যাংক ও জঙ্গি বিমান বিক্রি করত। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রাসায়নিক শিল্প ও টিকা তৈরির কারখানা নির্মাণ করত। বর্তমান যুগে এসব স্থাপনাতে পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব।

ইরাক আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমনকি বাইরে থেকে দেশটিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো দেশটি তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষ ইরাককে এর জ্বালানী সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত। কিন্তু ইরাক শুধুমাত্র জ্বালানী ভাণ্ডার নয়। বরঞ্চ দেশটি পানি সম্পদেও সমৃদ্ধ। সেই সাথে এটি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। দজলা ও ফোরাত নদী দু'টি ইরাকের মধ্য দিয়ে বয়ে

গেছে পারস্য উপসাগরে। তাই উষর ধূসর মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে একমাত্র ইরাকই মহামূল্যবান পানি সম্পদের অধিকারী। আশির দশকে ইরাকের পানি সম্পদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব জ্বালানী ও প্রকৌশল খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিল। বিরাষ্ট্রীকরণের জোয়ার যখন শুরু হলো তখন বৃহৎ জ্বালানী সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জ্বালানী সংস্থাগুলোকে কিনতে শুরু করল। সেই সাথে বৃহৎ জ্বালানী সংস্থাগুলো আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্যের পানি সম্পদকেও ক্রয়ের উদ্যোগ নিলো।

জ্বালানী ও পানির কথা বাদ দিলেও ইরাকের ভৌগোলিক অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির সাথে তুরস্ক, সিরিযা, জর্দান, সৌদি আরব, কুয়েত ও ইরানের সরাসরি সীমান্ত রয়েছে। সেই সাথে পারস্য উপসাগরের তীরে দেশটির উপকূলও রয়েছে। এছাড়াও খুবই কম সময়ের মধ্যে ইসরায়েল ও রাশিয়া থেকে ছোঁড়া মিসাইলগুলো ইরাকে আঘাত হানতে পারবে। সামরিক কৌশলবিদরা ইরাকের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের হাডসন নদী অববাহিকার তুলনা করেন প্রায়ই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের সময় প্রায়ই বলা হতো যে, হাডসন নদীর অববাহিকাকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সে যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এখন বলা হয় যে ইরাককে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সে মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইরাক ছিল মার্কিন প্রযুক্তি ও কারিগরী দক্ষতার এক সম্ভাব্য বাজার। ইরাক বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রফতানিকারী দেশ। তাই বাগদাদ নিজ ভৌত অবকাঠামোগুলো ও শিল্প খাতগুলোর উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন করতে পারত। তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থা, কম্পিউটার সিস্টেম, বিমান, মিসাইল ও ট্যাংক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতারা ইরাকের উপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইরাক কখনোই সৌদি মডেলকে অনুসরণ করতে রাজি হয়নি।

"আশির দশকের শেষভাগে অর্থনৈতিক ঘাতকেরা সৌদি মডেলকে অনুসরণ করার জন্য সাদ্দাম হোসেনকে রাজি করাতে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হলো। বুশ সিনিয়রের প্রশাসনের জন্য এটি ছিল চরম বিব্রতকর ও হতাশাজনক পরিস্থিতি। পানামার মতই ইরাকও জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশকে ছিচকাদুনে বানিয়ে ফেলল। বুশ সিনিয়র যখন এই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পথ খুঁজছেন, ঠিক তখনই সাদ্দাম হোসেন একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশ কুয়েতকে দখল করলেন। অমনি বুশ সিনিয়র আন্তর্জাতিক জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশ কুয়েতকে দখল করলেন। অমনি বুশ সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের দায়ে সাদ্দাম হোসেনকে তীব্র ভাবে অভিযুক্ত করলেন। অথচ মাত্র এক বছর আগে বুশ নিজেই অবৈধভাবে পানামাকে দখল করেছিলেন।"

বুশ সিনিয়র যখন ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তা কাউকেই

অবাক করল না। আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হিসেবে ৫ লাখ মার্কিন সৈন্যকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠান হলো। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে ইরাকের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনাগুলোতে ভয়াবহ বিমান আক্রমণ চালানো হলো। এরপর টানা একশ' ঘন্টাব্যাপী স্থল অভিযানের মাধ্যমে চরমভাবে দুর্বল ইরাকী সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করা হলো। কুয়েত ইরাকের কবল থেকে মুক্তি পেল। সাদ্দাম হোসেন শাস্তি পেলেন, তবে পুরোপুরি নয়। মার্কিন নাগরিকদের ৯০% লোকই বুশের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করল।

মার্কিন জঙ্গি বিমানগুলো যখন ইরাকে প্রথম বোমা বর্ষণ করল, তখন আমি বোস্টনে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করছিলাম। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার আমাকে হাতে গোনা যে ক'টি কাজ দিয়েছিল এগুলোর মধ্যে এই বৈঠক ছিল একটি। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করেছে এই খবরটি প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মার্কিন নাগরিকরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কর্মীরা বাঁধভাঙ্গা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। সাদ্দাম হোসেনের মতো নির্মম এক স্বৈরাচারী শাসকের পতন সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। বরঞ্চ ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় মানেই মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর সামনে বিপুল অংকের মুনাফা অর্জনের পথ তৈরি হওয়া। আর এ থেকেই এসব সংস্থার কর্মীরা পদোন্নতি পাবে। সেই সাথে তাদের বেতন-ভাতাও বাড়বে।

"সামরিক বিজয় থেকে যারা সরাসরি ভাবে লাভবান হবে শুধু মাত্র তাদের মধ্যেই বিজয় অর্জনের উল্লাস সীমাবদ্ধ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র কোন বড় যুদ্ধে বিজয়ী হোক এটা মনে প্রাণে সকল মার্কিন নাগরিকই কামনা করছিল। এই কামনার পেছনে যে অনেকগুলো নিয়ামক কাজ করছিল, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহই নেই। কার্টারকে নির্বাচনে পরাজিত কওে রেগান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক'দিন পরেই ইরানের প্রকৃত শাসক আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী মার্কিন জিম্মিদের মুক্তি দিলেন। এর পরপরই রেগান পানামা যোজক প্রণালীর দ্বিতীয় চুক্তি সম্পর্কে নতুন ভাবে আলোচনা শুরু করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এরপর বুশ সিনিয়র পানামা দখল করে নরিয়েগার পতন ঘটালেন। এসব ঘটনায় মার্কিন নাগরিকদের মনে যে আশার আগুন জ্বলে উঠেছিল একে জ্বালাল প্রথম ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়।,

"দেশপ্রেমের গরমা-গরম বক্তৃতা ও সামরিক অভিযানের উগ্র দাবির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থগুলোর সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো কাজ করছিল। সেই সাথে মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছিল। বিশ্ব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রায় গোটা যুক্তরাষ্ট্রই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিল। বিশ্বায়ন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের বিস্তার আমাদের চিন্তা চেতনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছিল।"

এই পরিবর্তনের ঢেউ শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই ভাসিয়ে নিয়েছিল তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ বিশ্ব সাম্রাজ্য বিশ্বের সকল রাজনৈতিক সীমান্তের ফাঁকফোকর গলে সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ছিল। এক সময় যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল শুধু মাত্র মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থা সেগুলো

বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থায় রূপান্তরিত হলো। এসব সংস্থা অনেকগুলোই বিভিন্ন দেশে বিবিধ নামে যৌথ সংস্থা গড়ে তুলেছে। এসব যৌথ সংস্থা রাজনৈতিক সুসম্পর্কের সুবাদে নিজ নিজ দেশের আইন-কানুনগুলোর মধ্যে যেগুলো সুবিধাজনক সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ড বজায় রাখে। সেই সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন-কানুন ও চুক্তিগুলো এসব সংস্থাগুলোর কাজকে আরও সহজ করে তুলেছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মতো শব্দগুলো এখন অচল। কর্পোরেটোক্রেসি এখন বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। গোটা বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব এখন অপরিসীম।

১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে আমি আইপিএস বিক্রির মাধ্যমে কর্পোরেটোক্রেসির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। এটি আমার ও আমার অংশীদারদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক ছিল। তবে আইপিএস ক্রয়ের জন্য অ্যাশল্যান্ড অয়েল কোম্পানী আমাদের উপরে প্রবল চাপ তৈরি করেছিল। অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে, এই চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বরঞ্চ সুকৌশলে দরদাম করে সুবিধাজনক দরে আইপিএস বিক্রি করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু সবকিছু চুকে যাবার পর নিজেকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হলো। কেননা, আমি নিজের হাতে গড়া বিকল্প জ্বালানী সংস্থাটিকে একটি পেট্রোলিয়াম সংস্থার কাছে বিক্রি করেছি। এরপর আইপিএস নিজের স্বাধীন সত্তাকে বজায় রাখতে পারবে না।

স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার আমার কাছে খুব কম সময়ই দাবি করত। মাঝে মধ্যে আমাকে কোন বৈঠকে অংশ নিতে বা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে বোস্টনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হতো। কখনও কখনও আমাকে রিও ডি জেনিরোর মতো স্থানে গিয়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে আলোচনা করতে হতো। একবার আমি একটি ব্যক্তিগত জেট বিমানে চড়ে গুয়াতেমালায় গিয়েছিলাম। প্রায়শই আমি প্রকল্প পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতাম। প্রায় কোন কাজ না করেই এত বিশাল অংকের পারিশ্রমিক নেওয়া আমার জন্য বিব্রতকর ছিল। আমি এই কাজটিকে খুব ভাল ভাবেই বুঝতাম বলে নিজ সংস্থার প্রয়োজন মেটাতে চাইতাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার সাহায্য নেওয়ার জন্য তেমন একটা উৎসাহী ছিল না।

দুই ভুবনের মাঝে ঝুলে থাকার ব্যাপারটি আমাকে তাড়া করে ফিরত। আমি এমন কিছু করতে চাইতাম যা আমার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সক্ষম। এমন কিছু করতে চাইতাম যা আমার এতদিনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করবে। এক অর্থনৈতিক ঘাতকের বিবেক বইটি লেখার কাজ আমি চালিয়ে নিচ্ছিলাম একেবারেই অনিয়মিতভাবে। কেননা, বইটি কোনদিনও ছাপা হবে এ কথাটি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে আমি ছোট ছোট পর্যটক দলকে আমাজানে নিয়ে যেতে শুরু করলাম। এসব পর্যটক দল শুয়ারদের সাথে সময় কাটাত। শুয়াররা বিদেশী পর্যটকদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও আদিবাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতি শেখাত। পরের কয়েক বছরে এ ধরনের পর্যটকের সংখ্যা শতগুণে বেড়ে গেল। ফলে, আমি ড্রিম চেঞ্জ কোয়ালিশন নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললাম। এই প্রতিষ্ঠানটি শিল্পোন্নত দেশগুলোর নাগরিকদের বাকি বিশ্বকে দেখাতে সক্ষম হলো। সেই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের

সম্পর্ককে বোঝাতে পারল। এভাবেই পুরো বিশ্বে ড্রিম চেঞ্জের সুখ্যাতি গড়ে উঠল। এ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ধরিত্রী দিবসে যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দিবসটির তাৎপর্য সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ড্রিম চেঞ্জ কোয়ালিশন ছিল একটি। টাইম সাময়িকী এই ১৩টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল।

নব্বুইয়ের দশকে অলাভজনক কর্মকাণ্ডের জগতে আমার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। আমি বেশ কয়েকটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্য হলাম। সেই সাথে আর কয়েকটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললাম। ড্রিম চেঞ্জের কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের উপরে ভিত্তি করে অনেকগুলো সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটল। এসব প্রতিষ্ঠান ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী যেমন আমাজানের শুয়ার ও আশুয়ার, আন্দিজের কোয়েশুয়া ও গুয়াতেমালার মায়াদের সাথে এসব গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করল। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকদের মাঝে আদিবাসী সংস্কৃতিগুলো সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিল। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার আমার এই বিশ্ব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন করল। এটা অবশ্য সংস্থাটির সমাজকল্যাণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমি এ সময় অনেকগুলো বই লিখলাম। এসব বইয়ে আমেরিকান অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ ছিল। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই এসব বইয়ে আমার অর্থনৈতিক ঘাতক জীবনকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। এসব কর্মকাণ্ড আমার কর্মহীন জীবনের একঘেয়েমির অবসান ঘটাল। সেই সাথে ল্যাটিন আমেরিকার সাথে আমার পুরোনো সম্পর্ক নতুন ভাবে গড়ে উঠল। এভাবেই অঞ্চলটির রাজনীতি সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল হতে পারলাম।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত হয়েও বিভিন্ন বিষয়ে বই লিখে আমি অতীতে যেসব পাপ করেছি সেগুলোকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার বিবেক এতে সায় দিত না। আমি বুঝতে পারতাম যে, আমি আমার মেয়ের প্রতি আমার দায়িত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছি। জেসিকা এমন একটি বিশ্বে জন্মেছে যে বিশ্বের অধিকাংশ শিশু যে ঋণকে পরিশোধ করতে পারবে না, সেই ঋণের বোঝা মাথার উপরে নিয়ে জন্মাচ্ছে। আর এ জন্য আমি কোন অংশেই কম অপরাধী নই।

আমার লেখা বইগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বিশেষ করে স্বপ্নের পৃথিবী বইটি অকল্পনীয় রকমের জনপ্রিয়তা অর্জন করল। বইটির সাফল্যের কারণে আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। কখনও কখনও বোস্টন নিউইয়র্ক বা মিলানে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের পরিহাসে বিচলিত হতাম। যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের পৃথিবী হয় তাহলে কেন আমি এক নষ্ট পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলাম? কেন আমি পৃথিবীকে নষ্ট করার ক্ষেত্রে এহেন ভয়াবহ ভূমিকা পালন করেছিলাম?

১৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে ওমেগা ইন্সটিটিউট ক্যারিবিয়ান সাগরের সেইন্ট জন দ্বীপে এক সপ্তাহব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি এই কর্মশালার একজন প্রশিক্ষক রূপে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। আমি এক গভীর রাতে সেইন্ট জন দ্বীপে পৌছালাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমি আমার হোটেল কক্ষের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অমনি আমার নজর পড়ল লেইনস্টার বে'র উপরে। ১৭ বছর আগে আমি এখানেই

মেইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঘটনাটির কথা মনে হওয়া মাত্র আমি কাছের বেতের চেয়ারটিতে বসে পড়লাম। এক তীব্র আবেগ আমার পুরো সত্তাকে গ্রাস করল।

পুরো সপ্তাহটির অবসর মুহূর্তগুলো আমার কাটল ওই বারান্দায় লেইনস্টার বে'র দিকে তাকিয়ে নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে। একটি বিষয় আমার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমি মেইনের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছি। কিন্তু তারপরও আমি কর্পোরেটোক্রেসির সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক ছেদ করি নি। ফলে, আমি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সপ্তাহ শেষে আমি চূড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি সেই পৃথিবীর সাথে আমার চারপাশের পৃথিবীর কোন মিল নেই। আমি এতদিন আমার শিক্ষার্থীদের যা বলেছি সেটাই এখন আমাকে পালন করতে হবে। আমার জীবনের দাবি মেটানোর জন্য আমার স্বপ্নকে পাল্টাতে হবে।

কর্মশালা শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আমি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর পরামর্শদাতার কাজ ছেড়ে দিলাম। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের যে প্রেসিডেন্ট আমাকে এ পদে নিয়োগ করেছিলেন তিনি কয়েকদিন আগেই অবসর নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি আমার অতীত কর্মজীবনের কাহিনী গোপন রাখলাম, না প্রকাশ করলাম, এব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। তিনি স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টারের ব্যয় সংকোচনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তাই আমার পদত্যাগ তাকে এক বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় থেকে বাঁচিয়ে দিলো।

দীর্ঘদিন ধরে আমি যে বইটি একটু একটু করে লিখছিলাম সেই বইটিকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সিদ্ধান্ত আমাকে পরম স্বস্তি দিলো। আমি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বান্ধবদের বইটির কথা জানালাম। এরা বেশীর ভাগই ল্যাটিন আমেরিকার আদিবাসী সংস্কৃতি ও আমাজান অরণ্যাঞ্চলকে সংরক্ষণের সাথে জড়িত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী। আমাকে হতবাক করে দিয়ে তারা বইটি সম্পর্কে তাদের আপত্তির কথা জানালো। তারা বলল যে, অর্থনৈতিক ঘাতক হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এ কথাটি ফাঁস হলে লেখক, বক্তা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা রূপে আমার বর্তমান জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ড্রিম চেঞ্জ কোয়ালিশন ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো আমাজন অরণ্যাঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলোর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করছে। আমার অতীত জীবনের কথা প্রকাশ হলে আদিবাসীদের কাছে ড্রিম চেঞ্জ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। কোন কোন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আমার সাথে সম্পর্ক ছেদের হুমকিও দিলো।

অতএব, আমি আবারও বইটি লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। এর বদলে আমি আবারও উন্নত বিশ্বের পর্যটকদের আমাজনের গহীন অরণ্যে নিয়ে যেতে লাগলাম। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এমন এক পরিবেশকে তুলে ধরলাম যেখানে এখনও সভ্যতার আলো পৌঁছে নি। তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হলেন যার সাথে এখনও উন্নয়নের পরিচয় ঘটে নি।

২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমি আমাজান নদীর অববাহিকার বৃষ্টিজ অরণ্যের গহীনেই ছিলাম।

অধ্যায়-৩২
১১ই সেপ্টেম্বর ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বরে আমি শাকাইম চুম্পির সাথে ইকুয়েডরের আমাজান অঞ্চলের একটি নদী দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা দু'জনে মিলে *শুয়ারদের আত্মা* নামের বইটি লিখেছিলাম। আমাদের সাথে ছিল উত্তর আমেরিকার ১৫ জন পর্যটক। এরা বৃষ্টিজ অরণ্যের গহীনে বসবাসকারী শুয়ারদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে ও বৃষ্টিজ অরণ্যকে সংরক্ষণের পদ্ধতি শেখাতে এসেছেন।

শাকাইম ক'দিন আগের ইকুয়েডর-পেরু সংঘর্ষে ইকুয়েডরের একজন সৈনিক হিসেবে অংশ নিয়েছিল। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই সংঘর্ষ সম্পর্কে কোন খবর জানে না। অথচ উন্নত বিশ্বে জ্বালানী সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যেই এই সংঘর্ষ ঘটেছিল। জন্মলগ্ন থেকেই ইকুয়েডর ও পেরুর মধ্যকার সীমান্ত অমীমাংসিত। সাম্প্রতিককালে এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, কোন জ্বালানী ক্ষেত্রের ইজারা পাওয়ার জন্য কোন দেশের সাথে আলোচনা করতে হবে তা আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলো বুঝতে পারছিল না। তাই ইকুয়েডর ও পেরুর মধ্যকার সীমান্ত সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এই সংঘর্ষে শুয়ার গোত্র ইকুয়েডরের প্রথম প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। এই গোত্র বরাবরই ভয়াবহ যোদ্ধা। এবারের সংঘর্ষে শুয়ার যোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্রধারী ও সংখ্যায় বেশী পেরু'র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য বিজয়গুলোকে অর্জন করেছিল। শুয়ার গোত্র এই সংঘর্ষের নেপথ্যের রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। গোত্রটি বুঝতে পারে নি যে, এই যুদ্ধের সুবাদে আন্তর্জাতিক কিছুই জানতো না। গোত্রটি বুঝতে পারে নি যে, এই যুদ্ধের সুবাদে আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থাগুলো আমাজান অববাহিকার বৃষ্টিজ অরণ্যের গহীন অঞ্চলগুলোতে ঢুকতে পারবে। এবারের সংঘর্ষে শুয়ার গোত্রের নীতি ছিল বরাবরের মতই সহজ-সরল। তাদের আবাসভূমিতে তারা কখনোই বিদেশীদের ঢুকতে দেবে না।

নদী বেয়ে আমাদের নৌকা চলছে। মাথার উপরে কাকাতুয়ার দল কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে যাচ্ছে। আমি শাকাইমকে জিজ্ঞেস করলাম, "যুদ্ধবিরতি কি এখনও বহাল রয়েছে?"

শাকাইম জবাব দিলো, "হ্যাঁ, তবে আমরা এখন আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনি ও আপনার বন্ধুরা আমাদের বন্ধু। আমরা যুদ্ধ করব আনাদের জ্বালানী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। সেই সাথে আমাদেরকে আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। কেননা, আমাদের সেনাবাহিনী অবশ্যই আপনাদের সংস্থাগুলোকে রক্ষা করার জন্য আমাদের জঙ্গলে ঢুকবে।"

আমি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "এরা কি দরকার আছে শাকাইম?"

শাকাইম জবাব দিলো, "ওরা হুয়াওরানি গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছে তা আমরা দেখেছি। ওরা ওয়াওরানিদের জঙ্গলকে ধ্বংস করেছে। নদীর পানিকে দূষিত করেছে। বহুলোককে হত্যা করেছে। মেয়েদের ধর্ষণ করেছে। এখন হুয়াওরানি গোত্রের কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আমরা এই পরিণতিকে মেনে নেব না। আমরা আমাদের জঙ্গলে পেরুর সৈন্যদের ঢুকতে দিই নি। এবার এখানে জ্বালানী সংস্থাগুলোকেও ঢুকতে দেবো না। এ জন্য আমরা আমৃত্যু লড়াই করব।"

সেদিন আমরা আমাজান বৃষ্টিজ অরণ্যের এক গহীন অংশে রাত কাটালাম। আমাদেরকে শুয়ার গোত্রের একটি বড় ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। কাঁচা মাটির উপরে বাঁশের খুঁটি গেঁড়ে এর উপরে বাঁশের কঞ্চির ছাদ লাগিয়ে তার উপরে শুকনো ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে ঘরটিকে তৈরি করা হয়েছে। ঘরের মাঝখানের গর্তে নানারকম সুগন্ধি উদ্ভিজ্জের টুকরোকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছিল। আগুনের চারপাশে শুকনো ঘাসের আসন বিছিয়ে গোল হয়ে বসে আমরা রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। সে সাথে নানারকম কথাবার্তাও হচ্ছিল। এক ফাঁকে আমি অন্যদেরকে শাকাইমের সাথে আমার যা আলোচনা হয়েছিল তা বললাম। তখন অন্যদের প্রতিক্রিয়া ঠিক আমার মতোই হলো। শুয়ারদের মতো বিশ্বের কতোটি মানব গোষ্ঠী মনে করে যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবে? কতোটি মানবগোষ্ঠী আমাদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করে?

পরদিন সকালে আমি ড্রিম চেঞ্জের স্থানীয় কার্যালয়ে গেলাম। ক্ষুদে কার্যালয়টিতে একটি টু-ওয়ে রেডিও সেট রয়েছে। রেডিও সেটটি চালু করে আমি সংস্থাটির বিমান চালকদের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম, যাতে করে দু'তিন দিন পর বিমানে চড়ে আমরা ফিরে যেতে পারি। কথা বলার সময় আমি হঠাৎ করে একটি চিৎকার শুনতে পারলাম।

রেডিওর অন্য প্রান্তের বক্তা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "সর্বনাশ! নিউ ইয়র্কে হামলা চালানো হয়েছে!" এ কথা শোনা মাত্র আমরা রেডিও সেটের বাণিজ্যিক চ্যানেল চালু করলাম। পরের আধ ঘন্টায় আমরা যুক্তরাষ্ট্রে সেদিনের দুনিয়া কাঁপানো সন্ত্রাসী হামলার প্রতি মিনিটের রক্ত হিম করা ধারাবিবরণী শুনতে পেলাম। এই দিনটির কথা আমি কোনদিনও ভুলব না।

ক'দিন পরেই আমি ফ্লোরিডায় ফিরে গেলাম। ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইটন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ দেখার তীব্র ইচ্ছা আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। অমনি আমি নিউইয়র্ক যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কিনলাম। এক বিকালে আমি নিউ

ইয়র্কের শহরতলীর একটি হোটেলে উঠলাম। দিনটি ছিল অপ্রত্যাশিত রকমের রৌদ্রোজ্জ্বল ও উষ্ণ। আমি সেন্ট্রাল পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম আমার বহুদিনের কর্মক্ষেত্র ওয়াল স্ট্রীটে। এরপর থেকে হেঁটে গেলাম গ্রাউণ্ড জিরোতে। তখন আমার মন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল।

গ্রাউণ্ড জিরোতে পৌঁছার পর আমার মন থেকে উত্তেজনা মুছে গিয়ে একটা তীব্র আতঙ্ক ভর করল। স্থানটির চিত্র ও গন্ধ আমার মনকে অবশ করে ফেলল। গোটা স্থান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ। টাওয়ার দু'টির স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এগুলোর পোড়া বাঁকাচোরা কঙ্কাল। ধ্বংসাবশেষের প্রতিটি ইট, কাঠ ও পাথর পুড়ে বিকৃত আকার ধারণ করেছে। কাঁচগুলো কর্পূরের মত উবে গেছে। অন্যসব দগ্ধ বস্তুর উৎকট গন্ধকে ছাপিয়ে পোড়া মাংসের বীভৎস গন্ধ তখনও বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি দৃশ্যগুলো টেলিভিশনে দেখেছি। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই।

আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিশেষ করে লোকজনের এতো ক্ষতি হওয়ার কথা আমি কল্পনাও করি নি। এতটা সময় কেটে গেছে, তবুও চারপাশের লোকজন কিছু না কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। যারা এখানে থাকত যারা এখানে কাজ করত, তাদের কয়েকজন বেঁচে রয়েছে, কয়েকজন আবার চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এক মিশরীয় তার জুতা সারাইয়ের ছোট দোকানের বাইরে আনমনে হেঁটে বেড়াচ্ছে, সখেদে মাথা নাড়ছে।

সে বিড়বিড় করে বলছিল, "এখনও ঘটনাটিকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি বহু খদ্দের ও বন্ধুকে হারিয়েছি। আমার ভাগ্নে ওখানে কাজ করত।" বলেই ফাঁকা আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল। এরপর বলল, "মনে হয় একবার তাকে লাফ দিতে দেখেছি। আমি নিশ্চিত নই। অনেকেই তো হাত ধরাধরি করে লাফ দিয়েছিল। নিশ্চিত মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য পাখির মত আকাশে উড়তে চেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু তাদের ঠিকই শিকার করেছে।"

লোকজন যেভাবে একে অপরের সাথে কথা বলছিল সেটা আমার ভারী অবাক লাগছিল। নিউইয়র্ক মহানগরীতে হরেক-রকমের লোকেরা বাস করে। এদের গোত্র, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবিকা পুরোপুরিভাবে আলাদা। কিন্তু এখন গ্রাউণ্ড জিরোর ধ্বংস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই সব রকমের ভেদাভেদ ভুলে গেছে। যেখানে ভাষা সচল সেখানে ভাষার ব্যবহার চলছিল। যেখানে ভাষা অচল সেখানে সহমর্মিতার বিনিময় চলছিল চোখের চাহনি ও এক চিলতে হাসির মাধ্যমে। সকলেই কোন না কোনভাবে দুঃখী। এই দুঃখের উপশম ঘটছিল নীরব সহমর্মিতার মাধ্যমে। লাখ লাখ শব্দের ব্যবহারও এই নীরব সহমর্মিতাকে সরব করতে পারত না।

কতক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল যে, গ্রাউণ্ড জিরোতে এমন একটা কিছু রয়েছে যা আমি ধরতে পারছি না। বেশ কতক্ষণ চারদিকে তাকানোর পর আমি হঠাৎ করেই ব্যাপারটিকে বুঝতে পারলাম। আলোর বন্যায় চারদিক একেবারে ভেসে রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ম্যানহ্যাটনের শহরতলী এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ। আইপিএসের তহবিল যোগাড় করার জন্য আমি যখন

ওয়াল স্ট্রীটে যাতায়াত করতাম, যখন ঘন্টার পর ঘন্টা সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনা করতাম, তখন থেকেই ম্যানহ্যাটনের শহরতলীর অন্ধকারের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শুধুমাত্র আকাশ ছোঁয়া ভবনগুলোর একেবারে উপরের তলার রেস্তোরাঁয় ও বারে বসলেই আলোর দেখা মিলত। এখন গ্রাউণ্ড জিরোর মাটিতে আলো থই থই করছে। শুধু তাই নয়, বহুদিন পর আলোর ছোঁয়া পেয়ে গোটা এলাকাটিই উষ্ণ হয়ে উঠেছে। মাথার উপরের খোলা আকাশ, চারপাশে আলোর বন্যা, শেষ হেমন্তের উষ্ণ ও কোমল পরশ হয়তো বা লোকজনকে মনের বন্ধ দুয়ার খুলতে উৎসাহিত করেছে। কথাটি মনে হওয়া মাত্র নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হলো।

আমি ট্রিনিটি গীর্জার পাশ দিয়ে ঘুরে ওয়াল স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। চারপাশে সেই পুরোনো নিউইয়র্ক মহানগরী। আকাশ নেই, আলো নেই, চারপাশের অন্ধকারের মাঝে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো আলো ছড়াচ্ছে। ফুটপাতগুলো দিয়ে লোকজন প্রচণ্ডগতিতে ছুটছে। কেউ কারোর সাথে কথাও বলছে না। একজন পুলিশ থেমে থাকা গাড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে। ১৪ নম্বর স্ট্রীটে এসে প্রথম যে সিঁড়ির দেখা পেলাম সেটার একটা ধাপে বসে পড়লাম। অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একটি বিশালাকার এয়ার ব্লোয়ারের বিকট শব্দ। শুনে মনে হলো যে, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন থেকে শব্দটি আসছে। আমি চুপচাপ বসে লোকজনকে দেখতে লাগলাম। অফিসগুলোর কাজ শেষ হয়েছে। লোকজন অফিসগুলো থেকে বেরিয়ে এসে ছুটছে যার যার গন্তব্যের দিকে। কেউ বাড়িতে ফিরে যাবে। কেউ অবসর সময় কাটানোর জন্য নানারকম ক্লাবে যাবে। কেউ আবার রেস্তোরাঁয় বা বারে যাবে ব্যবসায়িক আলোচনা করতে। কয়েকজন দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। বেশীর ভাগ লোকই একাকি হেঁটে চলেছে। আমি আশপাশের লোকদের চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

রাস্তা থেকে একটি গাড়ির অ্যালার্মের তীক্ষ্ম শব্দ ভেসে এলো। একজন লোক একটি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটির দিকে একটি চাবি দেখালো। অমনি অ্যালার্ম সুবোধ বালকের মতো চুপ হয়ে গেল। আমি কতক্ষণ চুপচাপ সিঁড়িতে বসে রইলাম। এরপর পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে এর পরিসংখ্যানগুলোতে চোখ বুলাতে লাগলাম।

হঠাৎ করেই লোকটার দিকে আমার চোখ পড়ল। সে ধীরে সুস্থে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে। তার মুখ ভর্তি ধূসর লম্বা দাঁড়ি। পরনে লম্বা ধূসর ওভারকোট। ওয়াল স্ট্রীটের এই পড়ন্ত উষ্ণ সন্ধ্যাবেলায় ওভারকোটটি একেবারেই বেমানান। দেখেই বুঝলাম, ইনি আফগানিস্তান থেকে আমদানী করা এক নির্ভেজাল পাঠান।

সে আমার দিকে তাকাল। একটু ইতস্তত করল। এরপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ভদ্রভাবে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে আমার পাশে বসল। মাঝখানে অবশ্য দু'গজের মতো ব্যবধান বজায় থাকল। লোকটি সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম যে, আমাকেই কথাবার্তা শুরু করতে হবে।

আমি নিজের মনে তাকে শুনিয়ে বললাম, "চমৎকার একটি সন্ধ্যা।"

ভারী সুরে সে জবাব দিলো, "ঠিক তাই, এ রকম সময় আমরা চাই মনোরম সূর্যালোক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কারণে বলা হলো?"

জবাবে সে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন?"

সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, "এটা কি একেবারেই সুস্পষ্ট?"

আমি জবাব দিলাম, "আমিত অনেক স্থান ভ্রমণ করেছি। সম্প্রতি হিমালয় ও কাশ্মীর ঘুরে এসেছি।"

সে দাঁড়িতে হাল্কা টান দিয়ে বলল, "কাশ্মীরে তো যুদ্ধ চলছে।"

আমি বললাম, "হু, ভারত বনাম পাকিস্তান, হিন্দু বনাম মুসলমান। এ কথা ভাবলেই ধর্ম সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে, তাই না?"

সে আবারও আমার চোখের দিকে সরাসরি ভাবে তাকাল। তার চোখ দু'টো গাঢ় বাদামি, প্রায় কালচে। দেখে মনে হলো যে, লোকটি জ্ঞানী ও দুঃখী। সে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের দিকে তাকিয়ে লম্বা বাঁকা তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করল।

আমি একমত হলাম, "হয়তো বা ব্যাপারটি পুরোপুরি ভাবে অর্থনৈতিক। ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।"

সে প্রশ্ন করল, "আপনি কি সৈনিক ছিলেন?"

আমি হাসলাম, "না, আমি একজন অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা।" তাকে পরিসংখ্যান বোঝাই কাগজটি দেখিয়ে বললাম, "এগুলো আমার অস্ত্র।"

সে হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিয়ে বলল, "একগাদা সংখ্যা।"

আমি বোঝালাম, "গোটা বিশ্বের নানা রকম পরিসংখ্যান।"

সে কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে হেসে ফেলল, "আমি পড়তে পারি না।" বলেই কাগজটি ফিরিয়ে দিলো।

আমি বললাম, "প্রতিদিন ক্ষুধার কারণে ২৪ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে এ কথাটি এই কাগজে লেখা রয়েছে।"

সে হাল্কা সুরে শীষ দিলো। এরপর কতক্ষণ চিন্তা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "আমার পরিণতিও হয়তো বা তাই হতো। কান্দাহারের কাছের একটি গ্রামে আমার একটি ডালিমের খামার ছিল। রাশিয়ানরা এলো। মুজাহেদিনরা গাছের আড়ালে ও পানির নালায় লুকাল।" সে দু'হাত তুলে রাইফেলের মতো তাক করল, "তুমুল গেরিলা যুদ্ধ ঘটল।" হাত নামিয়ে বলল, "আমার খামার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এরপর আপনি কি কাজ করতেন?"

সে আমার হাতের কাগজটির দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, "ওটাতে কি ভিক্ষুকদের

কথা লেখা রয়েছে?"

সেটা লেখা ছিল না। কিন্তু পরিসংখ্যানটি হঠাৎ করেই আমার মনে পড়ল। বললাম, "খুব সম্ভবত ৮ কোটি।"

"সে বলল, "আমিও এদের মধ্যে একজন ছিলাম।" এরপর সে কতক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবে রইল। আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। এরপর সে বলল, "আমি চিন্তা করতে পছন্দ করি না। আমার সন্তান দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি পপির চাষ শুরু করলাম।"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আফিম?"

সে কাঁধ ঝাঁকাল, "কোন গাছ নেই। পানি নেই এক ফোঁটা। তাই পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে এ কাজ করা।"

আমার গলায় কষ্ট দলা পাকাল। দুঃখ ও অপরাধবোধ আমার মনকে চেপে ধরল। অনেক কষ্টে বললাম, "আফিমের চাষকে আমরা হারাম ভাবি। অথচ আমাদের বড়লোকদের অনেকেই মাদকের ব্যসা থেকে অঢেল অর্থ রোজগার করেন।"

তার চোখের তীব্র দৃষ্টি আমার সত্তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলল। এরপর সে বলল, "আপনি আসলেই একজন সৈনিক ছিলেন।" বলেই সে মাথা নেড়ে নিজের কথাকে সমর্থন করল। এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে মিশে গেল জনারণ্যে। আমি তাকে পেছন থেকে ডাক দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার মুখ থেকে শব্দ বের হলো না। তখন আমিও উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। সিঁড়ির নিচের ধাপের রেলিংয়ে থামে লাগান একটি প্রস্তর ফলকের উপরে আমার চোখ পড়ল। আমি যে ভবনের সিঁড়িতে বসেছিলাম সেই ভবনের একটি ছবি ফলকে খোদাই করা ছিল। এর নিচে লেখা ছিল যে, নিউইয়র্কের হেরিটেজ ট্রেইল ফলকটিকে স্থাপন করেছে। এরপর ফলকে লেখা ছিল ঃ

"ভেনিসের সেইন্ট মার্ক গীর্জার ঘন্টা বুরুজের উপরে স্থাপিত হ্যালিকার্ণাশাসের সমাধি সৌধের সৌন্দর্য ১৪ নম্বর ওয়াল স্ট্রীটের ওয়াল অ্যাণ্ড ব্রড ভবনের নকশাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ৫৩৯ ফুট উঁচু এই বহুতল ভবনটি এক সময় নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু ভবন ছিল। এই ভবনেই যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ধনী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকার্স ট্রাস্টের সদর দপ্তর ছিল।"

আমি বিস্ময়ে ভবনটির দিকে চেয়ে রইলাম। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে ১৪ নম্বর ওয়াল স্ট্রীট ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের মূল কেন্দ্র। পরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এই স্থানটিকে দখল করে ছিল। ১৪ নম্বর ওয়াল স্ট্রীটে ছিল ব্যাংকার্স ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল আইপিএসের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অন্যতম। ভবনটি আমার ঐতিহ্যের অংশ। বৃদ্ধ আফগানের ভাষায়, আমার সৈনিক জীবনের ভিত্তি।

এমন একটি দিনে এমন একটি ভবনের সিঁড়িতে বসব। এক আফগান উদ্বাস্তের সাথে কথা বলব। ব্যাপারটি আমার কাছে এক খাপছাড়া সমাপতন বলে মনে হলো। "সমাপতন" শব্দটি আমাকে স্তব্ধ করে দিলো। সমাপতনের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াই

আমাদের জীবনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আজকের সমাপতনটির প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে?

হাঁটতে হাঁটতে আমি আশপাশের লোকজনের চেহারা দেখতে লাগলাম। কিন্তু আমি আফগান উদ্বাস্তুর কোন খোঁজ পেলাম না। কতদূর হাঁটার পর একটি ভবনের সামনে নীল পলিথিনে মোড়া বিশাল এক মূর্তি দেখতে পেলাম। ভবনটির প্রস্তর ফলক পড়ে বুঝতে পারলাম যে, এটি ওয়াল স্ট্রীটের ২৬ নম্বর ভবন। ভবনটির নাম হচ্ছে ফেডারেল হল। এখানে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট রূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তাকে সকল মার্কিন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ খোঁজার ইচ্ছাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফেডারেল হল ওয়াল স্ট্রীটের গ্রাউণ্ড জিরোর এতটা কাছে যে তা কল্পনারও বাইরে।

"আমি রাস্তার মোড় ঘুরে পাইন স্ট্রীটে এসে পড়লাম। এই রাস্তার আমি প্রথম যে ভবনটিকে দেখলাম তার প্রস্তর ফলকে নাম লেখা রয়েছে চেজ। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ডেভিড রকফেলার তার জ্বালানী ব্যবসার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে ব্যাংকটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার মতো অর্থনৈতিক ঘাতকেরা চেজ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার লেনদেন করেছে। এ ধরনের ব্যাংকগুলো বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিস্তারের কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। এসব ব্যাংক কর্পোরেটোক্রেসির অপরিহার্য অঙ্গ।"

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে ডেভিড রকফেললার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে এই স্থাপনাটিকে অ্যালব্যাট্রস নামে ডাকা হতো। শেষদিকে স্থাপনাটি আর্থিক লোকসানের মোকাবিলা করছিল। আধুনিক ফাইবার অপটিক ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ভবনটি অনুপযুক্ত ছিল। এর লিফটগুলোকে পরিচালনা করা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তারপরও লিফটগুলো ঠিকমত কাজ করত না। টাওয়ার দু'টির নাম ছিল ডেভিড ও নেলসন। এখন এই বিশাল স্থাপনার কোন চিহ্নও নেই।

আমার পা দু'টো অনিচ্ছুক দেহের ভার বয়ে শ্লথগতিতে চলতে লাগল। বিকেলের আবহাওয়া উষ্ণ ও মনোরম। তারপরও আমি এক শীতল অনুভূতিতে আক্রান্ত হলাম। এক বিচিত্র দুশ্চিন্তা, এক অজানা আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরল। আমি এর উৎসকে খুঁজে পেলাম না। দ্রুতগতিতে হেঁটে আমি একে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। এক সময় আমার হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিজেকে আবারও গ্রাউন্ড জিরোতে আবিষ্কার করলাম। সেই বিশাল গর্ত, বাঁকাচোরা ইস্পাত, সুবিপুল ধ্বংসস্তূপ। আমি ধ্বংস এড়িয়ে যাওয়া একটি ভবনের দেওয়ালে হেলা দিয়ে গর্তটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ধসে পড়া টাওয়ারগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য উপর থেকে অনেকেই লাফ দিচ্ছে। তবুও মৃত্যুকে এড়াতে পারছে না। আমি এসব দৃশ্যকে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

আমি এর বদলে অন্য একটি দৃশ্যকে দেখতে পেলাম। ওসামা বিন লাদেন মার্কিন

সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ একটি বাণিজ্যিক সংস্থার এক প্রতিনিধির কাছ থেকে লাখ লাখ ডলারের চাঁদা ও অস্ত্র নিচ্ছেন। এরপর আমি নিজেকে একটি ফাঁকা কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে থাকতে দেখলাম।

আমি গ্রাউণ্ড জিরো থেকে নজর ফিরিয়ে চারপাশে তাকালাম। নিউইয়র্কের যেসব অংশ ১১ই সেপ্টেম্বরের ধ্বংসলীলাকে এড়াতে পেরেছিল সেসব অংশের জীবনযাত্রা এখন পুরোপুরি ভাবে স্বাভাবিক। আমি চিন্তা করলাম যে, টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর এখন যারা নিউইয়র্কের রাস্তাগুলোতে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তারা কি যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ডালিমের খামারগুলো সম্পর্কে কিছু জানে? তারা কি কোনদিনও প্রতিদিন ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণকারী ২৪ হাজার লোকের চিন্তা করেছে? নিউইয়র্কের স্বচ্ছল বাসিন্দারা কোনদিনও এসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেছে বলে আমার মনে হয় না। তারা তাদের চাকরি, দামি গাড়ি, বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ও সঞ্চয় নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। এরা নিজেরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। এমনকি তাদের সন্তানেরা যাতে একই রকম জীবনযাপন করতে পারে সেই সংস্থানও রেখে যাচ্ছে। এরা আফগানিস্তান সম্পর্কে কী জানে? মার্কিন টেলিভিশনে মার্কিন সৈন্য ও ট্যাংক বোঝাই যে আফগানিস্তানকে প্রতিক্ষণ দেখান হয়, সেই আফগানিস্তানের কথাতো সবাই জানে। কিন্তু বুড়ো আফগানের চোখে দেখা আফগানিস্তানের কথা ক'জনে জানে?

তখন আবার আমি নিজেকে একটি ফাঁকা কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে থাকতে দেখলাম।

আমি গ্রাউন্ড জিরোর দিকে ফিরে তাকালাম। তখনই একটি বিষয়কে পরিষ্কারভাবে বুঝলাম। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোর দিকে নজর দিয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে আমি অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করলাম, যারা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, বাণিজ্যিক সংস্থা, সামরিক বাহিনী ও বিশ্ব সাম্রাজ্যকে ঘৃণা করে।

আমি ভাবলাম যে, পানামা, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, গুয়াতেমালা ও আফ্রিকার বেশীর ভাগ দেশের মনোভাব কী?

আমি যে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই দেওয়াল থেকে উঠে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। একজন খাটো শ্যামলা লোক তার মাথার উপরে খবরের কাগজ দোলাতে দোলাতে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করছে। কথাগুলো শুনে আমি থেমে গেলাম।

সে যানবাহনের ইঞ্জিন ও হর্ণ এবং লাখ লাখ লোকের কথায় শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ভেনিজুয়োলায় বিপ্লব আসন্ন।"

আমি তার কাগজ কিনে এর প্রধান প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। ভেনিজুয়েলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আমেরিকা বিরোধী প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের কথা ছাপা হয়েছে এতে। সেই সাথে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন নীতির কারণে যে ঘৃণার সৃষিষ্ট হয়েছে এর কথাও বলা হয়েছে।

কিন্তু কী ঘটছে ভেনিজুয়েলায়?

অধ্যায়-৩৩
সাদ্দাম রক্ষা করলেন ভেনিজুয়েলাকে

আমি দীর্ঘদিন ধরে ভেনিজুয়েলাকে পর্যবেক্ষণ করছি। জ্বালানী সম্পদের কারণে দরিদ্র একটি দেশ কিভাবে ধনী হতে পারে তার অন্যতম সেরা দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই দেশটি। সেই সাথে হঠাৎ করেই একটি দরিদ্র দেশ ধনী দেশে পরিণত হলে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সব ক'টিই দেশটিতে দেখা দিয়েছিল। ধনীরা আরও ধনী, দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছিল। কর্পোরেটোক্রেসি দেশটিতে ইচ্ছেমত শোষণ করছিল। প্রবীণ ও নবীন অর্থনৈতিক ঘাতকেরা দেশটিতে মনের সুখে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে আমি খবরের কাগজে যেসব ঘটনার বিবরণ পড়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে ১৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রত্যক্ষ ফলাফল। ওই নির্বাচনে দেশটির দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলো বিপুল ভোটে হুগো শাভেজকে নির্বাচিত করেছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই তিনি কতকগুলো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার উপরে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে আগের সরকারের কর্মকর্তাদের ছাঁটাই করলেন। দীর্ঘদিন ধরে অনির্বাচিত কংগ্রেসকে বাতিল ঘোষণা করলেন। তিনি নির্লজ্জ, সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করলেন। নবনির্বাচিত কংগ্রেসে এমন একটি জাতীয় জ্বালানী নীতি পাস করালেন যা বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার আগে হাইমে রোলদো ইকুয়েডরের কংগ্রেসে পেশ করেছিলেন। এই নীতির সুবাদে ভেনিজুয়েলায় জ্বালানী উত্তোলনকারী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর ইজারা করের হার দ্বিগুণ হলো। এছাড়াও শাভেজ ভেনিজুয়েলার জাতীয় জ্বালানী সংস্থা পেট্রোলিয় ডি ভেনিজুয়েলার শীর্ষ পদগুলোতে নিজ অনুগতদের বসালেন। এভাবে তিনি সংস্থাটির দীর্ঘদিনের স্বাধীনতাকে খর্ব করলেন।

ভেনিজুয়েলার জ্বালানী সম্পদ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০২ খ্রীস্টাব্দে দেশটি ছিল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রফতানিকারী দেশ। তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়াম রফতানিকারী দেশগুলোর মধ্যে ভেনিজুয়েলা ছিল তিন নম্বর। পেট্রোলিয় ডি ভেনিজুয়েলার কর্মী বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। সেই সময় সংস্থাটির বার্ষিক আয় ছিল ৫ হাজার কোটি ডলার। এই আয় ছিল ভেনিজুয়েলার বার্ষিক রফতানি আয়ের

৮০%। জ্বালানী ভাণ্ডার এখনও দেশটির জাতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ভেনিজুয়েলার জ্বালানী খাতের উপরে নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাভেজ বিশ্ব রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

৮০ বছর আগে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেই প্রক্রিয়া এভাবেই শেষ হলো। এই পরিণতিকে ভেনিজুয়েলার অধিকাংশ নাগরিক নিয়তি বলে মেনে নিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর মারাকাইবোর কাছে আচমকা মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ভেনিজুয়েলার ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য পাল্টে দিলো। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রফতানিকারীতে পরিণত হলো। ভেনিজুয়েলার নাগরিকরা পেট্রো ডলারকে সকল সমস্যার সমাধান রূপে ভাবতে লাগল।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ভেনিজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে দরিদ্র দেশ থেকে সবচেয়ে ধনী দেশে পরিণত হলো। সেই সাথে দেশটির সকল খাতের অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটল। আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থান, শিল্প, কৃষি ও ভৌত অবকাঠামো সহ সকল ক্ষেত্রেই দেশটি উন্নয়নশীল বিশ্বের আদর্শে পরিণত হলো। এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও দেশটির অবদান শতগুণে বৃদ্ধি পেল।

১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলোর পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও রফতানির হার অর্ধেক কমলো। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের মূল্য একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকল। সেই সাথে অন্যান্য পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশের মতো ভেনিজুয়েলার বাজেটের অংক কমপক্ষে চারগুণ বৃদ্ধি পেল। অর্থনৈতিক ঘাতকেরা একেবারে আদা-নুন খেয়ে মাঠে নেমে পড়ল। আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো ভৌত অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন, নতুন শিল্প স্থাপন ও বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ভেনিজুয়েলাকে বিপুল অংকের ঋণ দিলো। আশির দশকে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারা ভেনিজুয়েলায় ঢুকল। তাদের নতুন গজানো দাঁত ও নখকে পরখ করার সেটাই ছিল সেরা সুযোগ। ভেনিজুয়েলার মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অতীতের তুলনায় শতগুণে বেড়েছে। এই জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য বহু পণ্যকে আমদানী করা হচ্ছে। এতো উন্নতির পরেও দেশটির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে, কারখানায় ও কৃষি খামারে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে।

আশির দশকের শেষভাগে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের মূল্যের পতন ঘটল। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে ভেনিজুয়েলা এই প্রথমবারের মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলো। সেই সাথে আইএমএফ দেশটির উপরে কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতিকে চাপিয়ে দিলো। হঠাৎ করেই কারাকাসকে বাধ্য করলো কর্পোরেটোক্রেসির শর্তগুলোকে মেনে নিতে। অনটনের মুখোমুখি হয়ে ভেনিজুয়েলার নাগরিকরা একে মেনে নিতে পারেনি। শুরু হলো সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে দু'শ'রও বেশি লোক মৃত্যু বরণ করল। পেট্রোলিয়ামকে অন্তহীন ঐশ্বর্যের উৎস ভাবার যে অলীক স্বপ্নকে গড়ে

তোলা হয়েছিল, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দেশটির মোট জাতীয় আয় ৪০% হ্রাস পেল।

দারিদ্র্য যত বৃদ্ধি পেল এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তত বাড়লো। সামাজিক মেরুকরণের গতি দ্রুততর হলো। বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অতি সাধারণ কাজগুলো করার জন্য মধ্যবিত্তদের সাথে দরিদ্রদের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। যেসব দেশ প্রধানত পেট্রোলিয়ামের রফতানির উপরে নির্ভরশীল সেসব দেশে প্রাচুর্য ও অনটনের সময়ে নাগরিকদের শ্রেণী বিন্যাস ব্যাপকভাবে বদলে যায়। ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে কঠিন আঘাত সহ্য করতে হলো। এই গোষ্ঠীর অনেকেই বেকারত্বের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাতারে ভিড়তে বাধ্য হলো।

টানা এক দশক এই অর্থনৈতিক মন্দা বজায় থাকার কারণে হুগো শাভেজের উত্থানের পথ সুগম হলো। সেই সাথে ভেনিজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব তীব্র রূপ ধারণ করল। ক্ষমতার মসনদে বসেই শাভেজ এমন সব পদক্ষেপ নিতে লাগলেন যাতে করে বুশ জুনিয়রের প্রশাসনের সাথে ভেনিজুয়েলার টক্কর বাঁধে। ২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ক'দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলাকে টার্গেট করেছিল। অর্থনৈতিক ঘাতকেরা দেশটিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে কি এখন শৃগাল বাহিনীর পালা?

তখন ২০০১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা সবকিছুকে এলোমেলো করে দিলো। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার উপদেষ্টারা আফগানিস্তান ও ইরাকে সামরিক অভিযানের প্রতি গোটা বিশ্বের সমর্থন অর্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে সময় মার্কিন অর্থনীতির মন্দাবস্থা ছিল তুঙ্গে। ভেনিজুয়েলাকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ল। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল বুঝতে পেরেছিলেন যে, খুব শিগগিরই বুশ জুনিয়রের সাথে শাভেজের রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হবে। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়া মাত্র যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলার দিকে নজর দেবে।

ওয়ালস্ট্রীট ও গ্রাউন্ড জিরোতে ঘোরাঘুরির সময় বৃদ্ধ আফগানের সাথে কথা বলে শাভেজের ভেনিজুয়েলা সম্পর্কে খবরের কাগজের প্রতিবেদন পড়ে, দীর্ঘদিন আমি যে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছি, সে বিষয়টি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। গত দিন দশকে আমি যেসব কাজ করেছি সেই কাজগুলোর ফলাফল আমাকে ঘিরে ধরল। অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে আমার কর্মকাণ্ড যে আমার মেয়ের প্রজন্মের পৃথিবীকে কুৎসিৎ, যন্ত্রণাক্ত ও অনিরাপদ করেছে তা আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। আমাকে আমার বিবেকের কাছে অকপটভাবে স্বীকারোক্তি করতে হবে। কর্পোরেটোক্রেসির প্রকৃত স্বরূপ গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। কেন বাকী বিশ্ব আমাদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করে তার কারণগুলোকে উদঘাটন করতে হবে।

আমি আবারও আমার থেমে থাকা বই লেখার কাজ শুরু করলাম। কিন্তু এর কাহিনীগুলো

এতদিনে পুরোনো হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক এতে নতুন মালমশলা যোগ করতে হবে। আমি আফগানিস্তান, ইরাক ও ভেনিজুয়েলা সফর করে এসব দেশের হালচাল দেখে বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এসব দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। তিনটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বিস্ফোরিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তিনটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বই দেশ শাসনের জন্য অনুপযুক্ত। তালেবান শাসকদের নৃশংস গোঁড়ামি আফগানিস্তানকে আদিম যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সাদ্দাম হোসেনের নির্মম স্বৈরাচার ইরাককে এক বিশাল কারাগারে পরিণত করেছে। হুগো শাভেজের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ভেনিজুয়েলাকে রাজনৈতিভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। কিন্তু কর্পোরেটোক্রেসি এই তিনটি দেশের নেতৃবৃন্দ যখনই আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্বালানী নীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখনই তাদেরকে শায়েস্তা করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে ভেনিজুয়েলা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য সমস্যা। ২০০১ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালান হয়েছিল। আফগানযুদ্ধ ইরাকের জন্য আসন্ন সামরিক অভিযানের অশনি সংকেত বয়ে এনেছিল। কিন্তু ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বুশ প্রশাসনের নীতি ছিল রীতিমত অস্পষ্ট ও জটিল। হুগো শাভেজ নিজ দেশের জন্য একজন উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত শাসক সেটা মুখ্য বিষয় নয়। আসল কথা এই যে, তিনি বিশ্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আমি এই সফরসূচী তৈরি করার আগেই ঘটনাচক্র এতে বাধা দিলো। আমার লাভহীন কর্মকাণ্ড আমাকে ২০০২ খ্রীস্টাব্দে কয়েকবার দক্ষিণ আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল। এমনই একটি সফরে আমার সাথে ভেনিজুয়েলার একটি পরিবার যোগ দিলো যে পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমি ওই পরিবারের কাছ থেকে শাভেজের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনলাম। এর পাশাপাশি শাভেজের শাসনের সুবাদে লাভবান পরিবারগুলোর সাথেও আমি পরিচিত হলাম। তাদের কাছ থেকে সুবাদে লাভবান পরিবারগুলোর সাথেও আমি পরিচিত হলাম। তাদের কাছ থেকে শাভেজের পক্ষে অনেক কথা শুনতে পারলাম। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারলাম যে, কারাকাসের ঘটনাবলী হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিক ঘাতকেরা যে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছি তারই ফসল।

২০০২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর নাগাদ ভেনিজুয়েলা ও ইরাকের পরিস্থিতি সঙ্কটময় হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্কটের বৈশিষ্ট্যের কারণে দু'টি দেশ দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিল। ইরাকে অর্থনৈতিক ঘাতক ও শৃগালদের শত তোষামোদ ও হুমকি সাদ্দাম হোসেনকে নতি স্বীকার করাতে পারল না। অবশেষে দ্বিতীয় বুশ প্রশাসন ইরাকে দ্বিতীয় সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। অন্যদিকে ভেনিজুয়েলায় বুশ প্রশাসন কারমিট রুজভেল্টের ইরানী কৌশলকে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিল। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা লিখল ঃ

"প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে গড়ে তোলা জাতীয় হরতালের ২৮তম দিনে ভেনিজুয়েলার হাজার হাজার নাগরিক কারাকাসের রাজপথগুলোতে নেমে

এলো। হরতালের প্রধানতম শক্তি হচ্ছে ৩০ হাজার পেট্রোলিয়াম শ্রমিক যারা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম পেট্রোলিয়াম রফতানীকারী দেশের সবচেয়ে বড় রফতানি শিল্পকে অচল করতে সক্ষম। গত কয়েকদিন যাবৎ ভেনিজুয়েলার হরতাল পরিস্থিতি অচলাবস্থার শিকার হয়েছে। শাভেজ হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের দিয়ে ভেনিজুয়েলার অর্থনৈতিক খাতগুলোকে চালু রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যদিকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শ্রমিক নেতাদের সমন্বয়ে গড়া জাতীয় ফ্রন্ট বিরতিহীন হরতালের মাধ্যমে শাভেজ প্রশাসনের পতন ঘটানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

এভাবেই পঞ্চাশ বছর আগে সিআইএ ইরানে মোসাদ্দেকের পতন ঘটিয়ে দেশটিতে রেজা শাহকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। পঞ্চাশ বছর পর একইভাবে ভেনিজুয়েলায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। পাঁচ-পাঁচটি দশক কেটে গেলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জ্বালানীর দাপট একচুলও কমে নি। তাই জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারী একতিলও হ্রাস পায়নি।

শাভেজের সমর্থকদের সাথে তার প্রতিপক্ষদের সংঘর্ষ অব্যাহত থাকল। কয়েকজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল। কয়েক ডজন লোক আহত হলো। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে আলাপ করলাম। আমি যখন অর্থনৈতিক ঘাতক বাহিনীর সদস্য ছিলাম তখন সে শৃগাল বাহিনীর সদস্য ছিল। আমার মতো সেও কোনদিন মার্কিন সরকারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেনি। কিন্তু সে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর পক্ষে বহু দেশে বহু গোপন অপারেশন পরিচালনা করেছে। সে আমাকে জানাল যে, এক বেসরকারী ঠিকাদার কারাকাসে হরতালের আয়োজন করার ও ভেনিজুয়েলার সামরিক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিল। সে এই অনুরোধকে প্রত্যাখান করেছে। ভেনিজুয়েলার সামরিক কর্মকর্তাদের অধিকাংশই স্কুল অব দ্য আমেরিকাতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। হরতালের কারণে যখন ভেনিজুয়েলাতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেবে তখন দেশটির সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুগো শাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এই ছিল পরিকল্পনা। বন্ধু আমাকে বলল, "কাজটা আমি করতে রাজি হইনি। কিন্তু যিনি এই কাজের ভার নিয়েছেন তিনি এক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ।"

জ্বালানী সংস্থা ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের মূল্য বৃদ্ধি ও মার্কিন অর্থনীতির মন্দাবস্থা তীব্রতর হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করলেন। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি জটিল হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বুশ প্রশাসন হুগো শাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। ঠিক এমন সময় আচমকা হুগো শাভেজের পতনের খবর পাওয়া গেল। ঠিক এমন সময় আচমকা হুগো শাভেজের পতনের খবর পাওয়া গেল। এই সুযোগে নিউইয়র্ক টাইমস লাতিন আমেরিকায় সিআইএর কর্মকাণ্ডের ইতিহাসকে তুলে ধরল। সেই সাথে পত্রিকাটি ভেনিজুয়েলায় কারমিট রুজভেল্টের দায়িত্ব পালনকারীর পরিচয়ও প্রকাশ করল। পত্রিকাটি লিখল ঃ

"স্নায়ু যুদ্ধের বহু আগে থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সময় যুক্তরাষ্ট্র নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় বহুবার স্বৈরাচারী শাসকদের প্রতিষ্ঠা ও সমর্থন করেছে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে সিআইএ ক্ষুদে গুয়াতেমালায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেছিল। দেশটিতে পরবর্তী চার দশকে ডানপন্থী সরকারগুলোর সাথে বামপন্থী গেরিলা বাহিনীগুলোর সংঘর্ষের কারণে প্রায় ২ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। চিলিতে সিআইএ জেনারেল অগাস্তো পিনোশে উগার্তের সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছিল। পিনোশে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টানা ১৭ বছর নির্মমভাবে চিলিকে শাসন করেছিলেন। পেরুতে একটি দুর্বল গণতান্ত্রিক সরকার সিআইএ সমর্থিত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলবার্তো কে ফুজিমোরি ও তার গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ভ্লাদিমিরো এল মন্তোসিনোর কুশাসনের ফলাফলকে মুছে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র নিজ তাঁবেদার জেনারেল ম্যানুয়েল আন্তোনিও নরিয়েগাকে উৎখাত করার জন্য পানামাতে সামরিক অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ ক্ষমতায় বসার আগে দীর্ঘ ২০ বছর নরিয়েগা সিআইএর কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য পাচার করেছিলেন। আশির দশকে সিআইএ নিকারাগুয়ার বামপন্থী গেরিলা বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে দেশটির সরকারকে সাহায্য করেছিল। এজন্য নিকারাগুয়ায় উৎপাদিত মাদকদ্রব্য কালোবাজারে বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে কালোবাজার থেকে অস্ত্র কিনে ইরানকে বিক্রি করা হয়েছিল। ইরান এসব অস্ত্রের যে মূল্য পরিশোধ করেছিল সেই অর্থ দিয়ে কালোবাজার থেকে অস্ত্র কিনে নিকারাগুয়ার সরকারের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। এই জটিল অপারেশনের কথা ফাঁস হওয়ার পর রেগান প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মার্কিন কংগ্রেসের শুনানির সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত মার্কিন কর্মকর্তাদের তালিকায় অটো জে রেইখের নাম পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। লাতিন আমেরিকার রাজনীতি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ব্যক্তিকে প্রথম বুশ প্রশাসনের সময় ভেনিজুয়েলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তঃ আমেরিকান বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী। হুগো শাভেজের পতন অটো জে রেইখের কৃতিত্ব তালিকায় সর্বশেষতম সংযোজন।"

দ্বিতীয় বুশ প্রশাসন ও রেইখ নিশ্চয়ই হুগো শাভেজের পতনের কারণে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। তাদের এই আনন্দ ৭২ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয় নি। অবিশ্বাস্যভাবে মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে শাভেজ ঘটনা প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে ফেললেন। সেই সাথে তিনি ক্ষমতায় ফিরে এলেন। ইরানের মোসাদ্দেক ইরানের সামরিক বাহিনীকে নিজের পক্ষে টানতে পারেন নি। ভেনিজুয়েলার শাভেজ ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনীকে নিজের পক্ষে টানতে পারলেন। এজন্য ভেনিজুয়েলার সামরিক কর্মকর্তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। কেননা, তারা এক্ষেত্রে শত প্রলোভনকে জয় করেছিলেন। সেই সাথে জাতীয় জ্বালানী সংস্থা পেট্রোলিয় ডি ভেনিজুয়েলা শাভেজের পক্ষ ত্যাগ করে নি। সংস্থাটি হরতালে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের বাদ দিয়েই নিজ কর্মকাণ্ড চালু রাখতে সক্ষম হলো।

ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শাভেজ প্রথমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

নিলেন। এরপর তিনি হরতালে অংশগ্রহণকারী জ্বালানী শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি সামরিক বাহিনীর অবিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের ছাঁটাই করলেন। অবশেষে তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দেশ থেকে বহিষ্কার করলেন। শাভেজ যখন পতন থেকে ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে প্রায় সম্পন্ন করার পথে, তখন তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আয়োজনকারী দু'জন রাজনৈতিক ও ১০ জন শ্রমিক নেতা রাতের অন্ধকারে ভেনিজুয়েলা ত্যাগ করেছিলেন। ক্ষমতাকে সুসংহত করার পর শাভেজ এই ১২ জনকে সিআইএ'র দালাল রূপে আখ্যায়িত করে এদেরকে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদানের দাবি জানালেন। এই ডার্টি ডজন এখন পর্যন্ত শাভেজের নাগালের বাইরে অবস্থান করছেন।

চূড়ান্ত বিচারে পুরো ঘটনা প্রবাহ দ্বিতীয় বুশ প্রশাসনের জন্য এক মহা বিপর্যয়। লস এঞ্জেলস টাইমস পত্রিকার ভাষায় ঃ

"বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজকে অপসারণের লক্ষ্যে গত কয়েক মাস যাবৎ দেশটির বেসামরিক রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করার কথা স্বীকার করেছেন। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা উচিত।"

পুরো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঘাতক ও শৃগাল উভয় বাহিনীই ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ইরান থেকে ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের ভেনিজুয়েলা যে পুরোপুরিভাবে পৃথক এ কথাটি প্রমাণিত হলো। তবে এটা কি নতুন যুগের সূচনা, না একটি রাজনৈতিক ব্যতিক্রম, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না। এক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বুঝলাম যে, সাদ্দাম হোসেন ভেনিজুয়েলাকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় বুশ প্রশাসন একই সাথে আফগানিস্তান, ইরাক ও ভেনিজুয়েলাকে মোকাবিলা করতে পারত না। এজন্য যে অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল তা মার্কিন সরকারের হাতে ছিল না। এমনকি এক সাথে তিনটি দেশে সামরিক অভিযান চালানোর মতো রাজনৈতিক সমর্থন দ্বিতীয় বুশ প্রশাসন যোগাড় করতে পারত কিনা সন্দেহ।

এহেন পরিস্থিতি পাল্টাতে বেশী সময় লাগে না। অদূর ভবিষ্যতে হুগো শাভেজ অবশ্যই আরও বড় রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হবেন। তখন তার পক্ষে সেই সঙ্কটকে সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

গত পঞ্চাশ বছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে তেমন একটা পাল্টায় নি তা বোঝা গেল ভেনিজুয়েলার ঘটনা প্রবাহ থেকে।

অধ্যায়-৩৪
ইকুয়েডরে ফিরে যাওয়া

ভেনিজুয়েলা ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি দুর্বল দেশের লড়াই করার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ভেনিজুয়েলার ঘটনা প্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করার সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, আসল ও গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে অন্য একটি দেশে। বিনিয়োগকৃত অর্থ বা সংশ্লিষ্ট জনবলের হিসেবের কারণে এই রণক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ এই রণক্ষেত্র এমন সব বিষয়ের সাথে জড়িত যেগুলো সাম্রাজ্য বিস্তারের বস্তুতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলোকেও অতিক্রম করে। এই রণক্ষেত্রটি ব্যাংকার, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদদের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে আধুনিক সভ্যতার সত্তার গভীরে প্রবেশ করেছে। এই রণক্ষেত্রটি তৈরি হচ্ছে এমন একটি দেশে যে দেশটিকে আমি প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছি। এই দেশেই আমি পীস কোরের স্বেচ্ছাসেবক রূপে প্রথমবারের মতো কাজ করেছিলাম। দেশটি হচ্ছে ইকুয়েডর।

১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে আমি প্রথমবারের মতো ইকুয়েডর সফর করেছিলাম। এরপর থেকে এ পর্যন্ত সময় দেশটি কর্পোরেটোক্রেসির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। আমি ও আমার সতীর্থ অর্থনৈতিক ঘাতকেরা এবং আমাদের পরবর্তী উত্তরসূরীরা ইকুয়েডরকে স্রেফ দেউলিয়া বানিয়েছি। আমরা দেশটিকে শত কোটি ডলার ঋণ দিয়েছি। বিনিময়ে দেশটি নিজ ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থাগুলোকে নিয়োগ করেছে। ফলে, মাত্র তিন দশকের মধ্যে দেশটির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর হার ৫০% থেকে ৭০% এ উন্নীত হয়েছে। বেকারত্বের হার ১৫% থেকে ৭০% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটি ডলার থেকে ১ হাজার ৬শ' কোটি ডলার হয়েছে। বর্তমানে ইকুয়েডরের জাতীয় বাজেটের ৫০% ব্যয় হয় জাতীয় ঋণ পরিশোধ খাতে। অথচ দেশটির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটের মাত্র ১% এ ব্যয় করা হয়।

ইকুয়েডরের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এটি কোন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফসল নয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কেন্দ্রীয় সরকার সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছে। এ ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রশাসনগুলোর মধ্যে কোন রকম নীতিভেদ ছিল না। এই প্রক্রিয়ায় সকল আন্তর্জাতিক ব্যাংক, বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থা জড়িত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র

এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করেছে। সেই সাথে এতে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশও অংশগ্রহণ করেছিল।

গত তিন দশকে কয়েক হাজার লোক ইকুয়েডরকে শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত করেছে। চলতি শতাব্দীর শুরু দিকেই দেশটি একটি দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এজন্য দায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন নিজেদের কর্মকাণ্ডের সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে আমার মতো সচেতন ছিল। কিন্তু এদের সিংহভাগই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখা কলাকৌশলগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। কেউ আবার আমার মতো নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তার স্বার্থপর দৃষ্টান্তকে সার্থকভাবে অনুসরণ করেছে। কেউ আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পুরস্কারে অনুপ্রাণিত ও তিরস্কারে ভীত হয়ে সংস্থার লক্ষ্যকে হাসিল করেছে। এসব ব্যক্তি নিজেদের কর্মকাণ্ডকে নির্দোষ বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেছে। এমনকি এরা একটি হতদরিদ্র দেশকে উন্নয়নের ধারায় সামিল করার গৌরবও অনুভব করেছে।

এসব ব্যক্তি নিজেদের অজান্তে প্রতারিত ও ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হলেও এরা কোন গোপন ষড়যন্ত্রের সদস্য ছিল না। বরঞ্চ এরা ছিল এমন একটি প্রক্রিয়ার অংশ যা সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও কার্যকর ভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলেছে। এসব ব্যক্তিদের প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজে লাগান হয়নি। বরঞ্চ এরা ছিল বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একান্ত অনুগত কর্মী। বেতন, বোনাস, বীমা, পদোন্নতি ও পেনশনের মাধ্যমে এদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে। সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা, মানসিক চাপ প্রয়োগ ও পারিবারিক নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করার মাধ্যমে এদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এভাবেই কর্পোরেটোক্রেসি তার কর্মীদেরকে নিজ লক্ষ্য হাসিলের কাজে লাগিয়েছে।

এই প্রক্রিয়া ইকুয়েডরে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এর ফলে চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা ছিল মাফিয়া বাহিনীর গডফাদারের মতো। মাফিয়ারর একজন গডফাদার যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অকুণ্ঠচিত্তে সহায়তা করে। এর পর সময় মতো এসব সহায়তাকে কড়ায়গণ্ডায় উসুল করে। আমরাও তেমনি অকুণ্ঠচিত্তে ইকুয়েডরের ভৌত অবকাঠামোগুলোকে ভেঙে নতুন ভাবে গড়ে দিয়েছি। এভাবে যখন দেশটি ঋণের সাগরে তলিয়ে যাবে তখন আমরা এর বৃষ্টিজ অরণ্যের নিচের জ্বালানী ভাণ্ডারকে শুষে নেওয়ার কাজ শুরু করব। কেননা, আমাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি ইকুয়েডরের নেই।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দের শুরুর দিকে কুইটো থেকে সুবারু আউটব্যাক গাড়িতে চড়ে আমি চললাম অরণ্য শহর শেলের দিকে। শাভেজ তখন ভেনিজুয়েলার সিংহাসনে ফিরে এসেছেন। দেশটিতে দ্বিতীয় বুশ প্রশাসনের সকল কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সকল প্রলোভন ও হুমকিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য তৈরি হচ্ছে। তিন দশক সময়ের মধ্যে হঠাৎ করেই অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের

জ্বালানী চাহিদা যেসব দেশ মেটাতো সেসব দেশের অধিকাংশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক শীতল হওয়ায় ওয়াশিংটনের পক্ষে নিজ জ্বালানী চাহিদা মেটান কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কর্পোরেটোক্রেসির মুনাফার অংক বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই জ্বালানী সরবরাহের নতুন উৎস খুঁজে বার করার কাজে নেমে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এ কারণেই কর্পোরেটোক্রেসির নজর পড়ল ইকুয়েডরের উপরে। শুরু হলো দেশটির জ্বালানী সম্পদকে শুষে নেওয়ার পালা।

পাস্তাজা নদীর উপরে নির্মিত অতিকায় বাঁধের পাশ দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় আমি ইকুয়েডরের সংগ্রামের স্বরূপটিকে চিনতে পারলাম। এই সংগ্রাম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের সাথে সবচেয়ে দরিদ্র দেশের স্বার্থের সংঘাত নয়। এই সংগ্রাম শোষক ও শোষিতের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নয়। এই সংগ্রাম আমরা প্রকৃতভাবে সভ্য কিনা, সভ্য হলে কতটুকু সভ্যতা বোঝার মানদণ্ড। আমরা ছলেবলে কৌশলে এই দুর্বল দরিদ্র দেশকে তার সেরা সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করেছি। বিনিময়ে দেশটির যে ক্ষতি হবে তা কোনদিনও পূরণ করা সম্ভব হবে না।

যদি ইকুয়েডরকে দীর্ঘদিন যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা আমরা কড়ায় গণ্ডায় উসুল করতে চাই তাহলে এর প্রতিক্রিয়াকে পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়ায় ইকুয়েডরের বৃষ্টিজ অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রা, জীবিকা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হবে। ওই অঞ্চলের পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, ফুল-ফল, সরীসৃপ -মাছসহ গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিলুপ্ত হবে। এমন সব উদ্ভিজ্জ ও গাছ পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে, যা আমাদের নানারকম আধি-ব্যাধি নিরাময়ের কাজে লাগতে পারত। গোটা বিশ্বের অরণ্যাঞ্চলগুলো শিল্পজাত দূষিত গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলোকে শোষণ করে আমাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে। এসব অরণ্যাঞ্চল থেকে সৃষ্ট জলীয় বাষ্প আকাশে মেঘ তৈরি করে। এসব মেঘ থেকে নেমে আসা বৃষ্টি আমাদের পানি চাহিদার একটি বড় অংশকে পূরণ করে। তাই পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ বিশ্বের অরণ্যাঞ্চলগুলোকে রক্ষা করার জন্য সকল ক্ষমতাধর মহলের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন। সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবীকে গড়ে তুলতে হলে এই আবেদনের প্রতি সকলেরই সাড়া দেওয়া উচিত।

আমরা যদি ইকুয়েডরকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করি তাহলে আমরা ফিরে যাব একেবারে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য গঠনের দিনগুলোতে। আমরা ক্রীতদাস প্রথাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানাই। অথচ আমাদের বিশ্ব সাম্রাজ্য এর আগের যে কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে শতগুণে বেশী লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। এখন ইকুয়েডরের মতো ক্ষুদে দেশও আমাদের উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছে। এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা কি আমাদের বিবেককে একটুও পীড়া দেয় না?

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান মাত্র আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আন্দিজের বুক এখন একেবারেই ফাঁকা। অথচ যখন আমি পীস কোরের চাকরি নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তখন এ স্থানটি ছিল গহীন অরণ্য। এই অপ্রত্যাশিত রুক্ষতা থেকে

চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ঠিক তখনই আরেকটি চিন্তা আমাকে নাড়া দিলো। ইকুয়েডরকে শোষণ করার কারণে দেশটির অপূরণীয় ক্ষতি ঘটবে এটা সম্পূর্ণভাবে আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমি যতগুলো দেশে কাজ করেছি, যতগুলো দেশ বিশ্ব সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, ততগুলো দেশ একই রকম অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে। ইকুয়েডর আমার প্রথম আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষদিকে আমি এদেশেই আমার ব্যক্তিগত সততাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম। তাই ইকুয়েডরের প্রতি আমি এখনও দুর্বল। এ কারণেই দেশটির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আমাকে বিচলিত করেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য অরণ্যাঞ্চলের মতো ইকুয়েডরের বৃষ্টিজ অরণ্য গোটা মানবজাতির এক অমূল্য সম্পদ। এই অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো ও এই অঞ্চলের পুরো প্রাকৃতিক পরিবেশ সমগ্র মানব সভ্যতার এক মহামূল্যবান ঐশ্বর্য। একইভাবে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি অঞ্চল ও এতে বসবাসকারী বেদুইন গোষ্ঠীগুলো সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়ার পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল, ফিলিপাইন্স উপকূল, মধ্য এশিয়ার স্তেপ, আফ্রিকার সাভানা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ আচ্ছাদন, উত্তর আমেরিকার বনভূমিসহ গোটা পৃথিবীর বিপন্ন প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সমগ্র মানবজাতির জন্য সমানভাবে প্রয়োজনীয়। বিশ্ব সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কারণে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসব অঞ্চলের প্রতিটিকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে।

"যে পরিসংখ্যানে ব্যাপারটিকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই পরিসংখ্যানটির কথা আচমকা আমার মনে পড়ল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর ধনাঢ্যতম ২০% এর সাথে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্রতম ২০% এর আয়ের অনুপাত ছিল -৩০:১। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের এই অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪:১ হয়েছে। অথচ তারপরও আন্তর্জাতিক অনুদান বাণিজ্যের সাথে জড়িত সরকার, ব্যাংক ও সংস্থাগুলো গোটা বিশ্বকে উন্নয়নের জয়গান শোনাচ্ছে।" ১.

তাই আমাকে আবার ইকুয়েডরে ফিরে আসতে হয়েছে। বিশ্বের অনেকগুলো রণক্ষেত্রের একটি হলেও দেশটি আমার মনকে জুড়ে রয়েছে। ৩৫ বছর আগে একটি মার্কিন সংস্থার সদস্য রূপে আমি এদেশে এসেছিলাম। সংস্থাটির নামের প্রথম অংশে শান্তি শব্দটি রয়েছে। ৩৫ বছর পর আমি একটি রক্তাক্ত লড়াইয়ের সম্ভাবনাকে ঠেকানোর লক্ষ্যে এদেশে ফিরে এসেছি। ৩৫ বছর আগে আমার হাত দিয়েই এই লড়াইয়ের সূচনা ঘটেছিল।

আফগানিস্তান, ইরাক ও ভেনিজুয়েলার ঘটনাবলী যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখার কথা। তবে ইকুয়েডরের পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে আলাদা। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নেই। এই লড়াইয়ের পক্ষে রয়েছে বর্শা, তলোয়ার তীর-ধনুক ও গাদা বন্দুকধারী কয়েক হাজার আদিবাসী যোদ্ধা। অন্যপক্ষে রয়েছে ইকুয়েডরের আধুনিক সামরিক বাহিনী, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর

ভাড়াটে পেশাদার পেটোয়া বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপদেষ্টাগণ। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইকুয়েডর ও পেরুর মাঝে যে রকম যুদ্ধ ঘটেছিল ঠিক সে রকমই একটি যুদ্ধ ঘটবে ইকুয়েডরে। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের মতো ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের কথা বাকি বিশ্ব জানবে না। তারপরও এই গৃহযুদ্ধটি ঘটবে। কেননা, দিনে দিনে তিলে তিলে এই গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

২০০২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে একটি পেট্রোলিয়াম সংস্থা একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজ কর্মীদের জিম্মি করে রাখার অভিযোগ উত্থাপন করল। সংস্থাটির মতে, আদিবাসী গোষ্ঠীটির জঙ্গিবাদীদের সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্র বিশেষ করে আল কায়েদার সম্পর্ক রয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, তখন পর্যন্ত ইকুয়েডরের সরকার এই পেট্রোলিয়াম সংস্থাকে দেশটির আমাজান অরণ্যাঞ্চলে জ্বালানীকূপ খননের অনুমতি দেয়নি। কিন্তু জ্বালানী ক্ষেত্র অনুসন্ধানের নামে সংস্থাটির কর্মীরা ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলে ঢুকেছিল। পেট্রোলিয়াম সংস্থার অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হওয়ার কয়েকদিন পর আদিবাসী গোষ্ঠীটি ঘটনা সম্পর্কে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করল।

আদিবাসী গোষ্ঠীটির নেতাদের ভাষায়, পেট্রোলিয়াম সংস্থাটির কর্মীরা অনুমতি না নিয়েই তাদের এলাকায় ঢুকেছিল। গোষ্ঠীটির যোদ্ধাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা কর্মীদের কোন রকম ভয়ও দেখায়নি। বরঞ্চ যোদ্ধারা সাদরে কর্মীদের নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেছে। সেখানে গোষ্ঠীপ্রধানরা কর্মীদের খাবার ও স্থানীয় বিয়ার চিচা দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। চিচার নেশায় যখন কর্মীরা মশগুল তখন যোদ্ধারা কর্মীদের পথ প্রদর্শকদের নৌকায় তুলে দিয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কর্মীদের আটকে রাখা হয়নি। তারা যে কোন সময় গ্রামটি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

উঁচু নিচু পাহাড়ি পথ দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে আমার একটি কথা মনে পড়ল। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে আইপিএস বিক্রি করে দেওয়ার পর আমি ইকুয়েডরে ফিরে গিয়ে দেশটির শুয়ার গোষ্ঠীকে তাদের বৃষ্টিজ অরণ্যকে রক্ষা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। গোষ্ঠীটির প্রধানরা জবাব দিয়েছিল, "হে উত্তরের শ্বেতাঙ্গ। আপনারা যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন সেই পৃথিবীতে বিশাল কলকারখানা, প্রচুর গাড়ি ও আকাশ ছোঁয়া ভবন ছাড়া আর কিছু নেই। আপনাদের এই স্বপ্ন গোটা পৃথিবীকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে।"

তারা আমাকে তখন উপদেশ দিয়েছিল, "আপনাদের এই স্বপ্নটাকে পাল্টে ফেলুন।" এই ঘটনার এক যুগ পরে বহু অলাভজনক সংস্থার বহু রকম প্রকল্প বাস্তবায়ন সত্ত্বেও পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে। এমন কি আমার সংস্থা ড্রিম চেঞ্জের উদ্যোগগুলোকে কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। এখন গোটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার সামনে।

আমার গাড়ি অরণ্য শহর শেলে পৌছার পরপরই আমাকে আলোচনায় যোগ দিতে হলো। কিশওয়ার, শুয়ার, আগুয়ার, সিরিয়া ও জাপারোসহ বহু আদিবাসী গোত্রের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। কয়েকজন প্রতিনিধি কয়েকদিন ধরে জঙ্গলের ভেতর

দিয়ে পুরো পথ হেঁটে এসেছে। অন্যরা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিমানে চড়ে এসেছে। কয়েকজন তাদের গোত্রীয় পোশাক পরে এসেছে। তাদের মুখে নানা রকম চিহ্ন আঁকা, মাথায় রয়েছে নানারকম পাখির পালকের টুপি। অন্যরা শহরের লোকদের মতো টিশার্ট, জিন্সের প্যান্ট ও কেডস জুতা পরেছে।

"জ্বালানী কর্মীদের জিম্মি করে রাখার দায়ে অভিযুক্ত আদিবাসী গোষ্ঠীটির প্রতিনিধিরা প্রথমে কথা বলল। তারা জানালো যে, জ্বালানী কর্মীদের মুক্তি দেওয়ার পরপরই ইকুয়েডরের সৈন্যরা তাদের ছোট্ট গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল। এসময় তাদের গ্রামে চোন্তা গাছে ফল ধরার উৎসব পালন করা হচ্ছিল। ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো চোন্তা গাছকে বিশেষভাবে সম্মান করে। বছরে একবার এই গাছে ফল ধরে। এই গাছে ফল ধরার সাথে সাথে আমাজান অরণ্যাঞ্চলের পাখিগুলোর প্রজনন ঋতু শুরু হয়। এই ঋতুতে এই অঞ্চলের সাধারণ থেকে দুর্লভ সব প্রজাতির পাখির বংশ বৃদ্ধি ঘটে। তাই এ সময় চোন্তা গাছগুলোতে পাখিদের মেলা বসে। তাই চোন্তা ঋতুতে গোটা আমাজান অঞ্চলে পাখি শিকার করা নিষেধ। যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো বছরের এই সময় নিয়মকে মেনে এসেছে।

একজন নারী প্রতিনিধি বলল, "ঠিক এই সময়ই সৈন্যরা আমাদের গ্রামে ঢুকল।" আমি তার ও তার সঙ্গীদের বেদনাটিকে অনুভব করতে পারলাম। তারা বলল যে, সৈন্যরা কোন ঐতিহ্যবাহী নিয়মকেই মানে না। তারা চোন্তা গাছগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মনের সুখে গুলি কের পাখিগুলোকে মেরেছে। কিছু পাখিকে শিকে গেঁথে আগুনে ঝলসে খেয়েছে। বাকিগুলো খোলা আকাশের নিচে পচে গলে পরিবেশকে দূষিত করেছে। সৈন্যরা শস্যের ক্ষেত, সবজির বাগান, মেটে আলুর ক্ষেত ও ফলের বাগানগুলোকে তছনছ করেছে। এসব ক্ষেতে ও বাগানে বহুদিন আবাদ করা সম্ভব হবে না৷ তারা নদীর পানিতে বিস্ফোরণ ফাটিয়ে মাছ মেরেছে। পোষা গরু, ছাগল, মুরগী, হাঁস ইচ্ছেমত জবাই করে খেয়েছে। সৈন্যরা স্থানীয় যোদ্ধাদের বর্শা, তলোয়ার, তীর-ধনুক ও গাদা বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেছে। তারা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছে। জ্বালানী ও বিস্ফোরক দিয়ে নদীর পানিকে দূষিত করেছে। মনের খায়েশ মিটিয়ে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করেছে। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে গোটা বনকে দূষিত করেছে। এখন গোটা বনে মশা, মাছি, ইঁদুর ও কৃমি অবাধে রাজত্ব করছে।

একজন পুরুষ প্রতিনিধি যোগ করল, "আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল। আমরা লড়াই করতে পারতাম অথবা আমাদের অহংকারকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেরা নিজেদের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে পারতাম। আমরা লড়াই না করার সিদ্ধান্ত নিলাম।" এরপর সে যে কাহিনী শোনাল তা রীতিমত কল্পনার অতীত। সৈন্যদের অত্যাচারগুলোকে মুছে ফেলার জন্য গোটা গোষ্ঠী খাবার না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে এটাকে অনশন নামে আখ্যায়িত করল। কিন্তু এটা স্বেচ্ছায় গণমৃত্যুবরণ করা বৈ আর কিছুই নয়। তিন দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে সৈন্যরা চতুর্থ দিনে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।"

অন্য প্রতিনিধিরা প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের কাহিনীগুলোকে শোনাল। দ্বিতীয় নারী প্রতিনিধি বলল, "আমার ছেলে ইংরেজী, স্প্যানিশ ও বেশ কয়েকটি আদিবাসী ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। সে একটি বিদেশী পর্যটন সংস্থার প্রদর্শক ও অনুবাদকের চাকরি করত। সংস্থাটি তাকে মোটামুটি ভাবে চলে যাওয়ার মতো বেতন দিতো। একটি পেট্রোলিয়াম সংস্থা তাকে দশগুণ বেশী বেতন দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কিনে নিলো। সে কী করতে পারত? এখন সে তার পুরোনো সংস্থা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে চিঠি লেখে। যারা আমাদের সাহায্য করতে চায় তাদের বিপক্ষে প্রচার চালায়। জ্বালানী সংস্থাগুলোকে আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলে অভিহিত করে।" চাপা কান্নায় তার গোটা শরীর কেঁপে উঠল। কান্নায় ভেজা গলায় সে কোন রকমে বলল, "এখন সে আমাদের কেউ নয়। আমার ছেলে.." সে আর কথা বলতে পারল না। প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল। অন্যরা তাকে ধরে বসিয়ে দিলো।

শামান গোত্রের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও টুকান পাখির পালকের টুপি পরা এক প্রবীণ প্রতিনিধি উঠে দাঁড়াল। সে বলল, "জ্বালানী সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করার জন্য সকল গোষ্ঠী মিলে তিনজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করেছিলাম সে কথাটি বোধহয় আপনি জানেন। তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা কি আপনি জানেন? তারা বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে অন্যদের মতো এজন্য জ্বালানী সংস্থাগুলোকে দায়ী করব না। তবে এতে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। কেননা, জ্বালানী সংস্থাগুলো মৃতদের স্থানে নিজেদের অনুগত ব্যক্তিদের বসিয়েছে।"

আধুনিক পোশাক পরিহিত এক প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে একটি চুক্তি পড়ে শোনাল। ৩ লাখ ডলারের বিনিময়ে একটি মার্কিন আসবাবপত্র নির্মাণকারী সংস্থার কাছে কয়েকশ' বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বনভূমিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে ওই অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রধানদের স্বাক্ষর রয়েছে।

প্রতিনিধিটি সজোরে বলল, "চুক্তিটি গোষ্ঠীর প্রধানরা স্বাক্ষর করেন নি। আমি ব্যাপারটি জানি। কেননা, এদের একজন হচ্ছেন আমার আপন ভাই। এটাও এক ধরনের গুপ্তহত্যা। জালিয়াতির মাধ্যমে আমাদের নেতাদের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবকে হত্যা করা হচ্ছে।"

ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলে এখন পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলোকে জ্বালানী কূপ খননের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপরেও এই অঞ্চলে স্বার্থের সংঘাত ঘটছে। ব্যাপারটিকে ভাগ্যের পরিহাস বলে মনে হলেও একদিক থেকে তা বিচিত্রভাবে সঠিক। পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলো ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলের আশপাশের এলাকাগুলোতে বহু জ্বালানী কূপ খনন করে জ্বালানী আহরণ করছে। আমাজান অরণ্যাঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো এই কর্মকাণ্ডের ফলে তাদের প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতিকে ধ্বংস হতে দেখেছে। প্রতিনিধিদের কথা শুনতে শুনতে আমি ভাবলাম যে, এ ধরনের বৈঠকের সংবাদ মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোতে প্রচারিত হলে মার্কিন নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? নিঃসন্দেহে তারা এটাকে ভাল ভাবে মেনে নেবে না।

বৈঠকের আলোচনা পর্বগুলো ছিল আকর্ষণীয়। এসব পর্বে যেসব তথ্য জানতে পেরেছিলাম সেগুলো ছিল রীতিমত চমকপ্রদ। কিন্তু আনুষ্ঠানিক আলোচনাগুলোর বাইরে যেসব অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ঘটেছিল সেগুলো ছিল একেবারেই খোলামেলা। দুপুরের ও রাতের খাবার খাওয়ার সময় আমরা একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথাবার্তা বলেছি। এ সময় প্রতিনিধিরা কেন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে হুমকি দিচ্ছে সে কথা আমার কাছে জানতে চেয়েছে। অরণ্য শহর শেলে ইকুয়েডরের যেসব খবরের কাগজ পাওয়া যেত সেগুলোর প্রথম পৃষ্ঠাতে প্রায়ই আসন্ন ইরাক যুদ্ধের খবর থাকত। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমের চেয়ে ইকুয়েডরের সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে পৃথক ছিল। ইকুয়েডরের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম সংস্থায় বুশ পরিবারের মালিকানার তথ্যগুলো প্রচারিত হতো। হ্যালিবার্টনের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারূপে ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড চেনির ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা হতো। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সযত্নে এসব বিষয়কে এড়িয়ে চলতো।

বিরতির সময়গুলোতে প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা তাদের অশিক্ষিত সতীর্থদের খবরের কাগজগুলো পড়ে শোনাতো। সেই সময়ের প্রধান আকর্ষণই ছিল ইরাক প্রসঙ্গ। সবাই এই ইস্যুর সর্বশেষ খবরটি বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইতো। নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে কথা বার্তা বলতো। আর ফাঁক পেলেই আমাকে এ সম্পর্কে হাজার রকমের প্রশ্ন করতো। আমাজান অববাহিকার বৃষ্টিজ অরণ্যের গহীনতম অংশের এক নামকাওয়াস্তে শহরে একদল বুনো অসভ্য বর্বর লোকের মাঝে আমি বসে রয়েছি। অথচ ইরাক ইস্যু সম্পর্কে তারা যেসব বোখাচোখা প্রশ্ন করছে সেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে রীতিমত আমার কপালে ঘাম বেরুচ্ছে। আসলে তারা এসব প্রশ্নের মাধ্যমে বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্বরূপকে বোঝার চেষ্টা করছে। সেই সাথে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত তাও ঠিক করতে চাইছে।

বৈঠক শেষে আমি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলাম শেল থেকে। পানি বিদ্যুৎ বাঁধের পাশ দিয়ে উঠে এলাম আন্দিজের উঁচু নিচু পাহাড়ি পথে। গাড়ি চালানোর সময়ে ইকুয়েডরে এবার যা দেখলাম ও শুনলাম তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যা দেখতে ও শুনতে অভ্যস্ত তাকে তুলনা করলাম। আমাজানের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো এখনও আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পারে। অথচ আমরা বিশ্বসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছি। বিশ্বসেরা সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোকে নিয়মিত ভাবে পড়ছি। প্রতিদিন বিশ্বসেরা টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর নানা রকম প্রোগ্রাম দেখছি। তারপরও আমাজানের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে বেশী সচেতন। লাতিন আমেরিকায় কাজ করার সময় আমি বহুবার 'কনডোর শকুন ও ঈগলের ভবিষ্যদ্বাণী' শুনেছি। একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বের অন্যান্য অংশেও আমি শুনতে পেয়েছি।

যে কয়টি সংস্কৃতির সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে সেগুলোর সবক'টিই আমাকে একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে গোটা মানব জাতি এক অভিনব পরিবর্তনের যুগে প্রবেশ করবে। এ কথা আমি হিমালয়ের সুউচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গগুলোতে অবস্থিত

মঠগুলোর শ্রমণদের, ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শামানদের, উত্তর আমেরিকার সংরক্ষিত এলাকার গুনিনদের, আমাজানের গভীরতম অঞ্চল থেকে আন্দিজের সুউচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত বসবাসকারী শকুনদের ও মধ্য আমেরিকার প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর উত্তরসূরীদের মুখ থেকে শুনেছি। আমরা মানব সভ্যতার এক ক্রান্তি লগ্নে অবস্থান করছি। আমাদের জন্মই হয়েছে এই ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব পালনের জন্য।

এসব ভবিষ্যদ্বাণীর শিরোনাম ও শব্দগুলো অঞ্চল ভেদে একেক রকম। এগুলোর শিরোনামগুলো হচ্ছে নয়া যুগ, তৃতীয় সহস্রাব্দ, কুম্ভের যুগ, পঞ্চম সূর্যের সূচনা, পুরোনো যুগপঞ্জির বিদায় বা নয়া যুগপঞ্জির আবির্ভাব। নানারকম শিরোনাম সত্ত্বেও সেব ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বক্তব্য একই। সেই সাথে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীতে শকুন ও ঈগলের কাহিনী রয়েছে। মানব সভ্যতার আদিম যুগে মানব সমাজগুলো দু'টি পথকে বেছে নিয়েছিল। প্রথম পথটি হচ্ছে শকুনের পথ। এটি হচ্ছে আবেগ, অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয়বাদের পথ। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে ঈগলের পথ। এটি হচ্ছে বুদ্ধি, যুক্তি ও বস্তুতান্ত্রিকতাবাদের পথ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই মতের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল। তখন ঈগলের ভয়াবহ আগ্রাসনের মুখে শকুন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঈগল ও শকুন আবারো মুখোমুখি হবে। তখন যদি তাদের মিলন ঘটে তাহলে এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যার কোন তুলনা নেই।

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নানা রকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। সবচেয়ে সহজ বিশ্লেষণ হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে দেশজ ঐতিহ্যের, বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের সাথে মানসিক উৎকর্ষতার ও উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতির সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটানোর কথা চিন্তা করা। কিন্তু এর আসল বক্তব্য সাধারণ ধারণাগুলোর চেয়েও অনেক বেশী গভীর। আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যখন আমরা নিজেদের ও আমাদের পৃথিবীকে বহু বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। এসব দৃষ্টিকোণকে পুঁজি করে আমরা নিজেদেরকে সচেতনতার উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করতে পারি। মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের বিবেককে জাগিয়ে তুলতে পারি।

নতুন সহস্রাব্দে মানুষ রূপে আমাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হলে, এর পরবর্তী সহস্রাব্দগুলোতে আমাদের লক্ষ্যকে স্থির করতে হলে, অতীতে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব কাজ করেছি, সেগুলোর উদ্দেশ্য ও পরিণতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর ঘুমিয়ে সময় কাটালে চলবে না। জেগে উঠে নির্মম বাস্তবতার মোকাবিলা করতে হবে। আমরা যারা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের নাগরিক তারা যেন নাটক, খেলা, লাভ-লোকসানের হিসাব ও শেয়ারবাজারের উত্থান-পতন নিয়ে সময় নষ্ট না করি। আমরা কী করছি, এতে আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কিনা, তা আমাদেরকেই নির্ণয় করতে হবে।

অন্ধ হলেও কিন্তু প্রলয় বন্ধ থাকে না।

অধ্যায়-৩৫
মুখোশ উন্মোচন

২০০৩ খ্রীস্টাব্দে ইকুয়েডর থেকে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। এর ক'দিন পরেই যুক্তরাষ্ট্র এক দশকের চেয়ে একটু বেশী সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ইরাককে দখল করল। এর আগে ইরাকে অর্থনৈতিকক ঘাতক ও শৃগাল দু'টি বাহিনীই ব্যর্থ হয়েছিল। তাই মার্কিন সামরিক বাহিনীর তরুণ যোদ্ধাদের ইরাকের মরুভূমিতে পাঠানো হলো মারতে ও মরতে। এই সামরিক অভিযান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটল। তবে তখন খুম কম মার্কিন নাগরিকই প্রশ্নটির গুরুত্বকে বুঝতে পেরেছিলেন। ইরাক দখল করার পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সৌদি আরবের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বজায় থাকবে? কোন কোন বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ইরাকের ভূগর্ভে সৌদি আরবের চেয়েও বড় জ্বালানী সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। এই ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে ইরাককে দখলের পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সৌদি আরবের গুরুত্ব কমে যাবে। সে ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের সাথে যে চুক্তি করেছিল সে চুক্তিকে মেনে চলার দরকার হবে না। এই চুক্তির সুবাদেই যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের অর্থকে পাচার করেছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। তখন সৌদি পরিবারের পরিণতি কী হবে?

পানামায় নরিয়েগার পতনের মতই ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে পাল্টে দেবে। নরিয়েগার পতনের পর আমরা পানামায় একটি পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে পানামা যোজক প্রণালীর উপরে আমাদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করেছি। এজন্য আমরা ওমর তোরিজো-জিমি কার্টার চুক্তিকে লঙ্ঘন করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। ঠিক তেমনি আমরা ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করব তখন কি আমরা ওপেককে ভেঙে ফেলতে পারব? আন্তর্জাতিক জ্বালানী বাজারে সৌদি আরব কি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে? কোন কোন পণ্ডিত প্রশ্ন করছিলেন যে, আমরা কেন আফগানিস্তান থেকে আল কায়েদা ও তালেবান বাহিনীকে নির্মূল করার পরিবর্তে আরেকটি সামরিক অভিযানের পেছনে শ্রম, সম্পদ ও সময় ব্যয় করছি? জ্বালানী সংস্থাগুলোর মালিক পরিবারগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চিত করার ব্যাপারটি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে? যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাককে পুনর্গঠনের নামে ইরাকের পেট্রোডলারকে পাচার করাই হচ্ছে দ্বিতীয় যুদ্ধের মূল লক্ষ্য?

এই অভিযানের আরেকটি সম্ভাব্য দিক হচ্ছে এই যে, ওপেক আন্তর্জাতিক জ্বালানী

বাজারে নিজের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে অন্যান্য পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে এর দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে এসব দেশ লাভবান হবে। এতে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মন্দাবস্থার শিকার হবে। কিন্তু শুরুতে একমাত্র আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো বাদে আর কেউই ব্যাপারটি বুঝতে পারবে না। অথচ এই মন্দাবস্থা গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। সেই সাথে দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেটোক্রেসি যে পদ্ধতিকে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে সেই পদ্ধতিটি অচল হয়ে পড়বে। আর এভাবেই ধ্বংস হবে বর্তমান বিশ্ব সাম্রাজ্য।

"চূড়ান্ত বিচারে বিশ্ব সাম্রাজ্য বহুলাংশে একটি নিয়ামকের উপরে নির্ভরশীল। বর্তমানে মার্কিন ডলার গোটা বিশ্বের একমাত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। আর এই মুদ্রাটি ছাপা হয় একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের টাকশালে। তাই আমরা এ কথাটি জেনেই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ দেই যে, ওইসব দেশ কোনদিনও ওইসব ঋণকে পরিশোধ করতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও চাই না যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো আমাদের দেওয়া ঋণগুলোকে পরিশোধ করুক। আর এই ঋণ পরিশোধ না করতে পারার ব্যাপারটি রীতিমত ভীতিপ্রদ। কেননা, ঋণ আদায় না করতে পারলে মহাজনের তহবিল ফুরিয়ে যাবে। যে পরিমাণ ঋণ খাতকদের কাছে পড়ে রয়েছে তার এক পয়সাও যদি আদায় না করা যায় তাহলে মহাজন অবশ্যই পথে বসে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ব্যবসাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না। যুক্তরাষ্ট্র নিজ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকশালে যে মুদ্রাটিকে ছাপায় তা বিশ্বের আর সব মুদ্রার মতো স্বর্ণমানের উপরে নির্ভরশীল নয়। বরঞ্চ মার্কিন ডলারের ভিত্তি হচ্ছে দু'টি। এক. গোটা বিশ্ব মার্কিন অর্থনীতির শক্তিমত্তার উপরে আস্থাশীল। দুই. যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্ব থেকে সুলভে শ্রম ও সম্পদ আহরণ করে নিজের অর্থনীতিকে চালু রাখতে পারে। আর এটাই হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার প্রধানতম কারণ।

বিশ্বের একমাত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে ছাপানোর সক্ষমতা আমাদেরকে সুবিপুল শক্তির অধিকারী করেছে। এর প্রথম সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা গোটা উন্নয়নশীল বিশ্বকে ইচ্ছেমত ঋণ দিয়ে সেই ঋণ আদায়ের কথা ভুলে যেতে পারি। দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা গোটা উন্নত বিশ্ব থেকে ইচ্ছেমত ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধের কথাও ভুলে যেতে পারি। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ কোটি ডলার। বছর শেষে তা বেড়ে গিয়ে ৭ লাখ কোটি ডলার হওয়ার কথা। অর্থাৎ প্রতি মার্কিন নাগরিক ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষে মাথাপিছু ২৪ হাজার মার্কিন ডলারের ঋণের বোঝা বহন করবে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের সিংহভাগই আহরণ করা হয়েছে এশিয়ার উন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে চীন ও জাপানের কাছ থেকে। চীন ও জাপান যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্য পণ্য, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, গাড়ি, কাপড়চোপড় ও ঘরোয়া যন্ত্রপাতি রফতানি করে যে অর্থ অর্জন করে সেই অর্থ দিয়ে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের

ঋণপত্রগুলোকে কেনে। দেশ দু'টি বাকি বিশ্বে ভোগ্য পণ্য রফতানি করে যে অর্থ অর্জন করে সেই অর্থ দিয়ে নিজেদের শিল্পখাতগুলোকে পরিচালনা করে।

যতদিন পর্যন্ত বিশ্ব মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা রূপে গ্রহণ করবে ততদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সুবিপুল জাতীয় ঋণ কর্পোরেটোক্রেসিকে বিব্রত করবে না। কিন্তু যদি অন্য কোন মুদ্রা আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে থাকে, যদি চীন ও চাপান তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। সেদিন প্রকৃত অর্থেই মার্কিন অর্থনীতিতে ধস নামবে।

বর্তমানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মুদ্রার উত্থান এখন আর তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নয়। ২০০২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইউরো আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে প্রবেশ করেছে। দিনে দিনে এর মর্যাদা ও ক্ষমতা বাড়ছে। যদি ওপেক যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে চায় বা ইরাককে দখলের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে চায় বা ইরাককে দখলের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়, তাহলে ইউরো ওপেকের জন্য সেই দরজা খুলে দিয়েছে। এমনকি ওপেক যদি মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ইউরোতে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলেই বিশ্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে উঠবে। যদি এ ঘটনা ঘটে, যদি আমাদের মহাজনদের কেউ ইউরোতে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেয়, তাহলেই আমরা বিপদে পড়ব।

২০০৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ছিল গুড ফ্রাইডে। সে দিন সকালে আমি এসব কথা চিন্তা করতে করতে বাড়ি থেকে সামান্য পথ হেঁটে আমার অফিসে গেলাম। একটি বড় গ্যারাজকে ড্রিম চেঞ্জের সদর দপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেদিন আমি অফিসে গিয়ে আমার ডেস্কে বসলাম। কম্পিউটার চালু করলাম। নিউইয়র্ক টাইমসের ওয়েব সাইটে ঢুকলাম। সাথে সাথে খবরের কাগজটির শিরোনাম আমাকে ধাক্কা মারল। "যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে পুনর্গঠনের দায়িত্ব বেখটেলকে দিয়েছে।" অমনি আমার মন থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, জাতীয় ঋণ ও ইউরোর কথা মুছে গেল। আমার মনে আমার অতীত কর্মজীবনের স্মৃতি ফিরে এলো।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "সান ফ্রান্সিসকোর বেখটেল গ্রুপকে বুশ প্রশাসন ইরাককে পুনর্গঠনের প্রথম বড় দায়িত্ব দিয়েছে।" প্রতিবেদনটিতে আরও লেখা হয়েছে। "ইরাকীরা নিজ দেশকে পুনর্গঠনের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সাথে কাজ করবে। এই দু'টি সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।"

ব্যাপক প্রভাব! এতো বাস্তব পরিস্থিতিকে গোপন করার দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র। আমি টাইমসের আরেকটি প্রতিবেদন পড়তে শুরু করলাম। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল "ওয়াশিংটন ও ইরাকের সাথে সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে।" আগের প্রতিবেদনের সাথে মিল ছিল বলে আমি দ্বিতীয় প্রতিবেদনের প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদকে এড়িয়ে গেলাম। এরপর নিচের অনুচ্ছেদটিকে পড়লাম ঃ

"বেখটেলের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দীর্ঘদিনের পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। সংস্থাটির

গভর্নিং কমিটির এক প্রভাবশালী সদস্য জর্জ পি শুলজ রেগান প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সংস্থাটির গভর্নিং কমিটির আরেক প্রভাবশালী সদস্য ক্যাসপার ডব্লিউ ওয়েনবার্গার রেগান প্রশাসনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। রেগান প্রশাসনে যোগ দেওয়ার আগে ওয়েনবার্গার ছিলেন বেখটেলের আন্তর্জাতিক প্রকল্প বিভাগের পরিচালক। এ বছর প্রেসিডেন্ট বুশ বেখটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিলে পি বেখটেলকে জাতীয় রফতানি পরিষদের সদস্য পদে নিযুক্ত করেছেন।"

এই অনুচ্ছেদটি অতি সংক্ষেপে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিস্তারের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩৫ বছর আগে ক্লডিন আমাকে যা শিখিয়েছিল, তিন দশক ধরে আমি ও আমার সতীর্থ অর্থনৈতিক ঘাতকেরা যা করেছি, বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবিধ পর্যায়ের কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারা যা করছে, ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে এসব কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত ফসল। নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদকে বাড়ানোর লক্ষ্যে আমি ও আমার পরবর্তী প্রজন্মের অর্থনেতিক ঘাতকেরা গোটা বিশ্বকে কর্পোরেটোক্রেসির জোয়ালে আটকে দিয়েছি। এখন বিশ্ব সাম্রাজ্যের দাসত্ব করা ছাড়া বাকি বিশ্বের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

"এসব প্রতিবেদন লেখা হয়েছিল ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে। এই অভিযান শেষ হওয়ার পর মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরাকে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তা থেকে ইরাককে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই পুনর্গঠনের সময় ইরাককে আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের আদলে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর এই পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্কিন প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থাগুলোকে। এই প্রক্রিয়া ছিল গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে সৌদি আরবকে পুনর্গঠনেরই প্রতিচ্ছবি। গোটা বিশ্বে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম রফতানি করে সৌদি আরব যে অর্থ উপার্জন করেছিল সেই অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল দেশটিতে আধুনিক এক রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে। সৌদি আরবকে আধুনিকায়নের পুরো দায়িত্ব পেয়েছিল মার্কিন প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থাগুলো। এভাবেই সৌদি আরবের পেট্রো ডলার পাচার হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই এই পর্বের ইতি ঘটেনি। বরঞ্চ এর সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়ার সিংহভাগ মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। পাল্টে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রবাহ। সেই সাথে সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত মিত্রতে পরিণত হয়েছি। এভাবেই সৌদি আরবে সউদ পরিবারের শাসন দীর্ঘায়িত হয়েছে।

গোটা বিশ্বের খুব কম নাগরিকই এখন পর্যন্ত একটি নির্মম বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যদি সাদ্দাম হোসেন সউদ পরিবারের মতো একই ভূমিকা পালন করতে রাজি হতেন তাহলে ইরাকে তার শাসন দীর্ঘায়িত হতো। তখন তিনি তার পছন্দসই মিসাইল ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রগুলোকে নির্মাণ করতে পারতেন। কথা বলতে কি, তার বিশ্বস্ত আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র তাকে এসব মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা উপহার দিতো। এমনকি মার্কিন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা এসব কারখানাকে উন্নয়ন করার ও সচল

রাখার দায়িত্ব পালন করতেন। সেই সাথে ইরাককে একটি আধুনিক দেশ রূপে গড়ে তোলার পদক্ষেপও নেওয়া হতো। অবশ্য সবই হতো ইরাকের পেট্রো ডলারের বিনিময়ে। এক কথায়, সৌদি আরবের মতো ইরাকও হতো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস।

এতদিন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের মূলধারা এই নির্মম বাস্তবতাকে প্রচার করাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু এখন একটু একটু করে থলি থেকে বেড়াল বেরুতে শুরু করেছে। অবশ্য এটি হচ্ছে মহাসাগরে ডুবে থাকা হিমশৈলের চূড়াকে দেখার মতই। নিউইয়র্ক টাইমস বিশাল একটি প্রক্রিয়ার একাংশকে প্রচার করেছে মাত্র। তারপরও তা এক নির্মম বাস্তবতার মুখোশকে উন্মোচন করেছে। আমি ভাবলাম যে, নিউইয়র্ক টাইমস সম্ভবত দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছে। এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি সিএনএনের ওয়েব সাইটে ঢুকলাম। সেখানেও একই ধরনের শিরোনাম "বেখটেল ইরাককে পুনর্গঠনের দায়িত্ব পেয়েছে" দেখলাম। সিএনএনের প্রতিবেদনটি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনেরই প্রায় অনুলিপি। শুধু সিএনএনর প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ

"আরও কয়েকটি মার্কিন প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থা এক্ষেত্রে বেখটেলের সাথে কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হ্যালিবার্টন কর্পোরেশনের কেলোগ অ্যান্ড রুট কোম্পানি। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড চেনি ২০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হ্যালিবার্টন ইরাকের জ্বালানী স্থাপনাগুলেকে মেরামত ও পুনরায় চালু করার দায়িত্ব পেয়েছে। দুই বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পাদনের জন্য হ্যালিবার্টনকে ৭শ' কোটি ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।"

বিশ্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী একটু একটু করে হলেও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এই কাহিনীর পুরো বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে না। প্রকাশিত হচ্ছে না ঋণ প্রদান, ধোঁকাবাজি, দাসত্ব ও পোষণের বিয়োগান্ত নাটকগুলো। প্রকাশিত হচ্ছে না মানুষের হৃদয়, মন, আত্মা ও সম্পদ কেড়ে নেওয়ার শোকগাঁথাগুলো। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে ইরাককে যেভাবে দখল করা হলো তা যে পুরো সভ্যতার জন্য চরম লজ্জাজনক এক কাহিনী এ কথাটি এসব প্রতিবেদনে একবারও বলা হলো না। এমনকি সাম্রাজ্য বিস্তারের মতো প্রাচীন এই পদ্ধতির প্রয়োগ যে বর্তমান যুগে এক ভয়াবহ আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে সে কথাটিও এসব প্রতিবেদনে লেখা হলো না। বিশ্বায়নের এই যুগে এই সামরিক উচ্চারণ করা হলো না। তারপরও এসব প্রতিবেদনে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিশ্ব সাম্রাজ্যের স্বরূপ কিছুটা উন্মোচিত হলো।

এসব অনিচ্ছাকৃত প্রতিবেদন আমার মনকে নাড়া দিলো। আমার মনে সুপ্ত অপরাধবোধ আবার জেগে উঠল। দীর্ঘদিন যাবৎ এই কাহিনীকে চেপে রাখার কারণে আমি তীব্র অনুশোচনায় জর্জরিত হলাম। আমি তো শুরু থেকেই জানি যে, আমি যা করছি তা এক ঘোরতর অন্যায়। এজন্য একদিন আমাকে নিজ বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তারপরেও আমি নানা অজুহাতে এ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি। অথচ শুরু

থেকেই আমি নিজ কাজের সততা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম। গোড়া থেকেই আমার মনে এক সূক্ষ্ম অপরাধবোধ কাজ করেছে। ক্লডিনের অ্যাপার্টমেন্টে এই সন্দেহ ও পাপবোধের জন্ম হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া সফর করার সময় এগুলো পাকাপোক্তভাবে আমার মনোজগতের বাসিন্দায় পরিণত হয়েছিল। এরপর এগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করেছে।

নিজ কাজের সততা সম্পর্কে সন্দেহ, বেদনা ও অপরাধবোধ আমাকে প্রতিক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল বলেই আমি এই জগত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। যদি অন্যদের মতো আমার বিবেকও ঘুমিয়ে থাকত তাহলে আমি এতদিনে এই জগতের শীর্ষে আরোহণ করতে পারতাম। তাহলে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের একটি সৈকতে দাঁড়িয়ে আমি মেইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতাম না। কিন্তু ওই অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার এতদিন পরেও আমি নিজের পাপকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিনি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

প্রতিবেদনগুলো থেকে বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সরকার, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ জোট গঠনের ব্যাপারটি বুঝতে পারা সম্ভব। কিন্তু মেইন থেকে প্রকাশিত আমার অর্ধসত্য জীবন বৃত্তান্তের মতই এসব প্রতিবেদন বিশ্বব্যাপী এক কর্মপ্রবাহের উপরিভাগকে স্পর্শ করেছে মাত্র। এর গভীরে প্রবেশ করেনি। এসব প্রতিবেদন পড়লে ইরাকের অর্থে পশ্চিমা বিশ্বের আদলে দেশটিকে পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থাগুলো শতকোটি ডলার পারিশ্রমিক পাবে এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এ কাজে ইরাকের জনগণের সম্মতি রয়েছে কিনা তা এসব প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় না। সেই সাথে পুরো প্রক্রিয়াটিই যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহলের ক্ষমতার অপব্যবহার এ কথাটিও এসব প্রতিবেদন থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। অথচ গত শতাব্দীর শুরু থেকেই মার্কিন সরকারের শীর্ষতম ব্যক্তিত্বরা নানাভাবে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন।

প্রতিবেদনগুলোতে যে সব কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো খুবই সহজ ও সরল। আমরা যদি এসব কাহিনীর গতিপ্রকৃতিকে সংস্কার করতে চাই তাহলে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের ক্ষমা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। এ ধরনের সোজাসাপটা সংস্কার কর্ম প্রায়ই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের উপরে নির্ভরশীল। প্রথমে ক'দিন এ নিয়ে তুমুল হৈচৈ হলেও পরে আস্তে আস্তে সবই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমাদের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। যে কোন দুর্নীতিকে তদন্ত করার ভার একটি তদন্ত কমিশনের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ ফাঁকে দুর্নীতিবাজরা কোন না কোন ভাবে রেহাই পায়। তাই আমরা অপেক্ষা করি পরবর্তী নির্বাচনের জন্য। এতে সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও দুর্নীতি বহাল তবিয়তে বজায় থাকে।

বর্তমান বিশ্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি হচ্ছে কর্পোরেটোক্রেসি। অন্যদিকে কর্পোরেটোক্রেসি

গঠিত হয়েছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সরকার, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর ঐক্যজোটের মাধ্যমে। এই ঐক্যজোট উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোকে শোষণ করছে। গোটা বিশ্বের সম্পদ সম্ভারকে অবাধে আহরণ করছে। এই সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম, স্বার্থপর ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের বিবরণ সে দিনের খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আমরা যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলাম বা রয়েছি তারা এর স্বরূপকে ভালভাবেই চিনি। আমরা কখনই কোন ঘটনার প্রকৃত বিবরণ শুনতে পছন্দ করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, হাজার হাজার বছরের সামাজিক বিবর্তনের কারণে একটি আদর্শ অর্থনৈতিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু আমাদের এই ধারণা স্রেফ একটি কল্পকাহিনী মাত্র। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমরা একটি ভুল তত্ত্বের প্রলোভনে আটকে গিয়ে একে অন্ধভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণ করছি। আমরা মনে করছি যে, সব ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নই মানব জাতির জন্য সুফল বয়ে আনে। আর উন্নয়নের পরিধি যত বেশী হয় ততবেশী এর সুফল ছড়িয়ে পড়ে। এই তত্ত্ব প্রয়োগের ফলাফল আইনগতভঅবে বৈধ ও নীতিগতভঅবে সঠিক এ কথাটি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখেন তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। আর যারা উন্নয়নের গণ্ডির বাইরে থাকবে তাদেরকে শোষণের শিকার হতে হবে।

এই তত্ত্ব ও এর অনুসিদ্ধান্তগুলোকে সব ধরনের বর্বরতাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার কাজে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইরান, পানামা, কলাম্বিয়া ও ইরাকসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণহারে হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণ করার ঢালাও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক ঘাতক, শৃগাল ও সামরিক বাহিনীগুলোর সদস্যদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রধানতম যুক্তি হচ্ছে এই যে, তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূত্রপাত ঘটায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, এরা প্রায়ই যুক্তিটিকে হাতেকলমে প্রমাণ করে। অর্থনৈতিক পূর্বাভাষ ও পরিসংখ্যানের মতো পক্ষপাতদুষ্ট বিজ্ঞানগুলোর বদৌলতে যুক্তিটিকে প্রমাণ করা খুবই সহজ একটি ব্যাপার। ধরা যাক, যুদ্ধের কারণে একটি শহর পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শহরটিকে পুনর্গঠন করা হলো। যুদ্ধ ও এর পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমরা মিথ্যার জগতে বাস করছি। মেইন আমার যে জীবনী প্রচার করেছিল এর মতই আমরা একটি মুখোশ তৈরি করেছি। এই মুখোশের আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে ভয়াবহ অবক্ষয়গুলো। আমাদের জাতীয় পরিসংখ্যানগুলোতে চোখ বুলালেই অবক্ষয়গুলোর ভয়াবহতাকে বোঝা যাবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যে আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্যের সেবন, বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশু উৎপীড়ন, ধর্ষণ ও হত্যা করার হারগুলো বিপজ্জনক গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সারের মতো এসব অবক্ষয় পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে। এ জন্য আমরা হৃদয়ে বেদনা অনুভব করি। আমরা পরিবর্তনের দাবি জানাই। অথচ আমরা মুখে হাত চাপা

দিয়ে নিজেদের কণ্ঠরোধ করি। এভাবেই বাকি বিশ্বের কাছে আমরা অপরিচিত থাকি।

সবচেয়ে ভাল হতো যদি আমরা পুরো ব্যাপারটির জন্য ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে দায়ী করতে পারতাম। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। বিশ্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি হচ্ছে কর্পোরেটোক্রেসি। আর কর্পোরেটোক্রেসির তিন উপাদান হচ্ছে সরকার, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক সংস্থা। কিন্তু কর্পোরেটোক্রেসি কোন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের ফসল নয়। আমরা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ঘাতকেরা কর্পোরেটোক্রেসির এক বড় চালিকাশক্তি। তাই আমাদের পক্ষে কর্পোরেটক্রেসির বিরোধিতা করা কখনই সম্ভব হয় না। কেননা, আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে কাজ করি। আমরা বহু গোপন নাটকের সক্রিয় অভিনেতা। গোপনয়িতা রক্ষার বিনিময়ে আমরা বহু সুযোগ সুবিধাকে উপভোগ করি। তাই যে হাত আমাদের খাওয়ায় সে হাতকে দংশন করার মতো দুঃসাহস আমাদের নেই।

কম্পিউটারের পর্দায় খবরের কাগজের শিরোনামগুলো দেখতে দেখতে আমি এসব কথা চিন্তা করছিলাম। এই চিন্তা থেকে আমার মনে কতকগুলো প্রশ্ন জন্ম নিল। কর্পোরেটক্রেসি আমাকে বাড়ি, গাড়ি, পোশাক, খাবার, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। আবার একই সাথে এই প্রক্রিয়ার কারণে প্রতিদিন ২৪ হাজার লোক খাবারের অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। এই প্রক্রিয়ার নীতিগুলোর কারণে বিশ্বের লাখ লাখ লোক যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করছে। আমার একার পক্ষে কি এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব? পুঁজিবাদী অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক শক্তিকে গোটা বিশ্বের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। অথচ এই অর্থনীতি বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোকে আরও দরিদ্র বানিয়েছে। মার্কিন নাগরিকগণ এই অর্থনীতিকে অন্ধের মতো বিশ্বাস ও অনুসরণ করছে। তাহলে আমি একা কিভাবে এই অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব? ধীরে ধীরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। হেঁটে গিয়ে কফি মেশিন থেকে কাপে কফি ঢাললাম।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বেরিয়ে এলাম অফিসের বাইরের বাগানে। হাঁটতে হাঁটতে প্রধান ফটকের পাশের ডাক বাক্স খুলে পামবিচ পোস্টের সে দিনের সংখ্যাটিকে হাতে নিলাম। এই খবরের কাগজের প্রধান প্রতিবেদন রূপে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রধান প্রতিবেদনটিকে হুবহু ছাপানো হয়েছে। চোখ তুলে পামবিচ পোস্টের মাস্টহেডের তারিখটিকে দেখলাম। আজ ১৮ই এপ্রিল। একটি একটি বিখ্যাত দিন, বিশেষ করে নিউ ইংল্যাণ্ডের জন্য। আমার মা-বাবার মুখে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানারকম গল্প শুনে আমি ছোট বেলা থেকেই এই দিনটিকে ভালবেসেছি। এরপর বড় হয়ে লঙফেলোর কবিতাগুলো পড়ে এই ভালবাসা একেবারে চিরস্থায়ী হয়েছে। তার একটি কবিতার প্রথম স্তবক হচ্ছে ঠিক এ রকম ঃ

"ওগো আমার সোনামনিরা, তোমরা আজ শুনবে

পল রিভেরের মধ্যরাতের অভিযান কাহিনী,

দিনটি ছিল ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল,

সেদিনের একটি লোকও আর বেঁচে নেই আজ

যারা এই বিখ্যাত দিনটির কাহিনী শোনাবে।"

এ বছর পল রিভেরের অভিযান দিবসেই গুড ফ্রাইডে পড়েছে। পামবিচ পোস্টের মাস্টহেডে তারিখটি দেখেই আমার মনে পড়েছে দিবসটি সম্পর্কে ছোটবেলায় শোনা কাহিনীগুলো। নিউ ইংল্যাণ্ডকে দখল করার জন্য মধ্যরাতের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে বৃটিশ অশ্বারোহী বাহিনী। দুর্ঘটনাক্রমে তা দেখে ফেলে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে টুপি দুলিয়ে চিৎকার কতে করতে ছুটলো রূপার গয়না বিক্রেতা পল রিভের। "বৃটিশরা আসছে।" তার এই চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে এলো স্বাধীনতাকামী আমেরিকানরা। মরণপণ লড়াই করে হটিয়ে দিল বৃটিশ বাহিনীকে। সেদিন মৃত্যুর ঝুঁকিকে উপেক্ষা করেছিল বলেই আজ পল রিভের ইতিহাসের নায়ক। সেদিন আমেরিকানরা বিশ্ব সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল বলেই আমরা স্বাধীন।

আমি চিন্তা করলাম যে, কী ছিল তাদের অনুপ্রেরণা? কেন সেদিনের আমেরিকানরা সে যুগের বিশ্ব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল? যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তাদের সাথে ব্রিটিশ রাজ্যের ঘনিষ্ঠতম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। তাহলে তারা কেন জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন? নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকেরই প্রবল ব্যক্তিগত কারণ ছিল। সেই সাথে এমন একটি প্রবল অনুঘটক ছিল যা প্রতিটি প্রবল ব্যক্তিগত কারণকে ঐক্যবদ্ধ করে বিদ্রোহের দাবানলে পরিণত করেছিল।

এই অনুঘটকটি হচ্ছে ভাষা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থপর বাণিজ্যিক নীতির ধ্বংসাত্মক কাহিনীগুলো প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করল। টমাস পেইন ও টমাস জেফার্সনের শক্তিশালী কলম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচিত করে আমেরিকানদের মনের মধ্যে স্বাধীনতার বীজকে বপন করলেন। আমেরিকানরা ব্রিটিশদের ধোঁকাবাজিকে ভেদ করে প্রকৃত বাস্তবতাকে দেখতে শুরু করল। তারা বুঝতে পারল যে, ব্রিটিশরা এতদিন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদেরকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেছে।

আমেরিকানরা বুঝতে পারল যে, ব্রিটিশরা গোটা বিশ্বকে শোষণের এক নির্মম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এরপর খুবই সুন্দর এক মিথ্যাকে তৈরি করে এর ভেতরে শোষণের পদ্ধতিটিকে লুকিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রচার করত যে, তাদের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে মানব সভ্যতার সেরা শাসন পদ্ধতি। ইংল্যাণ্ডের রাজার মাধ্যমে সম্পদ বিনিময় করাই হচ্ছে উন্নয়ন সাধনের সঠিক পন্থা। রাজনীতি ও বাণিজ্য পরিচালনার রাজকীয় নীতি বিশ্বের সিংহভাগ লোকের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। আসলে ব্রিটিশ পদ্ধতি স্বল্পসংখ্যক লোককে ধনী ও সিংহভাগকে দরিদ্র করেছে। এই মিথ্যা প্রচার ও নির্মম শোষণ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এরপর দার্শনিক, লেখক ও বাগ্মীরা জেগে উঠলেন। তাদের নির্ময় সত্য ভাষণের কষাঘাতে সাধারণ মানুষেরা জেগে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

আমি দ্বিতীয়বার কফির কাপ ভরার সময় ভাষার শক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলাম। অফিসে ফিরে এসে কম্পিউটারের সামনে বসলাম।

সিএনএনের ওয়েব সাইটটাকে বন্ধ করলাম। রাতে আমি যে লেখাটি লিখছিলাম সেই ফাইলটি খুললাম। এর শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখেছিলামঃ

"এই কাহিনীটি প্রকাশ করতেই হবে। আমরা এক ভয়াবহ সঙ্কট ও অভূতপূর্ব সুযোগের সন্ধিক্ষণে বাস করছি। এই অর্থনৈতিক ঘাতকের কাহিনী হচ্ছে সেই কাহিনী যা জানাবে যে, আমরা যে পর্যায়ে রয়েছি সেই পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছেছি ও কিভাবে আমাদের সামনে অলঙ্ঘনীয় সমস্যার প্রাচীরগুলো তৈরি হয়েছে। অতীতে আমরা যেসব ভুল করেছি সেগুলো থেকে শিক্ষা নিলে আমরা ভবিষ্যতের সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি দেশ গোটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে পাল্টানোর মতো সক্ষমতা, অর্থ ও শক্তির অধিকারী হয়েছে। এই দেশে আমি জন্মেছিলাম। এই দেশের অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। দেশটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।"

আর আমি থামবো না। আমার জীবনের বিচিত্র সমানুপতনগুলো ও এগুলোর প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া আমাকে এ পর্যায়ে এনেছে। এখান থেকে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হব।

আমি আবারও নিউ ইংল্যাণ্ডের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটে নিঃসঙ্গ ওই ঘোড়সওয়ারটির কথা ভাবলাম। কী এক ভয়ংকর ঝুঁকিকে মাথায় নিয়ে তিনি সেদিন তার দেশবাসীদের জাগিয়ে তুলেছিলেন। রূপার কারবারীটি নিশ্চয় গোপন সমিতিগুলোর প্রচারপত্রগুলোকে পড়তেন। টমাস পেইন ও টমাস জেফার্সনের উত্থানেরও বহু আগে থেকে এসব প্রচারপত্র আমেরিকানদের একটু একটু করে জাগিয়ে তুলছিল। ঘরে-বাইরে সবখানেই মৃদু গুঞ্জন হয়েছিল। এরপর টমাস পেইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচারের নির্মম কাহিনীগুলোকে প্রকাশ করলেন। তারপর টমাস জেফার্সন ঘোষণা করলেন, যে কোন দেশ ও জাতি নিজ নাগরিকদের জীবন, মৌলিক অধিকার ও সুখভোগের ইচ্ছাকে রক্ষা করতে বাধ্য। সবশেষে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মধ্যরাতে ঘোড়া ছুটানোর সময় পল রিভের বুঝেছিলেন যে, ভাষার জীয়ন কাঠির স্পর্শে নিশ্চয় আমেরিকানরা ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ লড়াই করবে।

ভাষার কী অপার মহিমা...

আমি আর নতজানু হব না। বহুবার বহুভাবে শুরু করা কাজটিকে এবার শেষ করব।

তাহলেই আমি নিজ বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পাব।

সর্বশেষ

আমরা এই কাহিনীর শেষ পর্বে এসে পৌছেছি। সেই সাথে এই পর্বটাকে নতুন কাহিনীর শুরু হিসেবেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। আপনারা হয়তো এরপর কোথায় যাবেন, কর্পোরেটোক্রেসির বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়াবেন, বিশ্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের উম্মত্ত ও আত্মধ্বংসী প্রক্রিয়াকে থামানোর জন্য কী করবেন তা ভাবছেন। বইটিকে বন্ধ করে আপনারা দুনিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

আপনারা কতক্ষণ আগে ইরাকে বেখটেল ও হ্যালিবার্টনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা পড়েছেন তা পুরো খবর হয়ে গেছে। এমনকি এখন এই খবরের গুরুত্ব ফুরিয়ে গেছে। তবে খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলোর গুরুত্ব শুধুমাত্র এগুলোর সমসাময়িক কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ওই অধ্যায়টিকে ঠিক মত বুঝতে পারলে আপনারা প্রতিদিন যেসব সংবাদ দেখেন, শোনেন ও পড়েন সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাবে। তখন আপনারা খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলোর মূল বক্তব্যটিকে বুঝতে পারবেন। রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতিটি সংবাদে ভাবার্থকে অনুধাবন করতে পারবেন।

বাইরে থেকে দেখলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতিকে বোঝা যায় না। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী হচ্ছে ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এনবিসি) মালিক। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এবিসি) মালিক হচ্ছে ডিজনি। ভায়াকম হচ্ছে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের (সিবিএস) মালিক। আর ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন) হচ্ছে আমেরিকা অন লাইন টাইম ওয়ার্নার গ্রুপের একটি অংশ। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আমাদের অধিকাংশ খবরের কাগজ, সাময়িকী, প্রকাশনা সংস্থা, রেডিও ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কের মালিক। আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো কর্পোরেটোক্রেসিরই অংশ। যেসব ব্যক্তি আমাদের সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন তারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল। তারা সব সময়ই কর্পোরেটোক্রেসিকে চিরস্থায়ী, শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এ কাজে তারা রীতিমত দক্ষ ও অভিজ্ঞ। যখন তাদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা হয় তখন তারা নির্মম হয়ে উঠেন। তাই মুখোশের আড়ালে যে কুৎসিৎ মুখ লুকিয়ে রয়েছে একে দেখার ও দেখানোর দায়িত্ব আপনাদের উপরেই বর্তেছে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলুন। পরিচিতদের মাঝে কথা ছড়িয়ে দিন।

আমি আপনাদেরকে কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিতে পারি। জ্বালানী ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ইরাক যুদ্ধের আগে আমরা ৮০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করতাম। ২০০৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের আগে আমরা ১ কোটি ২০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম

আমদানি করেছি। এরপর যখন আপনার মাথায় কেনাকাটা করার চিন্তা চাপবে তখন বই পড়ুন, ব্যায়াম করুন বা সংসারের কাজ করুন। আপনার বাড়ি, অফিস ও গাড়িসহ জীবনের সকল চাহিদাকে কমিয়ে ফেলুন। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। যেসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বের দরিদ্র্যতম জনগোষ্ঠীগুলোকে শোষণ করছে সেগুলোর পণ্য সামগ্রী বর্জন করুন। যেসব সংস্থা গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করছে সেগুলোকে বয়কট করুন।

আমি আপনাদেরকে সুন্দর সব কথা শোনাতে পারতাম। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোর ভাগ্যোন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সরকার, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্পোরেটোক্রেসিকে গড়ে তোলে নি। যে সব ব্যক্তি সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের মানসিকতায় কোন কলুষকতা নেই। যেসব সমস্যা আমাদেরকে জর্জরিত করেছে সেসব বিদ্বেষপরায়ণ প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগুলোর ফসল নয়। বরঞ্চ তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্তিজনক ধারণাগুলোর ফসল। আমাদের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডে কোন ত্রুটি নেই। এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলোতে ত্রুটি রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত যোগাযোগ ও সরবরাহ নেটওয়ার্কগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা ইতিবাচক ও সহমর্মী পরিবর্তনগুলো ঘটাতে পারতাম। নাইকে, ম্যাকডোনাল্ড ও কোকাকোলার মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে ইচ্ছা করলেই পুরো বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীগুলোর কতকগুলো মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই চিন্তাটি চাঁদে মানুষ পাঠানোর, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙার বা গোটা বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালানোর চিন্তাগুলোর মতই বাস্তব সম্মত। শিক্ষা, সক্ষমতায়ন ও চিন্তা-কর্মের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে আপনারা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। আপনাদের চিন্তা ও কাজ অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হবে।

এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যেগুলো আপনার জীবনকে প্রভাবিত করবে। যে কোন ফোরামেই কথা বলার সুযোগ পেলে দ্বিধাহীনভাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগান। যে কোন পত্রিকায় ও সাময়িকীতে প্রবন্ধ ও চিঠি লিখে পাঠান। যে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানে টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রশ্ন করুন, নিজের মতামত জানান। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের নির্বাচনে জনপ্রিয় দলকে নয়; যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন। অহেতুক কেনাকাটা থেকে বিরত থাকুন।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে শুয়াররা আমাকে যা বলেছিল তা আবারও আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা যে রকম পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, আমাদের পৃথিবী ঠিক সে রকমই। আমাদের পৃথিবী পরিবেশ দূষণকারী শিল্প, আমাদের পৃথিবী ঠিক সে রকমই। আমাদের পৃথিবী পরিবেশ দূষণকারী শিল্প, যানবাহনের জটে পরিপূর্ণ রাজপথ ও ঘনবসতিপূর্ণ

মহানগরী দিয়ে তৈরি। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে টেকসই ও সুষম পৃথিবীকে গড়ে তুলতে পারি। আমরা নিজেররাই নিজেদের চিন্তাচেতনাকে পাল্টাতে পারি। অনাগত প্রজন্মের জন্য নতুন ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি।

নতুন ও সুন্দর এক বিশ্বকে গঠনের জন্য এখন আমাদের হাতে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখন বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ও পানি রয়েছে। অতীতে যেসব রোগে লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করত বর্তমানে সেসব রোগের প্রচুর ওষুধ ও উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। এখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌছানোর মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। গোটা বিশ্বেই শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট পদ্ধতির উন্নতির সুবাদে বিশ্বের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন বিরোধকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য এতো আন্তর্জাতিক ফোরাম গড়ে উঠেছে যে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। এ যুগের প্রযুক্তি সুবিশাল মহাবিশ্ব ও ক্ষুদ্রতম পারমাণবিক শক্তিকে অনুসন্ধান করতে সক্ষম। বিশ্বের সকল নাগরিকের জন্য পরিবেশ সহায়ক ও কার্যকর নিবাস গড়ে তোলার গবেষণা চলছে। বিকল্প জ্বালানী উৎসগুলোকে ব্যবহারের প্রক্রিয়া গোটা বিশ্ব জুড়েই ছড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমান বিশ্বের সংকট ও সুযোগগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে আপনাদেরকে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্থানীয় পাঠাগারগুলোতে এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তির মতো বইগুলোকে অনেকে মিলে পড়ার ব্যবস্থা করুন।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনপ্রিয় বিষয়গুলোর উপরে উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলুন।

পরিচিতদের সাথে এ ধরনের বইপড়াসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা ভাবে মত বিনিময় করুন।

আপনারা হয়তো এসব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আগেই চিন্তা করেছেন। যে পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোন প্রসঙ্গে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে চান সেই পদ্ধতি ও প্রসঙ্গকে বেছে নিন। এই পদক্ষেপ আমাদের বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গীকারের অংশ। আমরা নিজেদের ও আমাদের প্রতিবেশীদের মানসিকভাবে জাগিয়ে তোলার অবিচল ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করব। আমরা অবশ্যই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মর্মকথাকে অনুধাবন করব। যে কোন সম্ভাবনার জন্য আমাদের মনের দরজাকে খুলে রাখতে হবে। প্রতিটি বিষয় সচেতনভাবে চিন্তা করতে হবে। অবশেষে ঠান্ডা সুস্থিরভাবে কাজে নামতে হবে।

এই বইটি কোন সমস্যার সমাধান নয়। বরঞ্চ এটি হচ্ছে একটি সহজ ও সরল

স্বীকারোক্তি। এটি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি যে বিশ্ব সাম্রাজ্যের এক অনুগত সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছিল। কর্পোরেটোক্রেসির এক অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে কাজ করেছিল। অঢেল সুযোগ-সুবিধাকে উপভোগের বিনিময়ে গোটা বিশ্বকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। প্রলোভন দেখিয়ে অন্যদের সত্তাকে কিনে নিয়েছিল। সবকিছু জেনেও নিজের লোভ ও স্বার্থপর চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। বিশ্বেও দরিদ্র্যতম জনগোষ্ঠীগুলোকে শোষণের ও পরিবেশকে দূষিত করার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশের নাগরিক রূপে সে জন্মগ্রহণ করেছিল। নিজ মা-বাবার দারিদ্র্যকে সে মেনে নিতে পারেনি। নিজ প্রশিক্ষকদের কথা শুনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বইগুলো পড়ে পূর্বসুরীদের পদাঙ্ককে অনুসরণ করে সে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার কর্মকাণ্ড গণহত্যা, পরিবেশ দূষণ ও সম্পদ পাচারের প্রক্রিয়াকে সচল রেখেছে। সে তার পরবর্তী প্রজন্মের অর্থনৈতিক ঘাতকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এটি আমার স্বীকারোক্তি।

আপনারা যে এই বইটির এ পর্যন্ত পড়েছেন তা থেকে একটি কথা বোঝা যায়। আমরা স্বীকারোক্তির সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা হলেও সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি আমার সাথে আপনাদের বেশ খানিকটা মিলও রয়েছে। আমরা হয়তো যার যার পথে চলেছি। কিন্তু আমরা একই রকমের গাড়ি ও জ্বালানী ব্যবহার করেছি। একই ধরনের রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়েছি। একই শ্রেণীর সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় চাকরি করেছি।

আমার কাছে এই স্বীকারোক্তি হচ্ছে আমার জেগে উঠার কাহিনী। আর সব স্বীকারোক্তির মতই এটি হচ্ছে নিজেকে উদ্ধার করার প্রথম পদক্ষেপ।

এখন আপনাদের পালা। আপনাদেরও নিজ বিবেকের কাছে স্বীকারোক্তি করা উচিত। আপনাদের পারিবারিক অতীত কী ছিল, কিভাবে আপনারা এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, কেন আপনারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড বজায় রাখছেন, আপনারা কি নিজেদের জীবনধারা সম্পর্কে সন্তুষ্ট, আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে - সব মিলিয়েই আপনারা আপনাদের স্বীকারোক্তিকে তৈরি করবেন। এটি আপনাদেরকে এক অনাবিল প্রশান্তি উপহার দেবে। সেই সাথে আপনারা নিজ বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পাবেন।

এই বইটি লেখার অভিজ্ঞতা আমার জন্য ছিল অপরিসীম কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের মতো। কখনও কখনও আমি এতো পরিষ্কার ভাষায় এতটা নির্মম সত্য কথা বলতে ভয় পেয়েছি। তারপরও শত কষ্ট, যন্ত্রণা ও ভয়কে জয় করে আমি বইটিকে লেখার কাজ শেষ করেছি। এতদিন মনের ভেতরে জমে থাকা কথাগুলোকে বলতে পেরে এখন নিজেকে হালকা মনে হচ্ছে। এখন আমার মতো পরিতৃপ্ত মানুষ এই পৃথিবীতে খুব কমই রয়েছে।

আপনারা নিজেদেরকে ক'টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। আপনারা কি স্বীকার করবেন? আপনারা কি কখনও অন্যদেরকে ঠকিয়েছেন? আপনারা কোথায় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছেন? কেন আপনারা একটি দুর্নীতিপরায়ণ পদ্ধতিতে যোগদান করেছেন? কি কারণে

আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপত্তাহীন করছেন? অপ্রয়োজনীয় ক্ষুধা ও ১১ই সেপ্টেম্বরের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য আপনারা কোন ধরনের নীতি প্রণয়ন করেছেন? যারা ক্ষমতাবান ও বিলাসবহুল জীবনযাপনকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যে উচিত নয় এ কথাটি কি আপনারা আপনাদের সন্তানদের কখনও বলেছেন? আপনারা কি কখনও আপনাদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছেন? নিজেরা শিখতে ও অন্যদেরকে শেখাতে আপনারা কোন শ্রেণীর ফোরামকে বেছে নিয়েছেন?

এগুলো হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের মতো করে পরিস্কার ভাষায় এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া। পেইন ও জেফার্সনসহ সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এখনও তাদের কথা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। যারা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কোন কিছুকে পরোয়া না করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, গৃহযুদ্ধের সময় যারা দাসদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি ও ফ্যাসিজমকে রোধ করার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তারা সবাই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। যারা এসব ঘটনার সময় বাড়িতে থেকে খাবার, কাপড়-চোপড় ও নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাদের মতো লড়াই করেছেন। এসব ব্যক্তি কিন্তু আমাদের মতই অতি সাধারণ মানুষ।

এ সময় আমাদের। আমাদের প্রত্যেককে যুদ্ধের ময়দানে জমায়েত হতে হবে। এরপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে। তারপর সঠিক জবাব দেওয়ার আগে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। অবশেষে ময়দানে নামতে হবে।

আপনাদের জীবনের সমানুপতনগুলো সম্পর্কে আপনাদের প্রতিক্রিয়া আপনাদেরকে এ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

= সমাপ্ত =

এক নজরে জন পার্কিন্স

১৯৪৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যাণ্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ।

১৯৬৩ এ লেভেল পরীক্ষায় পাস করে মিডলবারি কলেজে ভর্তি।

১৯৬৪ এক ইরানী জেনারেলের ছেলে ফরহাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মিডলবারি কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার।

বোস্টনের হার্স্ট সংবাদপত্রের চাকরি গ্রহণ।

১৯৬৭ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা কলেজে ভর্তি মিডলবারি কলেজের প্রাক্তন সহপাঠিকে বিয়ে। স্ত্রীর বাবার বন্ধু "আংকল ফ্র্যাঙ্ক" ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর (এনএসএ'র) একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা।

১৯৬৮ এনএসএ (NSA)তে একজন আদর্শ অর্থনৈতিক ঘাতক রূপে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ। আংকল ফ্র্যাঙ্কের কথায় পীস কোরের চাকরি নিয়ে ইকুয়েডরের আমাজান অরণ্যাঞ্চলে গমন। এখানে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

১৯৬৯ আন্দিজ পর্বতমালার বৃষ্টিজ অরণ্যাঞ্চলে বাস। এখানে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর প্রতারণামূলক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। যেভাবে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাচীন সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে তা নিজ চোখে দেখতে পেলেন।

১৯৭০ ইকুয়েডরে আন্তর্জাতিক কনসালটিং ফার্ম মেইন (MAIN)-এর ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচিত হলেন। ভদ্রলোক এনএসএ'র একজন লিয়াজোঁ অফিসার।

১৯৭১ মেইনে যোগদান। অর্থনৈতিক ঘাতকের গোপন প্রশিক্ষণ লাভ। ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের কনিষ্ঠতম সদস্যরূপে ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপে গেলেন। মিথ্যা অর্থনৈতিক পূর্বাভাষ তৈরি করবার কারণে মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হলেন।

১৯৭২ প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করার সুবাদে প্রধান অর্থনীতিবিদ পদে পদোন্নতি পেলেন। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারাসহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে পরিচিত হলেন। পানামায় এক

বিশেষ মিশনে গেলেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোর সাথে উষ্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারলেন। ওমর তোরিজো যে পানামা যোজক প্রণালীর মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পানামার কাছে হস্তান্তর করতে চাইছেন তাও শুনতে পারলেন।

১৯৭৩ ঝড়ের গতিতে কর্মজীবনের উন্নতি ঘটল। মেইনের ভেতরে নিজের একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। পানামায় তার মিশন অব্যাহত থাকল। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে কাজ শুরু করলেন। এই সুবাদে এসব অঞ্চলে বহুবার সফর করলেন।

১৯৭৪ সৌদি আরবে অর্থনৈতিক ঘাতকদের সুবিপুল সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্র তৈরি করলেন। সউদ পরিবার গোটা বিশ্বে জ্বালানী রফতানির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে মার্কিন ঋণপত্র কিনতে এবং এসব ঋণপত্রের লভ্যাংশ দিয়ে সৌদি আরবের ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়নের জন্য মার্কিন প্রকৌশল ও নির্মাণ সংস্থাগুলোকে ভাড়া করতে রাজী হলো। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবে সউদ পরিবারের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিলো। পরবর্তী এক দশকে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানীসমৃদ্ধ দেশগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হলো। শুধুমাত্র ইরাক এই টোপ গিলতে রাজী হলো না।

১৯৭৫ মেইনের একশ' বছরের ইতিহাসে সংস্থাটির সবচেয়ে কম বয়সী অংশীদারে পরিণত হলেন। সেই সাথে অর্থনীতি ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের ম্যানেজার পদে পদোন্নতি পেলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অনেকগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন।

১৯৭৬ আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বহু অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কর্মকাণ্ডকে। পরিচালনা করলেন। ইরানের শাহেন শাহের কাছ থেকে বিশ্ব সাম্রাজ্যকে বিস্তারের পদ্ধতি সম্পর্কে বৈপ্লবিক শিক্ষা পেলেন।

১৯৭৭ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদে কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট সন্ত্রাসী ও মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের আসল কাহিনীগুলো জানতে পারলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা হচ্ছে মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী কৃষক সম্প্রদায়। সেই সাথে দেশটির যুবক সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ আদর্শগত কারণে এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে।

১৯৭৮ ফরহাদের সাথে ইরান থেকে পালিয়ে গেলেন। রোমে পরিচিত হলেন ফরহাদের বাবার সাথে। তিনি ইরানের শাহেন শাহের আসন্ন পতনের পূর্বাভাস জারি করলেন। সেই সাথে তিনি গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠার কথা বললেন। এজন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও ওই দেশগুলোর শাসকদের স্বৈরাচারী শাসনকে দায়ী করলেন। তিনি বললেন যে, মার্কিন নীতি ন্যায়সঙ্গত না হলে মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে উঠবে।

১৯৭৯ ইরানের শাহেন শাহ সপরিবারে দেশ ছেড়ে পালালেন। ইরানের একটি ছাত্র সংস্থা তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস দখল করে ৫২ জন মার্কিন কূটনীতিবিদকে জিম্মি করল। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য কলহের পর স্ত্রীকে তালাক দিলেন। বুঝতে পারলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিজের উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে।

১৯৮০ মানসিক অপরাধবোধ ও হতাশায় আক্রান্ত হলেন। বুঝতে পারলেন যে, অর্থ ও ক্ষমতা তাকে মেইনের চাকুরিতে আটকে রেখেছে। তাই পদত্যাগ করলেন।

১৯৮১ মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট হাইমে রোলদো ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজো বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করলেন। মৃত্যুর আগে রোলদো ইকুয়েডরের জ্বালানী সম্পদকে জাতীয়করণের বিল দেশটির সিনেটে পেশ করেছিলেন। অন্যদিকে ওমর তোরিজো পানামা যোজক প্রণালীর মালিকানা পানামার হাতে ফিরিয়ে আনার ও দেশটি থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ল্যাটিন আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমগুলোতে দু'টি মৃত্যুর জন্যই সিআইএকে দায়ী করা হলো। দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবা বেখটেলের প্রধান স্থপতি। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশগুলোতে নতুন শহরগুলোর নকশা প্রণয়নের কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করছেন। এই কর্মকাণ্ডের উৎস হচ্ছে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত সৌদি আরব-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি।

১৯৮২ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার সিস্টেম ইনকর্পোরেটেডকে (আইপিএস) প্রতিষ্ঠা করলেন। সংস্থাটি পরিবেশ সহায়ক উৎসগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মকাণ্ড শুরু করল। একমাত্র সন্তান জেসিকার জন্মগ্রহণ।

১৯৮৩-১৯৮৯ প্রাক্তন সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার সুবাদে আইপিএস অকল্পনীয় বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করল। আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও নিজের প্রাক্তন কর্মজীবন সম্পর্কে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হলেন। 'এক অর্থনৈতিক ঘাতকের বিবেক' নামের একটি বই লিখতে শুরু করলেন। কথাটি প্রকাশ হওয়া মাত্র তিনি স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা রূপে কাজ করার প্রস্তাব পেলেন। এজন্য

তাকে একজন নির্বাহী কর্মকর্তার বেতনের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। বিনিময়ে তাকে বইটি না লেখার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

১৯৯০-১৯৯১ যুক্তরাষ্ট্র পানামায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে বন্দী করে নিয়ে এলো নিজ মাটিতে। পার্কিন্স আইপিএসকে বিক্রি করলেন। স্টোন অ্যান্ড ওয়েবস্টার থেকে অবসর নিলেন। শুরু করলেন 'এক অর্থনৈতিক ঘাতকের বিবেক' বইটির লেখা শেষ করার কাজ। ঠিক সেই সময় তার সামনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব এসে হাজির হলো। বলা হলো যে, এ ধরনের বই তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

১৯৯২-২০০০ ইরাকে অর্থনৈতিক ঘাতকদের ব্যর্থতার কারণে প্রথম ইরাক যুদ্ধ ঘটল। তিনবার অসমাপ্ত বইকে সমাপ্ত করার কাজে হাত দিলেন। তিনবারই তাকে বাধা দেওয়া হলো। তখন নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজে হিমালয় থেকে আমাজান বহু স্থান ভ্রমণ করলেন। দালাইলামাসহ বহু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বহু আদিবাসী গোত্রের সাথে কাজ করলেন। বহু ফোরামে এসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। কয়েকটি আদিবাসী গোত্র সম্পর্কে বইও লিখলেন।

২০০১-২০০২ একদল উত্তর আমেরিকান পর্যটককে নিয়ে আমাজানের গহীন অরণ্য সফর করলেন। ২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমাজান অরণ্যাঞ্চল সফরের সময়ই নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার খবর পেলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে গ্রাউন্ড জিরোতে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাক্তন কর্মজীবন সম্পর্কে বই লেখার প্রতিজ্ঞা করলেন।

২০০৩-২০০৪ মার্কিন জ্বালানী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী আদিবাসী গোত্রগুলোর সাথে আলোচনা করার জন্য ইকুয়েডরে ফিরে গেলেন। এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি বইটিকে লেখার কাজ শেষ করলেন।

লেখক পরিচিতি

জন পার্কিন্স পর পর চারটি জীবনযাপন করেছেন। তার জীবন শুরু হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক কনসালটিং ফার্মের অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে। এ সময় তিনি বিশ্বের বহু স্থানে বহু আন্তর্জাতিক প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন। ওই জীবন থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বিকল্প জ্বালানী উৎসগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যে একটি সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সময় অর্থনৈতিক ঘাতক জীবনের কথা গোপন রাখার জন্য তিনি যথেষ্ট ভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর চাপের মুখে তিনি নিজের সংস্থাকে বিক্রয় করতে বাধ্য হলেন। এরপর তিনি একাধিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললেন। সে সময় ল্যাটিন আমেরিকার আদিবাসী গোত্রগুলোর সংস্কৃতি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ, বক্তা ও লেখক রূপে তার পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে তিনি একজন লেখক যিনি বিশ্বব্যাপী বিশ্বসাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য কর্পোরেটোক্রেসির পরিকল্পনাকে উম্মোচিত করেছেন।

অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে তার কাজ ছিল ভৌত অবকাঠামোগুলোকে উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিপুল অংকের ঋণ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রয়োজনের তুলনায় এসব ঋণের পরিমাণ যে অনেক বেশী হতো তা বলা বাহুল্য মাত্র। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নের ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর উপরে অর্পণ করা হতো। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দেশটির তহবিলে ফিরে যেতো। অন্যদিকে ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলো চিরদিনের জন্য ঋণভারে জর্জরিত হতো। তখন ঋণগ্রহণকারী দেশগুলো থেকে সুলভে শ্রম ও সম্পদ আহরণের পালা শুরু হতো। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বজুড়ে নিজের সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলেছে।

অর্থনৈতিক ঘাতকরূপে জন পার্কিন্স বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন। বর্তমান যুগের বহু আন্তর্জাতিক ঘটনার সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন বা এসব ঘটনার ঘনিষ্ঠতম সাক্ষী ছিলেন। তার হাত দিয়েই সৌদি আরবের অর্থ পাচারের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটেছিল। কালক্রমে এই নেটওয়ার্কে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জ্বালানী সমৃদ্ধ দেশকেও জড়িত করা হয়েছে। তিনি একেবারে কাছ থেকে ইরানের শাহেন শাহের পতনকে দেখেছেন। ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট হাইমে রোলদো ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তোরিজোর অপমৃত্যু পানামায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান ও ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ এসব ঘটনার তিনি একজন নিকটতম সাক্ষী।

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে জন পার্কিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার সিস্টেম ইনকর্পোরেটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললেন। প্রতিষ্ঠানটি বিকল্প জ্বালানী উৎসগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল। এজন্য অবশ্য তার প্রাক্তন সহকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর পাশাপাশি তিনি কয়েকটি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা রূপেও কাজ করেছিলেন। এটি অবশ্য ছিল তার প্রাক্তন কর্মজীবন সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখার পুরস্কার।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর চাপের মুখে তিনি আইপিএসকে বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। এরপর তিনি কয়েকটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললেন। এসব প্রতিষ্ঠান আমাজান অরণ্যাঞ্চলে বাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে নিজ নিজ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। সেই সাথে তিনি পাঁচটি বই লিখেছেন। এসব বই বিশ্বের বহু ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি আমাজান অরণ্যাঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলো সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এসব বিষয়ে তাকে বিশ্বের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাও দিতে হয়েছে।

'ড্রিম চেঞ্জ' তার প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল ড্রিম চেঞ্জ কোয়ালিশন। সংস্থাটি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। একজন মানুষ কিভাবে তার প্রতিবেশীদের জীবনকেসহ গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত করতে পারে সেই সচেতনতা গড়ে তুলছে। সুষম ও টেকসই সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষমতায়নকে বৃদ্ধি করছে। সংস্থাটির পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে গণসচেতনতাকে গড়ে তুলছে। সেই সাথে এই কর্মসূচী আমাজান অরণ্যাঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে নিজ নিজ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহায্যও করছে। ড্রিম চেঞ্জের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের বহু দেশে একই রকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

গত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে ও চলতি শতাব্দীর শুরুতে জন পার্কিন্স তার অর্থনৈতিক ঘাতক জীবন সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখার অঙ্গীকারকে রক্ষা করেছেন। বিনিময়ে তিনি মোটা অংকের কনসালটেন্সি ফি পেয়েছেন। তিনি এই অর্থকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যয় করেছেন। আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন "আমাজানের নরমুণ্ড শিকারীরা" নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করেছিল। এতে ধারাভাষ্য প্রদান করেছিলেন লিওনার্দ নিময়। এই প্রামাণ্যচিত্রে জন পার্কিন্সকে একজন বিশেষজ্ঞরূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল। একটি ইতালিয়ান সাময়িকী কসমোপলিটান তার "শেপশিফটিং" বই সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। টাইম ম্যাগাজিন বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে ড্রিম চেঞ্জকে সেরা ওয়েবসাইট প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানরূপে নির্বাচন করেছিল।

২০০১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা জন পার্কিন্সের দুনিয়াকে পাল্টে দিলো। তিনি তার অর্থনৈতিক ঘাতক জীবনের গোপনীয়তাকে ভঙ্গ করার প্রতিজ্ঞা করলেন। এই প্রতিজ্ঞারই ফসল হচ্ছে এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি। এই বইয়ে মার্কিন সরকার, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে কর্পোরেটোক্রেসি গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কিভাবে আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নামে অর্থনৈতিক ঘাতকেরা ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলোকে উন্নয়নের মোহনীয় ফাঁদে পা দেন। বলা হয়েছে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিজের উপনিবেশে পরিণত করেছে। বলা হয়েছে কিভাবে বাকি বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

জন পার্কিন্স এর আগে যে বইগুলো লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে *শেপশিফটিং, দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ইউ ড্রিম ইট, সাইকোনেভিগেশন, দ্য স্ট্রেস - ফ্রি হ্যাবিট ও স্পিরিট অফ দ্য শুয়ার।*